অশরীরি-বিজ্ঞান
দ্বিতীয় খণ্ড
১৬৪৮

সাম্পত্তিক অযৌনজ অপরাধ, কিন্তু শঠতা বহুবিধ উপায়ে হয়—অর্থাৎ কি'না এক একজন শঠ এক এক প্রকার কায়দায় লোক ঠকায়।

অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার অপরাধ-পদ্ধতির উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু আমার মতে, কোনও কোনও একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা একবার সফলতা লাভ করা মাত্র সেই বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যেই অপকর্ম্ম করতে থাকে। কোনও অপ-পদ্ধতির কথা সে আর তখন চিন্তা করে না। একই পুনঃ পুনঃ অবলম্বন করার ফলে সেই বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে সে পাকাপোক্ত হয়ে উঠে যে তখন অবলীলাক্রমে, অল্প আয়াসে নির্ভুলভাবে সে উক্ত পদ্ধতি দ্বারা অপকর্ম্ম করতে সক্ষম। স্বভাবতঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে একদিন লাগে। এই কারণে একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আর একটি আয়ত্তে আনা সময় সাপেক্ষ ত বটেই, তা ছাড়া মুহূর্ত্তে পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা সকল সময়ে সম্ভবও হয় না। প্রথম অবস্থার অপরাধীরা (বা প্রাথমিক অপরাধীরা) কোনও কোনও সময় একটি পদ্ধতি ত্যাগ করে আর একটি পদ্ধতি গ্রহণ করলেও, প্রকৃত বা শেষ অপরাধীরা কদাচ এইরূপ কার্য্য করে না। প্রকৃত দলগত অভ্যাস, সংস্কার এবং ঔৎসুক্যের অভাব এইরূপ প্রতিবন্ধক হয়। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতির ন্যায় পা শহরের প্রাথমিক অপরাধীরা একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর পদ্ধতি কোনও কোনও সময় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ইহার ফলস্বরূপ অনভ্যাসের কারণে তারা ধরাও পড়ে অতি সহজে। এই সব প্রাথমিক অপরাধীরা পাকাপোক্তভাবে মাত্র

অবলম্বন ক'রে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়। সাধারণতঃ অপরাধীরা তাদের স্ব স্ব গুরুর কাছে, এই সব (পৃথক পৃথক) অপরাধ-পদ্ধতি শিক্ষা করে থাকে। স্ব স্ব গুরু, সর্দ্দার বা ওস্তাদ নির্দ্দেশিত পন্থানুযায়ী তারা একই ধরণের অপকর্ম্ম করে চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওস্তাদ বা গুরুরা অন্য কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করার জন্যে প্রারম্ভেই সাঁকরেদ বা শিষ্যদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েও নিয়েছে। সাধারণভাবে দেখা গেছে, যে পকেট মারে, সে সিঁদ কাটে না, এবং যারা লোক ঠকায় তারা মানুষ মারে না বা সিঁদ কাটে না। যারা গৃহে চুরি করে, তারা পথে চুরি করে না। এমন কি, যারা রাত্রে চুরি করে তারা দিনে চুরি করে না। একমাত্র প্রাথমিক ও দৈব অপরাধীরাই সুযোগমত এক প্রকার অপরাধ ও উহার পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর একটি পদ্ধতি গ্রহণে প্রয়াস পায় এবং এজন্য অকুস্থলে তারা ধরাও পড়ে। এদের অনেকেই কোনও গুরু বা ওস্তাদের কাছে অপকর্ম্ম শিক্ষা না করে অপকর্ম্ম শুরু করে, এই কারণে কোনও একটি সুচিন্তিত পদ্ধতি বেছে নিতে তারা অপারক হয়। বড় বড় শহরে এই ধরণের বহু প্রাথমিক অপরাধী দৃষ্ট হয়ে থাকে, এই কারণে অনেকে শহুরে অপরাধীদের ভিন্নমুখী (versatile) অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। কিন্তু এদের এইরূপ বিশ্বাস ভুল। কারণ শেষের দিকে এই প্রাথমিক অপরাধীরাও অপকর্ম্মের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিই বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। যে সকল অপকর্ম্মের জন্য একের অধিক ব্যক্তির প্রয়োজন (Team work), সেই সব অপকর্ম্মের জন্য এক এক দিন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করাও অসম্ভব। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে "অপরাধীদের বুদ্ধি-প্রেরণা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই অপরাধ-পদ্ধতির অনেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

স্ব স্ব অপ-পদ্ধতির প্রতি এদেশীয় অপরাধীদের প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যায়। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"পকেট-মারির মামলায় এক তালাতোড় চোরকে ভুলক্রমে পুলিশ ধরে আনলে সে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলিল, 'আমরা তালা মারি, চাবির কাম করি। আমাদের কি এই কাম আছে নাকি, (চাবি ও গামছা অর্থে সিঁদকাটি প্রভৃতি ভাঙন যন্ত্র বুঝায়)।' অপর একদিন ডক্-ইয়াড্-এর চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হলে সে উত্তর করে, 'আমি মশাই কেবিন চোর (জাহাজের) আমি ডক্ চোর নই'।"

[সুবিধা-অসুবিধা ও মনস্তাত্ত্বিক, এই উভয়বিধ কারণেই অপরাধীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ নির্দ্ধারিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিবা ও রাত্রি চোরদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। কোনও এক এ্যাংলো দিবা চোর আমাকে এইরূপ বলেছিল, ডে ইজ্ ফর ওয়ার্ক, নাইট্ ইজ্ ফর এনজয়মেন্ট। এই জন্যেই আমি দিনেই চুরি করে থাকি। এই চোরদের নিকট রাত্রে স্ফূর্তি করার সময়। এই সময়টুকু তারা নষ্ট করতে চায় না, তাই তারা দিনেই চুরি করে। এ ছাড়া স্বভাব-চোরদের কাউর কাউর অপস্পৃহা মনস্তাত্ত্বিক কারণে রাত্রে আদপেই আসে না। মনস্তাত্ত্বিক কারণ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কিত কারণ সম্বন্ধে বলা যাক। দিবভাগে পুরুষরা বাড়ী থাকে না, তাই বহু অভ্যাস-চোর ঐ সময় চুরি করে। এ ছাড়া আমরা এও দেখেছি যে, য়ুরোপীয় বাড়ীর চোর ও দেশীয় ব্যক্তির বাড়ীর চোরও পৃথক থাকে। কারণ এদের অভ্যাসজাত সুবিধা-অসুবিধা ঐ সকল বাড়ীর গঠন, লোকজনদের জীবন-প্রণালী ও উহাদের ব্যবহৃত দ্রব্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। উন্নত ধরণের চোররা আবার ছ্যাঁচড়া প্রকৃতির চুরি

ঘৃণা করে। আমার মতে ইহাও বিভিন্ন অপপদ্ধতি গ্রহণের অপর এক কারণ।]

উপরে উল্লিখিত বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীর প্রতিটি অপরাধের জন্য বিবিধ প্রকার অপপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষণে এই সকল অপপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ভারতীয় অপরাধীদের কোনও কোনও অপরাধ-পদ্ধতির সহিত পারস্য, চীন এবং য়ুরোপের মধ্যযুগীয় অপরাধীদের অপরাধ-পদ্ধতির মিল দেখা যায়। ইহা দ্বারা এইরূপ মনে করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে এই সকল দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। বাণিজ্য এবং রাজ্য বিস্তারের সহিত যে এক দেশের অপরাধীদের সহিত অপর দেশের অপরাধীদের মিলন ঘটেছে, একথা স্বীকার্য্য। এই বিষয়ে অনুসন্ধানের একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র আছে, এইরূপ আমি মনে করি। এই সকল অপপদ্ধতির কয়েকটি প্রাচীন এবং কয়েকটি আধুনিক ও অতি-আধুনিক। কিন্তু পুরাতন পদ্ধতিগুলি কিছুকাল পরিত্যক্ত হয়ে পুনরায় পুরানো যুগের গহনার ন্যায় অপরাধীদের দ্বারা পুনঃ গৃহীতও হয়ে থাকে।

অপরাধীদের অপরাধ-পদ্ধতিকে আমরা চারিটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি, * যথা—(১) কি ধরণের অপকর্ম্ম অপরাধীরা ক'রবে, (২) তাদের

* বসত বাটীর গঠন এবং গৃহস্বামীর জাতি এবং তৎজনিত তাঁদের আচার ব্যবহারের উপরও চোরেদের শ্রেণী বিভাগ হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, যারা য়ুরোপীয়দের গৃহে চুরি করে তারা ভারতীয়দের গৃহে চুরি করে না। এ ছাড়া স্থান কাল পাত্র ভেদেও চোরেদের শ্রেণী বিভাগ করা চলে। "চৌর্য্য অপরাধ" শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে।

মনোনীত অপরাধটি তারা কখন কোন সময়ে সমাধা করে, (৩) বিশেষ অপরাধ তারা কিরূপে বা কি উপায়ে সংঘটিত করে, (৪) অপকর্ম দ্বারা তারা কি কি প্রকারের দ্রব্য অপহরণ করে, ইত্যাদি। অপপদ্ধতির প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগের প্রকৃত ব্যাখ্যা উপরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইবার অপপদ্ধতির চতুর্থ বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রথম অপরাধীরা যাহা কিছু সম্মুখে পায় তাহাই গ্রহণ করে। কিন্তু এই সব দ্রব্য সকল সময় তারা বিক্রয় করতে সক্ষম হয় না। বিক্রয় দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থাদি না পেলে এই সব দ্রব্য অপহরণ করা বা না করা তাদের পক্ষে সমান। এই কারণে অপরাধীরা মাল পাচারের জন্য 'থাউ' বা চোরাই মালের গ্রাহকদের সহিত ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ থাকে। সকল গ্রাহক বা Receiverরা যে কোনও দ্রব্য গ্রহণ করে না। এক একজন গ্রাহক এক এক প্রকার দ্রব্য গ্রহণ করে। অনেক সময় এই সকল গ্রাহকদের ফরমাস মত অপরাধীরা দ্রব্য আহরণ করে থাকে।

গ্রাহক আবার বিশেষ শ্রেণীর চোরেদের এজন্য পুষে থাকে। সাইকেলের গ্রাহকরা কেবলমাত্র সাইকেল এবং ঘড়ির গ্রাহকেরা কেবলমাত্র ঘড়িই গ্রহণ করে থাকে। এই কারণে আমরা কোনও অপরাধীকে কেবলমাত্র ঘড়ি এবং কোনও অপরাধীকে আমরা কেবলমাত্র সাইকেল চুরি করতে দেখি। শহরের কোন সময় কোন কোন দ্র[illegible] হবে তা নির্ভর করে তৎকালীন বাজারের দর, চাহিদা এবং প্রয়োজন ও নির্দ্দেশের উপর। অপরাধ-পদ্ধতির প্রথম, [illegible] এবং চতুর্থ বিভাগ সম্বন্ধে বলা হল। অপরাধের ন্যায় উহা পদ্ধতিও বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এইবার অপরাধসমূহের অপরাধ-পদ্ধতির সম্বন্ধে বলা যাক।

প্রবঞ্চনা অপরাধ

শঠতা বা প্রবঞ্চনা একটি নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অযৌনজ * অপরাধ। এই অপকর্ম্মের জন্য কোনওরূপ দৈহিক বলপ্রকাশের প্রয়োজন হয় না। আঘাত হানা শঠেদের পক্ষে রীতি এবং স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যাপার। আত্মরক্ষার্থেও এরা কখনও আঘাত হানে না। পৃথিবীতে শঠেদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং এদের কার্য্যপদ্ধতিগুলির সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। বুদ্ধিমত্তায় এরা পণ্ডিতমণ্ডলীকেও মুগ্ধ করে দেয়। সবলে পরের কেড়ে নেওয়াই বোধ হয় পৃথিবীর প্রথম বা সনাতন অপরাধ রীতি। পরে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বোধ হয় না-বলে-নেওয়া বা (গোপনে) চুরির পক্ষপাতী হয়। এর পর সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি এবং চুরির বিরুদ্ধে লোকে সজাগ হয়ে নানারূপ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, ফলে বুদ্ধিমান চোরেরা শঠতার বা Cheating-এর আশ্রয় নেয়। এই শঠতা অপরাধ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে।

অপরাধ-পদ্ধতি সকল দু'টি বিশেষ পর্য্যায়ে সংঘটিত হয়। প্রথম পর্য্যায়ে, অপরাধীরা শত্রুর বেশে সোজাসুজি আঘাত হানে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ এই পর্য্যায়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে, অপরাধীরা বন্ধুরূপে আলাপ জমিয়ে, গৃহস্থদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের সর্ব্বনাশ ঘটায়। বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ এই পর্য্যায়ের অপরাধ। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আমরা কেবলমাত্র প্রবঞ্চনা

* যৌনজ প্রবঞ্চন অপরাধেরও অস্তিত্ব আছে। পরে এই সম্বন্ধে আলোচনা

সম্বন্ধেই আলোচনা করব। এই প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা মূলতঃ দুই প্রকারে সংঘটিত হয়। যথা—(১) সাধারণ প্রবঞ্চনা এবং (২ অসাধারণ প্রবঞ্চনা। ইহা ব্যতীত ইহাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ উপবিভাগও আছে। প্রবঞ্চনার এই বিভাগ ও উপবিভাগ সম্বন্ধে আমি পৃথক পৃথক রূপে ব্যাখ্যা করব। প্রবঞ্চনার এই প্রতিটি বিভাগ উপবিভাগ সম্পর্কীয় অপরাধসমূহ আবার দুইটি উপায়ে সমাধা করা যায় যথা, যৌনজ উপায় ও অযৌনজ উপায়।
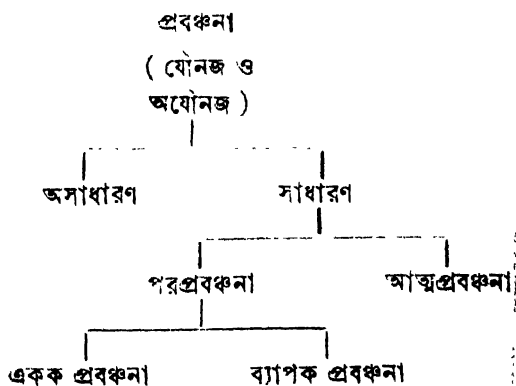
প্রথমে সাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে বলা হ'ক। সাধারণ প্রবঞ্চনা গৃহস্থেরা স্বাভাবিক মন নিয়ে, সুস্থ অবস্থায় ঠকে থাকে। দৃষ্টান্ত এইরূপ বলা যেতে পারে। ধরুন, আপনার গোয়ালা এসে আপনাকে খাঁটি গরুর দুধ দেবে ; আপনি তাকে বিশ্বাস ক'রে করলেন। সে আপনাকে "খাঁটি গরুর দুধ' দিল বটে, কি "খাঁটি দুধ" দিল না। আসলে সে আপনাকে দিল জল দুধ। দুধে জল মেশানো হয়েছে জানলে বা বুঝলে, নিশ্চয়ই তা আ

করতেন না। উহা ক্রয় করলেও, আপনি ওর দাম দিতেন আরও কম। এই ক্ষেত্রে ঘোষের-পো প্রবঞ্চনা দ্বারাই আপনাকে জল মিশানো দুধ, খাঁটি দুধ বলে গছিয়ে দিয়েছে, তা না হলে অত অধিক মূল্যে ঐ দুধ আপনি কখনও ক্রয় করতেন না। এই ধরণের প্রবঞ্চনাকে বলা হয় 'সাধারণ প্রবঞ্চনা'। মানুষ অন্ধ ভালবাসা, ভক্তি বা স্নেহ দ্বারা অভিভূত হলে, এই ভক্তি, ভালবাসা বা স্নেহের পাত্রেরা তাকে আরও সহজে ঠকাতে পারে। এই ভক্তি, ভালবাসা ও স্নেহ, ক্রোধ ও লোভের ন্যায় মানুষের বিচার বুদ্ধির বিনাশ ঘটিয়ে তাকে হাস্যকর ভাবে বোকা করে তুলে। এইরূপ অবস্থায় তারা দুর্বৃত্তদের অত্যধিকরূপে বিশ্বাস করে নিজেরাই নিজেদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে থাকে। মানুষ ঠকে তখনই যখন সে ভালবেসে ফেলে। এইরূপ অবস্থায় সে দেখেও দেখে না, শুনেও শুনতে পায় না।

"সাধারণ প্রবঞ্চনা"র কথা বলা হ'ল, এইবার "অসাধারণ প্রবঞ্চনা"র কথা বলা যাক। অসাধারণ প্রবঞ্চনার দ্বারা মানুষের মন অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অসুস্থ হয়ে উঠে। লোভের কারণেই এইরূপ ঘটে থাকে। এই অবস্থায় ফরিয়াদী নিজেই কতকটা অপরাধীর পর্য্যায়ে এসে পড়ে। একটু বুঝিয়ে বলা যাক্। ধরুন, কোনও এক প্রবঞ্চক আপনাকে এসে জানাল, এক যায়গায় জলের দরে সোনা বিক্রয় হচ্ছে। আপনি এও বুঝলেন ও জানলেন যে, গহনাগুলি চোরাই গহনা, তা না হলে এত সস্তায় সোনা বিক্রয় হয় না। প্রথমে হয়ত আপনি চোরাই গহনা কিনতে রাজি হলেন না, কিন্তু সেই ব্যক্তি নানাভাবে আপনাকে প্রলুব্ধ করে গহনা কিনতে রাজী করাল, অর্থাৎ কিনা বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা আপনার অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাকে জাগ্রত করে আপনাকে সে লোভী করে তুলল। এই ভাবে প্রবঞ্চিত হয়ে আপনি গোপনে গহনাগুলি কিনলেন, আসলে কিন্তু আপনি সোনা কিনলেন

না; আপনি কিনলেন গিল্টি করা কতকগুলি পিতল, সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে। এই ক্ষেত্রে আপনি অপরকে ঠকাতে গিয়ে, কিংবা অপরের অপহৃত দ্রব্য আত্মসাৎ করতে গিয়ে, নিজের দ্রব্য বা অর্থই আপনি হারিয়ে ফেললেন। এই 'অসাধারণ প্রবঞ্চনা' দ্বারা ঠগীরা প্রবঞ্চিত ব্যক্তির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক অপস্পৃহা জাগ্রত করে তাকে লোভী করে তুলে। এই ভাবে প্রবঞ্চিত না হলে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি তার স্বাভাবিক অবস্থায় এইরূপ অপকর্ম্ম সম্বন্ধে হয়ত চিন্তাও করত না; বরং ঐরূপ কার্য্যকে সে ঘৃণাই করত। এই ধরণের প্রবঞ্চনাকে আমরা 'অসাধারণ প্রবঞ্চনা' বলে থাকি।

[এই প্রবঞ্চকগণ বন্ধুরূপেই নাগরিকদের অর্থাপহরণ করে। বস্তুতঃ মানুষের ক্ষতি করা শত্রুতা অপেক্ষা বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে আরও সহজে সম্ভব হয়। এই কারণে পণ্ডিতেরা বলেন, "যদি কারও ক্ষতি করতে চাও ত প্রথমে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার দুর্ব্বলতাসমূহ জেনে নাও।" বিশেষ করে বিপক্ষ পক্ষ যদি সাবধানী, শক্তিমান ও দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির হয় তা হলে এই পন্থাই প্রকৃষ্ট। ঠগীরা এই সত্যটি বিশেষ রূপে মেনে নিয়েছে। ঠকামীর দ্বারা অর্থাপহরণ অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা, এই কারণে পৃথিবীতে ঠগীদের সংখ্যা অন্যান্য অপরাধীদের তুলনায় অনেক বেশী। ঠগীরা সাধারণতঃ দুর্ব্বল ও ভীরু প্রকৃতির এবং অত্যধিক চতুর হয়ে থাকে। তারা সাধারণতঃ খুন জখমের ধার দিয়েও যায় না, বরং তাদের নিরীহ মানুষের মতই দেখা যায়। চুরির তুলনায় জোচ্চুরী করা অনেক নিরাপদ, এ কথা স্বীকার্য্য। এইবার এই প্রবঞ্চকদের সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা যাক।]

এই অসাধারণ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ঠগী নওসেরা', 'টপ্‌কা ঠগী', 'নোট ডবলিঙ' প্রভৃতি অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। মানুষ

মানুষের মধ্যেই যে যৌনজ ও অযৌনজ অপস্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান ... এবং উহা কৃত্রিম উপায়ে যে বহির্গত করা যায় তাহা এই সকল ...রণ প্রবঞ্চনাসমূহ প্রমাণিত করে। প্রথমে বিবিধ প্রকার ...রণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ঠগী নওসেরা

নওসেরা পদ্ধতির অপর নাম Bead Gambling. ইহা একপ্রকার অসাধারণ প্রবঞ্চনা। এই পদ্ধতিতে অপরাধীরা Bead বা ঘুঁটির সাহায্যে জুয়ার অভিনয় ক'রে লোক ঠকায়, অনেকে ঘুঁটির বদলে তাস প্রভৃতির দ্বারাও এই খেলা খেলে থাকে। আসলে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য একেবারেই জুয়া নয়। নওসেরা দলে প্রায়ই বহু সংখ্যক ব্যক্তি যুক্ত থাকে। ইহাকে একটি বাস্তব অভিনয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। এক একজন ব্যক্তি এক একটি অংশ এ্যাক্ট বা প্লে করে যায়। এদের মধ্যে কেহ সাজে রাণী, কেহ সাজে রাজা, জমিদার বা বড় বড় ... কেহ বা ম্যানেজার সাজে। দারোয়ান, বেয়ারা, খাতক, খাতাঞ্চি ...ভৃতি সাজবারও লোকের অভাব হয় না। প্রথমে 'নওসেরা' নামে ...শ্চমা অপরাধী দল দ্বারা, মতান্তরে দিল্লীর এক শ্রেণীর মুসলমানদের ...রা, এই অপরাধ প্রবর্তিত হয়, পরে বাংলাদেশের পতনোন্মুখ ধনী ...শের দুলালরা অর্থের প্রয়োজনে এর উন্নতিসাধন করেন। * আজ ...দের গতিবিধি পৃথিবীর সর্বত্রই। বড় বড় সহরে এরা আস্তানা

---

* কেহ কেহ এ'ও বলে থাকেন যে নয়'শ (৯০০) উপায়ে ইহা সাধিত হয় বলে ...কে নওসেরা বলা হয়েছে।

গেছে লোক ঠকায়। ভারতে সর্ব্ব প্রদেশের ব্যক্তিদের নিয়েই এ দলগুলি গঠিত। এদের মোহিনী-শক্তি অল্প কথায় ব্যক্ত করা না। বাক-চাতুর্য্য, বচন-বিন্যাস এবং বিভিন্ন রূপ "মেক্-আপ" এদের প্রধান সহায়।

নওসেরা অপরাধীরা দল বেঁধে বড় বড় সহরে অপকর্ম্ম করে থাকে। এদের আমরা উপরি উক্ত কারণে "অসাধারণ" প্রবঞ্চকদের পর্য্যায়ে ফেলে থাকি। সহরের বড বড় পুরানো বনেদী বাটীগুলিতেই এরা অপকর্ম করে থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে এইরূপ বহু পুরাতন প্রাসাদ আছে। এই সকল বিরাট বিরাট প্রাসাদে উত্তরাধিকারী বাড়ীর স্বর্গগত ধনী মালিকের বহু নিঃস্ব বংশধর সপরিবারে বিভিন্ন অংশে বাস করেন। এই সকল বাটীতে পুরাতন বড় বড় দালান বা "হল" ঘর দেখা যায়। পুরাতন আমলের আসবাব-সজ্জিত হল, ঘরটির উপর কিন্তু সকল বংশধরদেরই সমান অধিকার থাকে, পৃথক পৃথক রূপে বসবাস করলেও প্রয়োজন মত সকলেই হল ঘরটি ব্যবহার করে থাকেন। এই সকল বংশধরদের কাহারও অবস্থা উন্নত থাকলেও তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখা যায়। নওসেরা দলের অপরাধীরা অনেক সময় এই এই বংশধরকে তাদের অংশীদার রূপে বেছে নিয়ে তাদের সাথে যোগসাজসে লোভী বণিক এবং অন্যান্য লোকদের এই সকল ঘরে * ভুলিয়ে এনে তাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে থাকে। এই কাণ্ড অভগুলি বংশধরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির সাহায্যে যে এই অপরাধ

---

* কোনও কোনও ক্ষেত্রে বড় বড় বাড়ী ভাড়া ক'রে উহা 'ভাড়া করে আনা' আসবাবপত্রদ্বারা সাজিয়ে রাখাও হয়।

রটি ব্যবহার করতে পেরেছে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, সংশ্লিষ্ট বংশধরটি প্রায়ই ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকেন এবং দীর সামনে কখনও তিনি হাজিরও হন না। এ ছাড়া বিষয়টি ভাবে সাজানো হয় যাতে করে কিনা, প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা এই ঝুটা রাজা, জমিদার বা ব্যবসাদারকেই বাড়ীর আসল মালিক সহজেই ভুল করে। দলের অধিকাংশ লোকই কিন্তু দালালের শায় কাজ করে। এই সকল দালালেরা সহর, সহরতলী এবং গ্রাম্য জনপদগুলি হ'তে নানা অছিলায় দুর্ব্বলচিত্ত গৃহস্থ দাকদের ভুলিয়ে এনে কাজ হাসিল ক'রে অপর আর এক বড় কিছুদিনের মত সরে পড়ে। কিরূপ পদ্ধতিতে এই সকল অপকর্ম্ম ত হয় তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লেই বুঝা যাবে।

স দেড়েক পূর্ব্বে এক চা'য়ের দোকানে বন্ধু অজিতের সঙ্গে ব প্রথম পরিচয়। অজিতের আগ্রহাতিশয্যে এই পরিচয় অচিরে বন্ধুত্বে ত হয়। একটা ব্যবসা ফাঁদবার খেয়াল সেই আমার মধ্যে ঢুকিয়ে অজিত আমায় বুঝায়, 'গ্যাখ, ব্যবসা করতে গেলে সময় চাই, সুবিধে চাই, পয়সা চাই। তোর তো তিনটে জিনিষই , চল তোকে ভৈরব দাদার কাছে নিয়ে চলি। মস্তবড় কারবারী তিনি। তিনি ঠিক একটা মতলব নিশ্চয় বাতলে দেবেন।' ব অজিত আমাকে ভৈরববাবুর কাছে নিয়ে আসে। প্রথমে ভৈরব আমাকে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহই দেন না। পরিশেষে অবশ্য র এবং অজিতের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমাকে সাহায্য করতে তিনি হন, কিন্তু প্রথমেই বেশী টাকা খরচ করতে তিনি আমাকে মানা দেন। তিনি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বলেন—'কত টাকা রতে তুমি রাজী আছ? সম্বল ত মাত্র হাজার ত্রিশ।' বাপ মরবার

সঙ্গে সঙ্গেই সব উড়াতে চাও বুঝি? দেখ বাপু তুমি অজিতে বন্ধু, আমার নাতির মত। ব্যবসা হচ্ছে একটা জুয়া খেলা, হার জিতের কোনও স্থিরতা নাই। তবে একটা কাজ তুমি করতে পার তুমি বরং কিছু জমি কিনে ফেল, বুঝলে?'

ইতিমধ্যে সেখানে একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী এসে হাজি হলেন। ভৈরববাবু বিরক্ত হয়ে তাকে শুধালেন 'কি চাই আব বলেছি তো ও'সবে আমি রাজী নই।' আমতা আমতা করে ভদ্রলো উত্তর করলেন, 'দেখুন বাদলপুরের মাতাল জমিদারটা কোলকা এসেছে। অনবরত হুণ্ডি কেটে বিষয় বিক্রী করছে জলের দরে।' চশম কপালে উঠিয়ে ভৈরব দাদু বললেন, 'আরে, তাই নাকি, খুব f ওদের। ওদের ম্যানেজার আমার বাল্যবন্ধু। কোন্ কোন্ f ওদের বিক্রী হবে?' উৎফুল্ল হয়ে দালাল ভদ্রলোক উত্তর করলে 'আজ্ঞে বীরভুমের দুটো শাল বন। আসল দাম চল্লিশ হাজার, মাত্র স হাজার টাকায় বিক্রয় করবেন।' 'বল কি? আমি যে গিছলাম সেখানে কিন্তু চল্লিশ হাজার কি বলছ, আসল দাম হবে অন্ততঃ সত্তর হাজার এরপর ভৈরব দাদু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার দা একখানা কপাল বটে, মেঘ না চাইতেই জল; কিন্তু সবটা তো দিচ্ছি না ভাই, অর্দ্ধেকটা আমি রাখব। মাস দুই ধরে রেখে ষাট ত বিক্রী করবই। ল্যাণ্ড স্পেকুলেশনই দেখছি বেষ্ট বিজনেস। এ লক্ষ টাকা জুটমিলে আটকে গেল, নইলে কি আর। যাক্, দ তাহলে কাল সাতটায় এস, যদি হয় ত তোমার কপালেই হবে। হা আটেক টাকা সঙ্গে এনো, এর বেশী দরকার হবে না।'

এদিকে হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল—ক্রীঙ ক্রীঙ। রিসিভ উঠিয়ে নিয়ে ভৈরব দাদু কথা কইলেন, 'কোন্? পরিমলবাবু! হাঁ

ও ত হবেই! কেয়া? বাহাম হাজার। ওতনা তো গদিমে মজুত নেহি। নেহি নেহি নেহি, কেইসেন হো শেক্তা, ব্যাঙ্ক তো আভি বন্দ হো গিয়া। আভি ত্রিশ হাজার দেনে শেক্তা, আচ্ছা আদমি ভেজিয়ে। শুনিয়ে, মুলুকচাঁদকো ভেজ দিয়ে।' এর পর ভৈরব দাদুর কারবারী অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে আমি এবং বন্ধুবর অজিত সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরি। পরদিন সকাল সাতটায় অজিত আমাকে নিয়ে ভৈরব দাদুর বাড়ী আসে। ভৈরববাবু বলেন, 'ড্রাইভারটা তো এখনও এল না, থাক্ ট্যাক্সি করেই চলো।' অজিত ও আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে ভৈরববাবু হুকুম দিলেন, 'চালাও শোভাবাজার।' কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি ভেবে তিনি অজিতকে বললেন, 'আচ্ছা অজিত তুমি আমার অফিসে জুটু বস। সিকিমের একজন ব্যবসায়ী আসবেন তাকে বসতে বলো।' এরপর অজিতকে নামিয়ে দিয়ে তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে চালাতে দিতে বললেন। উদ্দাম গতিতে ট্যাক্সি ছুটে চলল। শোভাবাজারে এসে ভৈরববাবুর নির্দ্দেশমত, একটা থামওয়ালা পুরানো বড় বাড়ীর সামনে ট্যাক্সিখানা রুখে দিয়ে ট্যাক্সিচালক বলে উঠে, 'ই তো হামরা মুলুককা জমিনদার। আরে এ তো বাদলপুরকো রাজা আছে।' এর ভৈরববাবু বললেন, 'চিনতা হসকো?' ড্রাইভার উত্তরে বললে, ...য়া বলে, বেলিয়ামে তো ইনকো ভারী জমিনদারী হ্যায়, উনা হ্যাম ...লামেভি ইন্‌কো জমিনদারী আছে, বড়ি বড়ি জঙ্গলভী আছে।' 'ঠিক ...', বলে ভৈরববাবু ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে আমাদের নিয়ে নেমে ...লন। কিন্তু বাদ সাধল গেটের তকমা আঁটা শাস্ত্রীমশাই। পথ আগলে ...য়ানজী খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'পয়লা এত্তালা দিইয়ে তো?' ...টা ... দারোয়ানের হাতে গুঁজে দিয়ে ভৈরব দাদু হুকুম করলেন, 'যাও আভি, ...য়ানজীকে খবর ভেজো-ও-ও।' আমাদের সেলাম জানিয়ে দরোয়ানজী

এইবার আমাদের একটা হলধরে নিয়ে এসে সেখানে আমাদের বসতে বলে দেওয়ানজীকে এত্তালা জানাতে গেল। আমি অবাক হয়ে বনেদী বাড়ীর আদব কায়দা পরিলক্ষ্য করছিলাম। আমাকে এধার ওধার চাইতে দেখে ভৈরব দাদু মৃদু হেসে বললেন, 'কি আর দেখছ দাদু, সবই এদের গেছে, মদে আর জুয়ায়। রাজার চেহারা দেখলে আরও অবাক হবে, ঠিক একটা নীরেট বোকা নর-রাক্ষস।' হঠাৎ গপ্ গপ্ আওয়াজ করে একটা ঘোড়ার গাড়ী গোড়ীবারাণ্ডার নীচে এসে দাঁড়াল। একজন লোক, বোধ হয় সহিসই হবে, চীৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছিল, 'হুঁসিয়ার, তফাৎ যাও, রাণীমা।' দূর হতে আমি লক্ষ্য করি, একজন শ্যামাঙ্গী প্রৌঢ়া মহিলা গরদের কাপড় পরে বাড়ী ঢুকছেন, পিছনে পিছনে ভিজা কাপড়ের পুঁটলি হাতে আসছে ঝি, এবং তার পিছনে পিছনে আসছে এক অপূর্ব্বসুন্দরী সপ্তদশী বালিকা। হঠাৎ একজন বেয়ারা এসে দরজার পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে যাওয়ায় এদের আর আমি দেখতে পাই না। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই দোতালার ঘর থেকে অরগ্যানের ঝঙ্কার বেজে উঠে, শুনতে পাই জমিদার কন্যার অপূর্ব্ব কণ্ঠ সঙ্গীত, 'তুমি যে আসিবে, তা আমি জানি গো জানি।' মুগ্ধ হয়ে গীত শুনছিলাম, হঠাৎ দেওয়ানজী, চণ্ডীবাবু ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন, 'আরে ভৈরব যে, এতদিন পরে? ও-ও —সেই জঙ্গলটার জন্যে বুঝি, কিন্তু ভায়া সাত হাজারে হবে না, দেড়' আরও চাই। তা ছাড়া আমায় ভাল কমিশন না দিলে সব ভেস্তে... উত্তরে ভৈরব দাদু জানালেন, 'ওটা না বললেও হত, ও আমি দিতাম'। দুই বাল্যবন্ধুর মধ্যে ধীরে ধীরে পূর্ব্ব আলাপ জমে উঠল। ... মধ্যে দেওয়ানজী জানিয়ে দিলেন, জমিদার নাকি রোজ জুয়া খেলে... হাজার বিশ করে হারছেন। এর মধ্যে নাকি দেওয়ানজীরও ... আছে, তাঁর নির্দ্দেশমত খেললে রাজাকে হারতেই হবে। যে খেলা...

দেওয়ানজীর শিক্ষা মত খেলা জিতে ঘরে ফিরে, দেওয়ানজীর এদের কাছ
কে বেশী কিছু কমিশন পান, ইত্যাদি। উৎসুক হয়ে ভৈরবদাদু জিজ্ঞেস
বলেন, 'কিন্তু কারসাজিটা কি? কায়দাটা শিখিয়ে দাও না, এক
ত নয় আমিও দেখি, কিছু টাকা যদি মুফৎ এসে যায়, মন্দ কি?' 'ও
ছু না, খুব সোজা জিনিস। এই দু হাত গঙ্গা, দু হাত কালী', এই বলে
'ওয়ানজী ভৈরবদাদুকে তাসের কসরৎ দেখাতে লাগলেন। ব্যাপারটা
ই সহজ, হাতসাফাই মাত্র, কতকটা তাস সাজাবার কায়দাও বটে,
ন্তু ভৈরববাবুর মাথায় বিষয়টা কিছুতেই আর ঢুকে না। অনেক
ষ্টে কায়দাগুলো বোধগম্য করে ভৈরবদাদু বলে উঠলেন, 'ও সব এখন
ভরবাই, এয়েছি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে, ব্যবসায় আর সব চলে,
ামাচুরী চলে না।' উত্তরে দেওয়ানজী কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন,
তা ও আর তাঁর বলা হল না। 'কাকাবাবু!' বলে জমীদার-কন্যা ঘরে
ঢুকে, হঠাৎ আমাদের সেখানে দেখে তাঁর আর বাক্যস্ফুরণ হল না,
য়। চু করে দাঁড়িয়ে তিনি আঁচলের একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে
তার ন। 'আরে সতী মা! আয় আয়। প্রণাম কর, ইনি তোর এক
বলকা।' সতীরাণী আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ভৈরববাবুকে প্রণাম
হই ি দেওয়ানজীকেও। আশীর্ব্বাদ করে দেওয়ানজী বললেন, 'যাতো মা
লো জন্যে চা-টা—।' সতীরাণী চলে গেলে দেওয়ানজী ভৈরবদাদুর কানে
আ বললেন, বোধ হয় আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই, "'দেখো' না,
বাইরে লায়েক নাতিটি তো পাত্র হিসেবে ভালই। মরা হাতীর দাম
এক লাখ টাকা, তা ছাড়া ওই ত একটা মাত্র, যা অবশিষ্ট আছে তা
মধ্যে তা ওর।' 'কথাটা মন্দ বল নি। চল, পাশের ঘরে চলো
আমা মা করা যাক্। ছেলে ছোকরাদের কাছে—' ইসারায় আরও
হেরে ল বন্ধুদ্বয় আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে

গেলেন। বন্ধুদ্বয় অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে চা নিয়ে হাজির হ
স্বয়ং জমিদার-কন্যা। 'দেওয়ানজীদের সেখানে না দেখে ভীতি
স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকাবাবু কোথায়?' এর
আমার গা' ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কো
থাকেন?' উত্তরে আমি বললাম, 'বালিগঞ্জ।' সতীরাণী জিজ্ঞ
করলেন, 'আপনি কি জাত?' উত্তরে আমি জানালাম, 'কায়স্থ।' স
রাণী উত্তর দিলেন, 'আমরাও কায়স্থ।' সতীরাণী পুনরায় প্রশ্ন করলে
'আপনারা কি-ই।' উত্তরে আমি বললাম, 'মিত্তির'। উত্তরে সতীর
জানালেন, 'আমরা বোস।' এই ভাবে আমাদের আলাপ জমে উঠে
এমন সময় দেওয়ানজী ঘরে ঢুকলেন, দেওয়ানজীদের দেখে সতী সলাম
সরে পড়ল। ইতিমধ্যে বেযারা এসে জানাল, 'রাজা সাহেব নির্দেশ
দিয়েছেন।' আমরাও আর কালবিলম্ব না করে দেওয়ানজীর ঘর।
মত রাজা সাহেবের খাস কামরায় এলাম। প্রকাণ্ড একা ছবি
দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলান কাঁচের সেকেলে লণ্ঠন। বড় বড় আরশী, ত
দিয়ে ঘরখানি সাজান। একটা বড় ফরাসের উপর বসে গড়গড়া।
টানতে রাজা সাহেব দু' জন মাড়োয়ারীর সঙ্গে জুয়া খেলা
পাশের টিপয়ের উপর একটা রেকাবে সাজান মদের গেলাস।
সেখানে বসতে অনুরোধ করে তিনি আবার জুয়ায় মনোনিবেশ
দেখতে দেখতে আমাদের রাজা সাহেব ত্রিশ হাজার টাকা
শেষ দানের পর ক্ষেপে উঠে রাজা সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন,
যাদু জানতা, এ দারোয়ান, নিকাল দেও ই লোককো।' বেগ
দরোয়ান আসবার আগেই মাড়োয়ারীদ্বয় কেটে পড়ল।
গেলাস মদ নিঃশেষ করে রাজা সাহেব ডাকলেন, 'দেওয়ানজী
দেওয়ানজী বললেন, 'হুজুর।' তখন রাজা সাহেব বললেন,

'...সবে ?' ভৈরবদাদু বাধা দিয়ে জানালেন, 'আজ্ঞে আমরা এসেছিলাম ...ল বন সংক্রান্ত একটা কথাবার্তার জন্যে।' উত্তরে রাজা সাহেব বললেন, ...হাঁ হাঁ, সে ত আপনারই হবে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি খেলবো না, আমি খেলবো এখন এর সঙ্গে।' স্বগত স্বরে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভৈরবদাদু বলে উঠলেন, 'এই খেয়েছে রে, মাতালের কাণ্ড দেখ, শেষ বরাবর দাদুভাইয়ের উপরই ঝোঁক পড়ল, বেচারা ছেলেমানুষ।' মৃদুস্বরে দেওয়ানজী বলে উঠলেন, 'তা আর কি হবে খেলুক না, কায়দাটা তো শিখে নিয়েছে, বোকাটা হারুক না, আরও কিছু না হয় যাবে!' ভৈরবদাদু ভৎর্সনার স্বরে উত্তর দিলেন, 'তুমি কি-ই বল ত? এদিকে জামাই করতে চাচ্ছ, অথচ।' ভরসা দিয়ে দেওয়ানজী বললেন, 'সবই তো ওরই হবে' না হয় আগে থেকেই হাজার ত্রিশ নিল! এখন থেকে এঁকে তো ওকেই সামলাতে হবে! ভগবানের ইচ্ছেয় যদি দু'হাত এক হয়।' এদিকে রাজা সাহেব তো মদ খেয়েই চলেছেন, এদের কথোপকথন তাঁর কানেই যাচ্ছিল না। হঠাৎ মদের গেলাস নামিয়ে রেখে রাজা সাহেব বললেন, 'এই খোকা এসো, বসে যাও আসনে।' আমি প্রথমে রাজী হই নি, কিন্তু দেওয়ানজী ও ভৈরবদাদু ভরসা দেওয়ায় রাজী হই, কতকটা লোভে পড়ে বটে। কিন্তু মাত্র একবার জেতার পরই আমি হারতে আরম্ভ করি। শেষে আমার সঙ্গে করে আনা, দশ হাজার টাকাও হেরে যাই। বেশ বুঝতে পারি, হাত সাফাইয়ের ব্যাপারে রাজা সাহেব একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি, এবং এও বুঝতে পারি, আমি একটা দস্যুদলের মধ্যে এসে পড়েছি। ভয়ে, ভাবনায়, অনুশোচনায় আমি চেঁচিয়ে উঠি। আমাকে চেঁচাতে শুনে রাজা সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে হেঁকে উঠলেন, 'জুয়ায় হেরে আবার চেঁচাচ্ছ মানে? এই দরোয়ান।' দেওয়ানজী এইবার আমাকে সরিয়ে এনে বললেন, 'ছেলে-মানুষী করো না খোকা। জুয়া

খেলা সকলের পক্ষেই অপরাধ। চেঁচালে পুলিশ এসে সকলকে হাতে পাকড়াও করবে। ফিরে দেখি ভৈরবদাদু অন্তর্দ্ধান হয়েছেন এবং আমি সেখানে একা। এর পর আমি পরিত্রাহি ভাবে চেঁচিয়ে উঠি, 'পুলিশ পুলিশ।' আমি যে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করব তা বোধ হয় এদের পরিকল্পনার বাইরে ছিল। বেগতিক বুঝে সেখানে হাজির হলেন স্বয়ং রাজকুমারী সতীরাণী। ঝড়ের মত ছুটে এসে সে বলে উঠল, 'বাবা। ফের তুমি এই ভাবে লোক ঠকাচ্ছ। দাঁড়াও, মা আসছেন।' ওদিকে দরজার ওপারে চুড়ীর ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ শোনা গেল। বেগতিক দেখে রাজা সাহেব, দেওয়ানজী ও দরোয়ানরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। এর পর সতীরাণী আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে অনুযোগের স্বরে বলল, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না আপনি। বাবা লোক খারাপ নন। সম্প্রতি ওঁর মাথাটা একটু খারাপ হয়েছে। দেওয়ানজীই মদ খাইয়ে খাইয়ে ওঁর সর্ব্বনাশ করেছেন, কালও ওঁরা একটা লোককে এই ভাবে বত্রিশ হাজার টাকা ঠকিয়েছিলেন। মা জানতে পেরে সব টাকা তেনাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মা বললেন, কাল আপনাকে একবার আসতে। রা এখানে খাবেন, টাকাগুলোও নিয়ে যাবেন।' আমি হতভম্ব হ দাঁড়িয়ে রইলাম, মুখে আমার কোনও উত্তরই যোগাল না। সতীর এইবার তার হীরা ও মুক্তা বসান হার ও বলয় দুটা খুলে ফে সেগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আচ্ছা এইগুলো রেখে দিন, এই গুলোর দাম অন্ততঃ চল্লিশ হাজার।' অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর করলাম, 'না না, আমি আপনাকে বিশ্বাস ক মাকে বলবেন, কাল আমি নিশ্চয় আসব।' অন্তরাল থেকে মায়ের শুনতে পেলাম, 'আহা, বাবা আমার! আমার সতীর কি এমন রূপ

হবে, এমন ছেলে কি পাবো ?' 'আসব আসব, নিশ্চয়ই আসব', বলে বাড়ী ফিরলাম, হৃদয়ে ও মনে অনেক আশা নিয়ে, নিশ্চিন্তও হলো। পরদিন সন্ধ্যায় দাড়ী কামিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে সতীদের বাড়ী গিয়ে দেখি সব ভোঁ ভাঁ, জনমানবের সাড়া শব্দও নেই। দরজার কাছে দেখি একজন সাহেব ও জন দুই তিন বাঙ্গালী দাঁড়িয়ে। সকলেই রাজা সাহেবকে খুঁজতে এসেছেন। সাহেবের কাছে শুনলাম তিনি রাজা সাহেবের কাছ থেকে নেপালের তারাই-এর ছয় হাজার একর জমি কিনবেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা বেহারের একটা অভ্রের খনির খবরে এসেছেন, ইত্যাদি। সকলে মিলে দলবেঁধে থানায় এসে শুনলাম, আমরা একটা দুর্দ্দান্ত নওসেরা গ্যাঙ্গের খপ্পরে পড়েছি। তদন্তে প্রকাশ পেল, অজিত, ভৈরবদাদু, রাজা, রাণী, দেওয়ান, দরোয়ান সায় ট্যাক্সি ড্রাইভার পর্য্যন্ত এক দলেরই দলি। রাজা সাহেব এবং ভৈরবদাদুর বাড়ী দুটি ভাড়া করা এবং বাড়ীর যাবতীয় আসবাব-পত্তর দোকান থেকে ভাড়ায় আনা হয়েছে। দলটা না'কি ততক্ষণে বোম্বে, দিল্লী বা অন্য কোনও দূর দেশে পিট্টান দিয়েছে। বড় বড় সহরে এসে এই দল একাধিক বাটী সাময়িক ভাবে ভাড়া করে আড্ডা গাড়ে, এবং চারি দিকে তাদের এজেন্ট পাঠায়। এই এজেন্টরা আমার মত বোকা দেখে ছেলে বুড়োকে যোগাড় করে অড্ডায় এনে এই ভাবে নাকি লোক ঠকায়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে শিকার পেলে সতীরাণীর আবির্ভাব হয়, তা না হলে সতী ও তার মার সাহায্য ব্যতিরেকেই নাকি কার্য্য সমাধিত হয়।"

মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতাকে সাধারণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—যৌনজ এবং অযৌনজ। অর্থাৎ কি'না কাহারও ঝোঁক থাকে নারীর উপর, কাহারও ঝোঁক থাকে অর্থের উপর, কাহারও কাহারও আবার নারী এবং অর্থ (সম্পত্তি) এই উভয়েরই উপর ঝোঁক

দেখা যায়। প্রয়োজন মত অপরাধীরা ইহার একটি বা অপরটি, কিংবা একত্রে দুইটির দ্বারাই দুর্ব্বল চিত্ত মানুষকে প্রলুব্ধ করে থাকে। উপরি উক্ত কাহিনীটিতে, নওসেরা অপরাধীরা কিরূপ পদ্ধতিতে মানুষের অন্তর্নিহিত এই যৌনজ এবং অযৌনজ স্পৃহাদ্বয় জাগ্রত ক'রে তাদের ঠকিয়ে থাকে তাহা বলা হয়েছে। এইবার ঠগী দলের আভ্যন্তরিক সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। নওসেরা দলের কার্য্যকলাপ এবং সংগঠনের মধ্যে আমরা অত্যন্তরূপ মনোবিজ্ঞানের পরিচয় পাই। এই সম্বন্ধে নওসেরা দলের একজন অপরাধীর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমাদের দলের লোকেদের মধ্যে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ প্রচলিত আছে। এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দ আমরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করি। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাজা, জমিদার বা বড় ব্যবসাদার সাজে, তাকে আমরা বলি 'বৈঠো'। আমাদের দলের মধ্যে যে ব্যক্তি ম্যানেজার বা দেওয়ানজীর ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁকে আমরা বলি 'মোক্তার'। নওসেরা দলের যে ব্যক্তি প্রথম জুয়া খেলার সূচনা করে তাকে আমরা বলি 'ট্রাইম্যান'। আমাদের যে ব্যক্তি দালালের ভূমিকায় অভিনয় করে তাকে আমরা 'দালাল'ই বলি।

এই সকল দালালেরা নানা স্থান হতে নানা শ্রেণীর লোকেদের নানা অছিলায় ভুলিয়ে এনে আড্ডাস্থলে হাজির করে। প্রতারণার অভিপ্রায়ে আড্ডাস্থলে নীত ব্যক্তিদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করি এবং তদনুযায়ী আমরা তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকি। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের আমরা যথাক্রমে (১) কোরা, (২) সোনামুড়া এবং (৩) ফুটা বলে থাকি। যারা পূর্ব্বে এইরূপ খেলা খেলে ঠকেছে, তাদের আমরা বলি 'ফুটা।' এদের মধ্যে যারা এইরূপ খেলা কখনও

খেলে নি, কিন্তু নওসেরা প্রতারণার পদ্ধতি সম্বন্ধে গল্প শুনেছে, তাদের আমরা বলি 'সোনামুড়া'। এবং এদের মধ্যে যারা এইরূপ খেলা পূর্ব্বে কখনও খেলে নি, কিংবা এইরূপ প্রতারণার সম্বন্ধে কখনও কোন গল্পও শুনে নি, তাদের আমরা বলি 'কোরা'। এই 'কোরা' মানুষদেরই আমরা ঠকিয়ে থাকি। সাধারণতঃ আমরা ঘুঁটির দ্বারাই এই খেলা খেলি, কখনও কখনও আমরা তাসও ব্যবহার করি। এই তাসগুলি কায়দা মাফিক সাজান হয়। প্রত্যেক বিবি বা গোলাম পিছু আমরা টাকা ফেলি। তাসগুলি এমন ভাবে সাজান হয়, যাতে ক'রে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দানে কাহারও ভাগে কোনও ছবি পড়ে না অর্থাৎ কি'না কেউ জেতেও না, কেউ হারেও না। তাস সাজাবার কায়দার গুণে চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দানে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিই (Victim) জিততে থাকে। দুই হাজার টাকা ক'রে, তিন দানে ছয় হাজার টাকা জেতার পর (আনন্দের আতিশয্যে) প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অত্যন্তরূপ উত্তেজিত হয়ে উঠে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ অবস্থাকে আমরা বলি 'গরম'। পর পর তিন তিনবার জেতার পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তির উত্তেজনা শেষে সীমায় আসে। এই সময় তার প্রতি ধমনীতে রক্ত অতি দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে, তার জিহ্বা ও তালু শুকিয়ে যায়। তার বাক্যস্ফুরণ পর্য্যন্ত হয় না। এই সময় তার মুখ রক্তিমাভ ধারণ করে, অর্থাৎ তার মাথা হতে রক্ত নীচে নামে ; ফলে মস্তিষ্ক তার অসাড় হয়ে আসে, তার বক্ষ দুর দুর করে এবং হস্তদ্বয় কাঁপতে থাকে। এই অবস্থায় জুয়ায় জেতা মুদ্রা কয়টিও সে পূর্ব্বের ন্যায় নিজের কোলের দিকে টেনে আনতে পারে না। যে দালালটি প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে অকুস্থলে ভুলিয়ে এনেছিল, সেই দালালই তখন প্রবঞ্চিত ব্যক্তির কোলের দিকে টাকাগুলো টেনে আনে এমন ভাব দেখিয়ে, যেন সেও তার মত উত্তেজিত হয়ে

উঠেছে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ অবস্থাটিকে আমরা বলি 'ধুর'। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির এই 'ধুর অবস্থার' সময়েই আমাদের দলের একজন খেলার ঘুঁটি পাল্টিয়ে বা খেলার তাস উল্টিয়ে বা তা সরিয়ে দিয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সাধারণতঃ হাত সাফাইয়ের সাহায্যেই আমরা এই কাজ করে থাকি। 'ধুর' অবস্থায় প্রবঞ্চিত ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে এবং এর ফলে সে আমাদের কোনওরূপ চালাকিই ধরতে পারে না। এইরূপ হাত সাফাইএর সাহায্যে ঘুঁটি উল্টান বা তাস পাল্টানকে আমরা বলি, 'তোড়'। এই 'তোড়ে'র কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধিত হওয়ার পর, আমাদের মধ্যে যে বৈঠোর ভূমিকায় (রাজা, জমিদার বা ব্যবসাদার) অভিনয করছে, সেই ব্যক্তি হঠাৎ এক সঙ্গে একেবারে বারো হাজার টাকা, অর্থাৎ কি'না প্রবঞ্চিত ব্যক্তি যত টাকা জিতেছে তার দু'গুণ টাকা বাজী ধরে বসে, অকুস্থলে উপস্থিত কোনও এক শুভাকাঙ্ক্ষীর নিষেধ সত্ত্বেও। এই সময়ে আমরাও নিম্ন স্বরে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে 'বৈঠো'র এই শেষ প্রস্তাবে রাজী হতে বলি। আমাদের উপদেশে এবং উৎসাহে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি 'বৈঠো'র এই প্রস্তাবে রাজী হয়, কিন্তু এই শেষ খেলার পর সে দেখে, তার প্রথম কয়দানে জেতা ছয় হাজার টাকা তো সে হারিয়েছেই, তা ছাড়া সঙ্গে করে আনা তার নিজের ছয় হাজার টাকাও তাকে বার করে দিতে হচ্ছে। আমাদের মধ্যে যে দালাল সেজেছে, সে তখন তাড়াতাড়ি প্রবঞ্চিত ব্যক্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে উঠে, 'ও ওটা কিছু নয়, হারটা দৈবাৎ হয়ে গেছে। এর পরের দানে সবটাই উশুল হয়ে যাবে ; দিয়ে দিন দানের টাকা কটা।' এই উপদেশ মেনে নিয়ে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি পকেটের টাকা কয়টা বার করে দিয়ে পরের দানের জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাস সাজাবার গুণে সে আর একটি বারও জিততে পারে না। এই ভাবে বাজীমাৎ করার নাম

দিয়েছি আমরা 'চোট্'। এ ছাড়া দশ টাকাকে আমরা বলি 'গজ', একশ টাকাকে আমরা বলি 'গিরাই'। এইভাবে টাকার সংখ্যানুযায়ী আমরা গজ, গিরাই, পট্টি, বারি ও বাটা বলে থাকি। অনেক সময় এই প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদেরও আমরা দলে ভর্ত্তি করে নিই। কি করে, তা বলছি শুনুন,—এই ধরণের শিকাররা (Victim) প্রায়ই লোভী, স্বভাবী বা দুর্ব্বলচিত্তের হয়ে থাকে, কাহার কাহার মধ্যে অপরাধ-প্রবণতাও দেখা যায়। এইরূপ প্রকৃতির মানুষ না হ'লে অপরকে ঠকিয়ে অর্থ উপায়ের বাসনা তাদের মধ্যে আসতো না। এইরূপ প্রকৃতির মানুষেরা বোকা জমিদারকে ঠকাতে গিয়ে যখন নিজেরাই ঠকে বসে, তখন তারা আমাদের কাছেই এসে কেঁদে পড়ে। নিজেরাই জুয়া খেলেছে—এই ভয় ও লজ্জায় তারা এ কথা কাউকে বলেও না। এই সুযোগে আমাদের এই অভিনয় চাতুর্য্য সম্বন্ধে আমরা তাদের ওয়াকিবহাল করে দিই এবং তাদের আমরা জানাই, তারা যদি অনুরূপ ভাবে আড্ডাখানায় লোক সংগ্রহ করে আনতে পারে, তা হলে তাদের ঠকিয়ে আমরা যা' অর্থ পাবো তা থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার হৃত অর্থ তো তাকে ফিরিয়ে দেবোই, তা ছাড়া আরও কিছু টাকা তাকে তার হিস্যা স্বরূপ দেওয়া হবে। অনেক সময় প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা স্ত্রীর বা কোনও আত্মীয়ের গহনা বন্ধক রেখে, কিংবা পৈতৃক জমি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে বা টাকা কর্জ্জ করে, লোভে পড়ে এই প্রতারণা-জুয়া খেলতে আসে। এই হৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করে যথাসময়ে উহা যথা স্থানে ফিরিয়ে দিতে না পারলে তাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। এই কারণে বাধ্য হয়েই তাদের কেউ কেউ আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়। কেউ কেউ ধীরে ধীরে আমাদের দলভুক্তও হয়ে পড়ে।

আমাদের দালালেরা বাক্‌জাল সৃষ্টি করে নানা উপায়ে মানুষের মন ভুলোয়। মানুষের মন ভুলোবার অভিনয় পদ্ধতিগুলিকে আমরা বলি

'রগড়া'। আমরা মানুষের পেশা বা স্পৃহা অনুযায়ী তার প্রতি প্রযোজ্য (উপযুক্তরূপ) 'রগড়া' নির্দ্ধারণ করি। ডাক্তারেরা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং ব্যবসায়িগণ ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় অধিক আগ্রহশীল থাকে। চিত্তপ্রস্তুতি বা (Predisposition)-এর কারণে এইরূপ হয়ে থাকে। এই কারণে আমরা আমাদের শিকার বা victimদের পেশানুযায়ী মুখরোচক বাক্‌জাল সৃষ্টি ক'রে, তাদের সহিত আলাপ জমিয়ে তাদের দুর্ব্বলতা সকল কোথায় সেটা আমরা জেনে নিই। প্রথমে আমরা প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচিত বা সনোনীত ব্যক্তির প্রফেশন বা পেশা সম্বন্ধে খবর নিই। যদি আমরা বুঝি লোকটি চাউলের ব্যবসা করে, তা হ'লে সোজাসুজি তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা মশাই' এক সঙ্গে সত্তোর হাজার মণ চাউল কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন। একজন বড় ব্যবসাদার ব্রেজিলে পাঠাবার জন্যে সত্তোর হাজার মণ চাউল চান্, এই সপ্তাহেই। বড় উপকার হয় মশাই, যদি সন্ধান দিতে পারেন। বড় গরীব আমি, কিছু দালালি মেরে, মেয়েটার বিয়েটা তা হলে দিয়ে দিই। অত বড় আইবুড়ো মেয়ে, মশাই; রাত্রে ঘুম হয় না।

এইরূপ রগড়া বা বচন-বিন্যাস দ্বারা স্বভাবতঃই চাউল ব্যবসায়ীর মন আশান্বিত হয়ে উঠবে। ক্রেতার অভাবে তার ব্যবসায় যাবার দাখিল হয়েছে। এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই জেনে নিয়েছি। এর পর আমরা তাকে রগড়ার পর রগড়া প্রয়োগে অভিভূত করে অতি সহজেই আড্ডাখানায় হাজির করতে পারি। আড্ডাস্থলে সে উত্তেজনাপূর্ণ মন নিয়েই আসবে। উত্তেজনার ফলে মানুষের মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক হয়ে উঠে, এই কারণে তাদের লোভী করে তুলে ঠকানও সহজ হয়।

সাধারণ ভাষায় প্রতারণার নওসেরা পদ্ধতিকে আমরা বলি 'বিড্

গ্যাম্বলিঙ্ বা ঘুঁটি খেল্'—আপাতঃ দৃষ্টিতে এই খেলাকে জুয়া বলে মনে হলেও আসলে উহা প্রবঞ্চনার একটি অভিনব পদ্ধতি মাত্র।

এই দলের মধ্যে যারা রগড়া দেবার কাজে বহাল থাকে, তাদেরই পরিশ্রম করতে হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই 'রগড়া'র বচন-বিন্যাস এবং বাক্যজাল সৃষ্টির মধ্যে এরা প্রচুর চাতুর্য্য প্রকাশ করে থাকে। তাদের শিকার বা Victimদের খুঁজে বার করতেও তাদের কম বেগ পেতে হয় না। এই 'রগড়া' সম্বন্ধে নিম্নে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে।

"হাওড়া জেলার অমুক গ্রামে আমার বাস। পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের সেবার উপর নির্ভর করে আমার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। একদিন ঠাকুর পূজা সমাপন করে বহির্ব্বাটীতে ফিরে দেখি, এজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাঁ মশাই, এই কি সেই অমুক গ্রামের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের বাড়ী।' উত্তরে আমি 'হাঁ' বলা মাত্র ভদ্রলোক একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, আঃ, বাঁচালেন মশাই।' এর পর তিনি ভক্তি গদ গদ ভাবে কপালে বার বার যুক্তকর ঠুকে বলতে থাকলেন, 'বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ, বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ।' হতভম্ব হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি মশাই? মশাইয়ের আসা হচ্ছে কোথা থেকে?'

ভদ্রলোককে বিশেষ ক্লান্ত মনে হলো। শুনলাম তিনি বহু দূর থেকে আসছেন, তা ছাড়া গ্রামটা খুঁজে বার করতেও তাঁকে কম বেগ পেতে হয় নি। একটা মিষ্টি প্রসাদ মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে তিনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তা বলে চললেন,—

'আমি মশাই শ্রীপুর গড়ের সাতলাখী জমিদার মহারাজা স্যার

মহাতাপ রায় বাহাদুরের একজন অন্দর মহলের কর্ম্মচারী, স্বর্গগত বাবা মহারাজের আমল থেকে বহাল আছি। অধমের নাম শ্রীহরিসাধন মৈত্র, সাতঘরের কুলীন ব্রাহ্মণ আমরা। তারপর, হ্যাঁ, আসল কথা বলি শুনুন। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। বড় মহারাণীর তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান, ঠিক যেন ননীর পুত্তলি। হঠাৎ একদিন খেলা করতে করতে ধড়াস করে তিনি আছড়ে পড়লেন, ব্যস আর উঠেন না। দৌড়ে এসে আমরা সকলে দেখি তড়কা আরম্ভ হয়েছে, ভেদবমিও—। কোলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা এলো, লাট সাহেবের সাহেব ডাক্তারও, কিন্তু সকলেই সেই এক কথাই বলে গেলো, সাত দিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। গলার মধ্যে নাকি, কি বলে গেলাণ্ড (gland) না কি সেই হয়েছে। রাণীমা তাই শুনে সেলুন ভাড়া করে সোজা চ'লে গেলেন, হরিদ্বারে তাঁর সেই সাধক গুরু প্রভানন্দগিরির কাছে। তাঁর আশ্রমের দুয়ারে এসে তিনি আছড়ে পড়লেন, খান না দান না; সঙ্গে আছে এই অধমতারণ বুড়ো, কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম মশাই। গুরু মহারাজ মা'কে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে, অবশেষে ধ্যানে বসলেন, নাচার হয়েই। তিন দিন তিন রাত্রি পরে তিনি কি প্রত্যাদেশ পেলেন জানি না, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মা'কে জানালেন, 'যা বেটী যা, ছেলে তোর ভালো হয়ে গেছে।' তা আমি মশাই, কোন কালেই ঠাকুর দেবতায় এতটা বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু মশাই, বলবো কি, ফিরে এসে দেখি, যে ছেলেটার মরবার কথা, সে কি'না হল ঘরে লাট্টু ঘোরাচ্ছে! জয় লক্ষ্মীনারায়ণজী, বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ! বাবা-আ। এর পর কি হলো? হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি, দেবতা। বলছি, শুনুন। এর পর ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে আবার আমরা গাড়ী রিজার্ভ

করতে যাচ্ছি, এমন সময় গুরুঠাকুরের এক চেলা এসে হাজির। তিনি রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন,—

'গুরুদেব বলে পাঠিয়েছেন, হরিদ্বার যাবার আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। ছেলেটি বেঁচে গেছে গুরুদেবের স্বর্গগত গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত হাওড়া জিলার অমুক গ্রামের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউএর কৃপায়। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরই গুরুদেবকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন। গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে আমরা যে লক্ষ টাকা দান করতে মনস্থ করেছি তা তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। আশ্রমের জন্য একটি মাত্র পর্ণ কুটিরই যথেষ্ট। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর আবাসস্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করে দেবার জন্যে গুরুদেবকে স্বপ্ন দিয়েছেন। অতএব আমরা যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ জীউএর সেবায়েত পরমভক্ত অমুক গ্রামের অমুকের হস্তে লক্ষমুদ্রা পত্র পাঠ দিয়ে দিই, ইত্যাদি।'

এর পর ভদ্রলোক, লক্ষ্মীনারায়ণজী, লক্ষ্মীনারায়ণজী, বাক্য উচ্চারণ করতে করতে কেঁদে ফেললেন। এত বড় একটা সুখবরের পর, লক্ষ্মীনারায়ণ জীউএর দয়ার কথা স্মরণ করে আমিও কেঁদে ফেললাম। উভয়ে এই ভাবে কতক্ষণ কেঁদেছি, তা স্মরণ নেই। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক চোখের জল মুছে প্রস্তাব করলেন, 'তা চলুন, গাত্রোত্থান করা যাক্। শুভস্য শীঘ্রম্। মহারাজা এখন দমদমার প্রাসাদেই আছেন, মহারাণীও। রেজিষ্টারী কবলা প্রভৃতির ব্যাপারটা পাকাপাকি করে আসা যাক্। রাজা-রাজড়ার মন, বলাতো কিছু যায় না; ক্ষণেক হাসি, ক্ষণেক ফাঁসি। এই দেখুন না, দিনে দশবার তাঁরা আমাকে বরখাস্ত ক'রে পুনরায় কর্ম্মে বহাল করছেন। খেয়ে দেয়েই রওনা হওয়া যাক, দেরী করা ঠিক নয়।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হয়ে, আমরা উভয়ে যখন রাজা

বাহাদুরের দমদমার বাগান বাড়ীতে পৌছলাম, বেলা তখন পাঁচটা হবে। প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী। তক্‌মা আঁটা দরোয়ানের দল এবং নীল কোর্ত্তা পরা চাপরাশীরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে। প্রাসাদের উঠবার সিঁড়ির দুই পাশে দুইটা বড় বড বাঘ সাজানো ছিলো। বাঘ দুইটির সহিত সংলগ্ন দুইটি ফোযারাও দেখলাম। সিঁড়ির শেষ ধাপটায় পা দেওয়া মাত্র, বাঘ দুইটা গাঁক করে ডেকে উঠলো। চমকে উঠে দুই পা পিছিয়ে এসে দেখি, ফোয়ারা দুইটা হতে গোলাপ জল পড়ছে। ভদ্রলোক আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'ও কিছু না, সিঁড়ির তলায় স্প্রিঙএর যন্ত্র লাগানো আছে, তাই এমন হয়। রাজ-রাজড়ার কাণ্ড মশাই, কি'ই আর বলব।' দরবার ঘরে এসে দেখি, রাজা বাহাদুর একটা মূল্যবান ফরাস ঢাকা চৌকিতে বসে মখমলে মোড়া তাকিয়ায় হেলান দিয়ে, জরীর টুপি পরা এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে জুয়া খেলছেন। আমাকে পাশের একটা স্প্রিঙএর সোফার উপর হাতে ধরে বসিয়ে দিয়ে নিম্ন স্বরে মৈত্র মশাই জানালেন, 'চুপ করে বসে থাকুন, কথা বলবেন না, ওঁর মেজাজ এখন গরম। দেখছেন না, জুয়োয় উনি হেরেই চলেছেন।' তেইশ হাজার টাকা হারার পর রাজা বাহাদুর খেঁকরে উঠে বলে উঠলেন, 'এ বেটা নিশ্চয়ই যাদু জানে। এই দরোয়ান, ইসকো নিকাল দেও।' মাড়োয়ারী ভদ্রলোক চলাক লোক। বেগতিক বুঝে জুয়ায় জেতা টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এক দৌড়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, বাড়ী থেকেও। অনতিদূরে একজন ভাটিয়া ব্যবসায়ী বসেছিলেন। একটু এগিয়ে এসে কুর্ণিশ জানিয়ে তিনি বললেন, 'রাজাসাহেবের আজ্ঞা হোয় তো মে ভি থোড়া খেল্ চুকে।'

হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁধান একটা টিপয় চৌকির সামনে রাখা ছিল, এবং সেই টিপয়টির উপর রাখা ছিল অর্দ্ধপীত একটা মদের গেলাস।

টিপয়টির উপর হ'তে গেলাসটা তুলে নিয়ে, তাতে চুমুক দিতে দিতে রাজা বাহাদুর উত্তর দিলেন, 'নেহি, কভি নেহি, তুম্‌ভি আউর এক শয়তান আছে।' এর পর হঠাৎ রাজা বাহাদুরের লক্ষ্য পড়লো আমার উপর। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তিনি বলে উঠলেন, 'হাম্‌ ইন্‌কো সাথ খেলেঙ্গে। কি ঠাকুর মোশায়, খেলবেন না কি?' অকুস্থলের কাণ্ডকারখানা আমাকে অবাক করে তুলেছিল। আমার মুখ দিয়ে এর কোনও উত্তরই বার হলো না। মৈত্র মশাই এইবার এগিয়ে এসে কুর্ণিশ জানিয়ে উত্তর করলেন, 'আজ্ঞে না, ইনি হচ্ছেন সেই লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের সেবায়েৎ পরম ভক্ত শ্রীযুত অমুক।' আমার পরিচয় পেয়ে রাজাসাহেব অত্যন্ত রূপ লজ্জিত হয়ে উঠে মাথা নুইয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না ঠাকুর মশাই। এই জুয়োই হচ্ছে আমার একমাত্র দুর্ব্বলতা। কি করব বলুন, এই সব আমাদের রক্তের মধ্যেই রয়েছে। পূর্ব্বপুরুষদের সুকৃতির ফল আর কি! তা তাঁদেরই তো সন্তান আমি, হে হে হে।' এর পর হঠাৎ রাজাবাহাদুর মৈত্র মশাইকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'তা তুই ঠাকুর মশাইকে এখানে আনলি কেন? তোর কি এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই। ছিঃ! এটর্ণী বাড়ী থেকে মন্দির সংক্রান্ত দলিল-পত্রগুলোও বোধ হয় এখনও আনিস্‌ নি। এ্যাঁ, কি'রে, কথা বলছিল্‌ না যে, আনিস্‌ নি তো; দেখছেন? দেখছেন তো? ওর কাণ্ডই এই রকম। ওগুলো আগে এনে তবে তো ওঁকে আনা উচিত ছিল। যা, এখন ওঁকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু বিশ্রামের বন্দোবস্ত কর। ওঁর সেবার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।"

মনিবের তাড়া খেয়ে মৈত্র মশায় আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে এসে গজরে উঠে বললেন, 'দেখেছেন, দেখেছেন তো, সব দোষ যেন আমারই।'

এর পর মৈত্র মশাইএর সঙ্গে 'আলাপ করে আমি জানতে পারি, রাজাবাহাদুর একটি বোকা জমিদার। জোচ্চোরেরা কায়দা মাফিক্ জুয়া খেলে প্রত্যহই তাঁকে হাজার হাজার টাকা ঠকিয়ে নেয়। কিছুক্ষণ সংলাপের পর মৈত্র মশাই প্রস্তাব করে বসলেন, 'এক কাজ করুন না মশাই, বড় উপকার হয় তা হলে। মেয়ে দুটো আমার বড় হয়েছে, বিয়েটা তাদের তা হলে এই মাসেই দিয়ে দিই। আপনার সঙ্গে যখন উনি খেলতে রাজী হয়েছেন, তখন না হয় খেলেই দিন একটা দান। হাজার হোক আমরা চাকর লোক, আমরা তো আর ওর সঙ্গে খেলতে পারি না।'

ভদ্রলোকের এই প্রস্তাবে প্রথমে আমি কিছুতেই রাজী হই নি। কিন্তু ভদ্রলোক একরকম কান্নাকাটিই সুরু করে দিলেন, মেয়ের বিয়ে তিনি এই মাঘেই দেবেন। টাকার দরকার। কিন্তু পরে আমি লোভে পড়ে রাজী হই এবং জমিদারের সহিত খেলে নগদ তিন হাজার টাকা জিতেও নিই। খেলার কায়দা কানুন অবশ্য মৈত্র মশাই আমায় শিখিয়েছিলেন, এ ছাড়া খেলার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকাটাও দিয়েছিলেন তিনি। এই কারণে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত মাত্র দুইশো টাকা বাদে বাকি সব টাকা তাঁকেই দিয়ে দিতে হয়। এই উপকারটুকুর জন্যে মৈত্র মশাই আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান,—আমাকে দশ হাজার টাকা জোগাড় ক'রে পুনরায় সেখানে আসতেও তিনি আমায় উপদেশ দেন। কারণ তা হ'লে নাকি মন্দিরের বাবদ এক লক্ষ টাকা তো আমি পাবোই, এ ছাড়া আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা জুয়ায় জিতে আমি ঘরে ফিরতে পারব, ইত্যাদি।

লোভে পড়ে সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরে আমি গিন্নীকে জানাই, 'গিন্নী, বড় সুখবর গিন্নী, বড় সুখবর। আমার এক স্যাকরা শিষ্যের সঙ্গে আজ

হঠাৎ দেখা হলো। কাল তোমার গহনাগুলো পালিশ করিয়ে আনবো, বুঝলে।' পরের দিন আমি গিন্নীর গহনাগুলো পালিশ করবার অছিলায় তাঁর কাছ থেকে সেগুলো চেয়ে নিয়ে তা বাঁধা দিয়ে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করি। এ ছাড়া পৈতৃক জমিজমাগুলো বাঁধা দিয়ে আরও চার হাজার টাকা যোগাড় করি। সর্ব্বসমেত আট হাজার টাকা সঙ্গে করে শুভক্ষণ দেখে বার হচ্ছি, এমন সময় আমার এক পুরাতন মন্ত্র-শিষ্য এসে সেখানে হাজির। একটু বিব্রত হয়েই আমার প্রিয় শিষ্যটিকে জানালাম, 'তা বাবা এসেছ বেশ করেছ। কিন্তু বাবা, এক্ষুণিই যে আমাকে একটা শুভ কার্য্যে বেরুতে হচ্ছে।' কথায় কথায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণের সংবাদটাও আমি তাকে জানিয়ে দিলাম। দমদমার জমিদারের বদান্যতার কথাও আমি তাকে বলতে ভুললাম না। সব কথা শুনে শিষ্যটি আমার আঁতকে উঠে দুই পা পিছিয়ে এসে বলে উঠলো, 'এঁ্যা! করেছেন কি আপনি, সেখানে গিয়েছিলেন? সর্ব্বনাশ! ওরা যে নওসেরা জোচ্চরের দল। কয়লার একটা বড় কনট্রাক্ট্ দেবে বলে ওখানে নিয়ে গিয়ে আমাকেই ওরা পাঁচ হাজার টাকা ঠকিয়েছে। আদালতে ওদের নামে তিন তিনটে ফৌজদারী মামলা এখনও পর্য্যন্ত পেণ্ডিং। আর আপনি কি'না—'

শিষ্যর কাছে আদ্যপান্ত সকল কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই, চক্ষু আমার কপালে উঠে। আমি বুঝতে পারি, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকান্ত জীউ সত্য সত্যই জাগ্রত দেবতা। যথা সময়ে তিনি শিষ্যকে মদ্ সকাশে পাঠিয়ে তিনিই আমাকে রক্ষা করলেন। তা না হ'লে গিন্নীর হাতেই আমার প্রাণটা যেতো, অতগুলো গহনা, ছিঃ! বার বার যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে আমি ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাই—'বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ, অসীম তোমার দয়া, এ অধম ভক্তের উপর।'

অসাধারণ প্রবঞ্চনার এই বিশেষ অপপদ্ধতিতে প্রবঞ্চকগণ বিবিধ রূপ রগড়ার আশ্রয় নেয়। অবস্থা বুঝে এরা প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের সৎ প্রেরণাসম্ভূত আদর্শ উদ্বেলিত করেও উহারই দ্বারা তারা তাদের সুপ্ত অপস্পৃহার বহির্বিকাশ ঘটিয়েছে। কিরূপে ইহা সম্ভব হয় তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমাকে ইলেকট্রিক ওয়ারিঙ-এর একটা কনট্রাক্ট দেবে বলায় আমি সেই জন্য তাদের আড্ডা ঘরে উপস্থিত হই। এই সময় আমি ওদের বসবার ঘরে একটি নিরীহ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে শায়িত দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি 'হ্যাঁ মশাই এইটি কি অমুক বাবুর বাটী। উত্তরে বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাঁ বলে আমাকে একটি শোফায় উপবেশন করতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে অপর এক ভদ্রলোক বাটীর ভিতর হতে সেইখানে আসা মাত্র তাঁকে উদ্দেশ করে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'দয়াময় আর কতো ভোগাবেন? কখন আপনাদের কর্ত্তা আসবেন বলুন তো? ঐ দেখুন আরও এক ভদ্রলোক ওঁর খোঁজে এসেছেন। কিছুক্ষণ পর আমার পরিচিত ঐ বাটীর মালিক বাহির হতে এসে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁর সহিত ঐ ব্যক্তির কলহের অভিনয় সুরু হ'ল। কলহের বিষয়বস্তু হতে আমি বুঝলাম স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই এই কলহের সৃষ্টি। পরে আমার ঐ পরিচিত ব্যক্তি আমাকেই মধ্যস্থ মেনে আদ্যপান্ত ঐরূপ একটি ঘটনা সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করে দিয়ে বলেন, 'বলুন তো আমার অপরাধ কি? ঐ বোকা জমিদারটিকে জুয়ায় হারাবার কায়দা কানুন তো ওঁকে আমিই শিখিয়েছি, আর এই জন্যই তো তা হতে আমার প্রাপ্য হিস্যা আমি কেটে নিয়েছি। আমরা তার বেতন ভোগী নকর তা না হলে ওর সাহায্য না নিয়ে আমি নিজেই ঐ বোকা শয়তানটার সঙ্গে জুয়া খেলে টাকাটা জিতে নিতে পারতাম।

প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া মাত্র আমার মন আমার ঐ পরিচিত ব্যা‌ক্তি উপর স্বভাবতঃই বিরূপ হয়ে উঠছিল। আমার মনের এই অবস্থা বুঝে ঐ ভদ্রলোক তখন কৈফিয়ৎ স্বরূপ বললেন, 'জানেন, সাধে কি আমি ওঁর এই ভাবে সর্ব্বনাশ করছি? আমাকে গোমস্তার চাকরীটা দিয়ে বলে কি'না আমার ভগিনীকে টাকার বিনিময়ে তার উপভোগের জন্য এনে দিতে। জানেন আপনি উনি এই ভাবে এই দেশের কত সতীসাধ্বী কন্যার সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন। ঐ শয়তান লোকটাকে জুয়ায় ঠকিয়ে অর্থ গ্রহণ করলে কোন পাপ নেই। আমি চাই শুধু ওঁর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। আসুন না, স্যার, আপনাকে দিয়েও কয় হাত ওঁর সঙ্গে খেলিয়ে কয়েক হাজার টাকা লুটে নেই। উঃ, রাগে আমার রক্ত এখনও টগবগ করে ফুটে উঠছে। চলুন কালই ওঁর সেই বাগান বাড়ীতে আপনাকে আমি খেলবার জন্য নিয়ে যাব।"

বহু ক্ষেত্রে এই সকল দালালরা তাদের 'শিকার'দের সহিত নানা উপায়ে আলাপ জমাবার পর তাকে সঙ্গে করে নিমন্ত্রণের অছিলায় তার স্ববাটীতে নিয়ে গিয়েছে। এমন সময় পথিমধ্যে ঐ দলের অপর আর এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে ঐরূপ কলহের অভিনয় সুরু করে দিয়েছে। এই কলহের কারণ ও বিষয়বস্তু অবশ্য বিবিধ রূপের হয়ে থাকে। মূল উদ্দেশ্য থাকে অবশ্য যে কোনও প্রকারে 'শিকার' বা 'ভিক্‌টিম'কে ঐ অভিনব জুয়ার কার্য্যকরণ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত করে তাকে প্রলুব্ধ করে তুলা। এই সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারকের পুত্র। আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী ও একটি ছোট-খাটো ফ্যাক্টারীর

এক। অমুক ব্যক্তি একদিন আমার অফিসে এসে আমাকে ৮০০০০৲ টাকার একজন ফাইনেন্‌সিয়ার জোগাড় করে দেবে বলে। এর পর একদিন ভদ্রলোক সস্ত্রীক আমার বাটীতে এসে বেড়িয়েও যান। কিন্তু তার পর দুই মাস তাঁর আর কোনও খবরই পাই না। পরে একদিন তিনি পত্র দ্বারা জানান যে, ইতিমধ্যে তিনি নিউমুনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় আমার কোনও খোঁজ নিতে পারেন নি। এই সঙ্গে তিনি এ'ও জানান যে, তাঁর মনিবের অমুক রাস্তার অতো নম্বর বাটীতে এখন তিনি অবস্থান করছেন এবং তাঁর ঐ মনিব আমার ফার্মের একজন ফাইনেনসিয়ার হতে রাজি হয়েছেন। এইরূপ আরও দুই তিনটি পত্র বিনিময়ের পর আমি ভদ্রলোকের নির্দ্দেশ মত তাঁর ঐ বাটীতে এসে উপস্থিত হই। ভদ্রলোক আদর আপ্যায়িত করে আমাকে তাঁদের বৈঠক-খানায় বসানো মাত্র, একজন মাড়োয়ারী এসে জানালো যে ঘোড়ার ব্যাপারে সে ঐ জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মাড়োয়ারী লোকটির বক্তব্য শুনে আমার ঐ বন্ধুবর খেঁকরে উঠে বললেন, 'কেয়া বাত্ বলতা আপ? যো বোলনে হোয় হামকো বলো। বাবুকো পাশ আপ নেহি যানে শেকথা। এর পর মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাত কচলাতে কচলাতে অনুযোগ করে বললে, হুজুর সাহেব খুদ হামকো বোলায়া। উস রোজ রেস'মে উনসে মুলাকাত হুয়া থে।' ঠিক এই সময় জমিদারবাবু অর্দ্ধ পানোন্মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে ঐ ঘরে এসে একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে বসলেন, এমন ভাব দেখিয়ে যেন ঐ মাড়য়ারী ভদ্রলোককে তিনি কোনও দিনই দেখেন নি। এর পর ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তাঁকে ঐ সকল পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, 'আপ তো ঘোড়াকো আস্তে বাহারমে বহুত লোকসান দিয়া, লেকেন আপকো হামি আভি নয়া ঘোড়াকে এক খেল দেখলায়গা।' 'কেয়া?

ঘোড়াকে খেল,' জমিদার সাহেব নির্লিপ্তভাব উত্তর করলেন, 'ঘোড়া কাঁহা হ্যায় ? তোমরা পকেটমে ?' উত্তরে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন, হাঁ হুজুর, অপ ঠিক বাতাঁয়া হ্যায়। ঘোড়া হামরা পকেটমেই মজুত হ্যায়।' এই বলে ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক পকেট থেকে প্রায় বিশটা গোল ঘুঁটি বার করে জমিদার সাহেবের সম্মুখের টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললে, 'দেখিয়ে না। আভি কেউসেন ইনলোক দৌড়েয়াগা।' আমি কৌতূহলী হয়ে টেবিলের দিকে চক্ষু ন্যস্ত করা মাত্র ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক খেলার কায়দার মহড়া সুরু করে দিলে, এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে 'বোকা' ঐ জমিদারও বাজী হারতে সুরু করে দিলে। এই দেখে আমার বন্ধুবর নিম্নস্বরে আমাকে বললে, বুঝলেন ব্যাপার ? দেখে রাখুন খেলাটা। ইতিমধ্যে বাড়ী থেকে তাগীদ আসায়, জমিদার সাহেব অল্পক্ষণের জন্য অন্দর মহলে গেলে বন্ধুবর মাড়য়ারীকে সম্বোধন করে বললেন, এই বাপু, চালাকী রাখো। আমাকে ও আমার এই বন্ধুকে বখরা না দিলে বাবুসাবকে আর খেলতেই দেবো না। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে বলল, ঠিক হ্যায় বখরা মিলেগা। চাহে তো ইস বাবুজী দো এক দান খেল দেনে শেখতা। খেলাকো কায়দা হাম আভি উনকো শিখলায়া দেয়েঙ্গা।"

উপরে বিবৃতিতে দেখা যায় যে 'শিকার' এর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের পর কোনও এক অজুহাতে দুইমাস সময় লওয়া হয়েছে। এইভাবে কয়েকটি শিকারকে জিইয়ে রেখে, ইতিমধ্যে যে সকল 'শিকার' তৈরী হয়ে গিয়েছে তাদের বধ করার পর এই সকল জিইয়ে রাখা শিকারদের উপর একে একে এরা হাত দিয়েছে। ইহাতে সুবিধা এই যে এতদ্বারা শিকারগণ মনে করে যে তাদের ঐ নূতন বন্ধুর এতে বিশেষ কোনও স্বার্থ নেই, তা না হলে প্রথম কয়দিনের মধ্যে যা করবার তা না করে এত

দেরী করেই বা উনি আসবেন কেন ? এ'ছাড়া বহুক্ষেত্রে শীকারগণই তাদের আসতে দেরী হতে দেখে যেচে তার বাটী গিয়ে তাকে ঐ ধনী ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। এই অবস্থায় প্রবঞ্চকগণ তাদের আরও বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য বহু গড়িমসি ও টালবাহানার পরে তবে তাদের ঐ আড্ডায় প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে।

বহুক্ষেত্রে শিকারদের নিকট পর্য্যাপ্ত অর্থ আছে কি'না তা পরখ করে দেখে নেওয়া হয়ে থাকে। এই সময় খেলতে বসে জমিদার হঠাৎ অপমানিত মনে করে বলে উঠেন, কিই এই লোকটার সঙ্গে খেলব। কতো টাকা এর আছে। এই আমি রাখলাম পাঁচ হাজার টাকার নোট, রাখুক আগে ও ওর টাকাও এখানে। আমি ভিখিরীদের সঙ্গে খেলি না। তবে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নোটের সাইজে কাটা এক বাণ্ডিল কাগজের উপরে ও নিম্নে একখানা করে ১০০৲ টাকা নোট রেখে ঐ বাণ্ডিলটা বেঁধে রাখা হয়। শিকারমন্য ব্যক্তিগণ যদি অধিক অর্থ ঐ দিন জমির উপর না রাখতে পারে তা' হলে তাকে বিদেয় দিয়ে দলেরই এক ব্যক্তির সহিত খেলার সূচনা করা হয় এবং ঐ শিকারমন্য ব্যক্তির সম্মুখেই রাজাবাহাদুর-গণ প্রতিদানেই হেরে যেতে থাকেন। এই সুযোগে দালালগণ ঐ সকল শীকারমন্য ব্যক্তিদের পরদিন প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্গে করে আনবার জন্য উপদেশ দিতে থাকেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে সুবিধামত এই সকল লোভী ব্যক্তিদিগকে, তাদের শ্রীঅঙ্গের সোনার ঘড়ি, হীরার আংটি বা সোনার বোতামের বিনিময়ে এই খেলা খেলবার জন্য অকুস্থলেই দালালগণ কর্জ্জ দিয়েছেন। কিন্তু আখেরে জুয়ায় হার হওয়ায় এই সকল দ্রব্য তাঁরা আর ফেরত পান নি। এই সকল রাজাবাহাদুরগণ দামী সিল্কের পাঞ্জাবী ও বহু হীরার আংটি পরিহিত হয়ে আসরে উত্তীর্ণ হলেও এরা কিন্তু দলের

প্রধান ব্যক্তি হয় না। প্রায়শঃক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রথমে খেলার সূচনা করে তারাই হয় দলের একজন প্রধান ব্যক্তি।

এই সকল অপরাধীদেরই আমরা নওসেরা ঠগী বলে থাকি। বিচারের সময় এরা আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রায়ই বলে থাকেন, ফরিয়াদীর সহিত তাঁরা জুয়া খেলেছিলেন। জুয়ায় হার হওয়ায় ফরিয়াদী অর্থ হারিয়েছেন, কেহ তাকে প্রতারণা করে নি। এই জুয়া ফরিয়াদী স্বইচ্ছাতেই খেলেছে, অতএব আসামীরা প্রতারণার অপরাধে অপরাধী হতে পারে না। অপরদিকে ফরিয়াদীর পক্ষ হ'তে বলা যেতে পারে যে আসামীরা কেবলমাত্র জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে ফরিয়াদীকে অকুস্থলে আনে নি, তারা তাকে প্রতারিত করার জন্যেই সেখানে ভুলিয়ে এনেছে। প্রতারণা অপরাধের কর্ম্ম পদ্ধতির (Modus operendi) একটি অংশরূপে এই দ্যূত-ক্রীড়ায় অবতরণ করা হয়। এ ছাড়া এই দ্যূত-ক্রীড়ার মধ্যে এমন অনেক ফাঁকি ছিল, যার জন্যে এই জুয়াকে আদপে জুয়া বলা চলে না।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণা অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ। "যদি কেহ প্রতারণার দ্বারা অসদুদ্দেশ্যে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, (১) যার দ্বারা কি'না, প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন দ্রব্য অপর আর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, (২) কিংবা কেহ যদি কাহারও উক্ত রূপ কার্য্য বা উক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার দ্রব্যাদি অপর কোনও এক ব্যক্তির দখলীভুক্ত হতে সম্মতি জানায়, (৩) কিংবা কেহ যদি উক্তরূপে প্রতারিত হয়ে এমন কোনও এক কার্য্য করে বসে বা উহা না করে, যে কার্য্য করা বা না করার জন্যে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৈহিক, আর্থিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা হতে পারে—যাহা কি'না প্রতারিত ব্যক্তি ঐরূপ ভাবে প্রতারিত না হলে কখনই করতো না বা তা করতে

বিরত থাকতো না; প্রবঞ্চকদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কার্য্যকে শঠতা, প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা অপরাধ বলা হবে।"

এই বিশেষ ক্ষেত্রে উক্তরূপে প্রতারিত না হলে, প্রতারিত ব্যক্তি কখন দ্যুত-ক্রীড়ায় আসক্ত হতো না। প্রতারিত ব্যক্তিরা লোভে পড়ে জুয়া খেলেছেন, এই ভয়ে ও লজ্জায় তাঁরা প্রায়ই থানায় আসেন না। এঁদের একটা মিথ্যা ধারণা জন্মে, যে তাঁরাও জুয়া খেলেছেন; এই কথা থানায় প্রকাশ পেলে তাঁদেরও শাস্তি হবে। প্রবঞ্চকরাও প্রতারিত ব্যক্তিদের এইরূপ ভয় দেখিয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা ভুল। মানুষের স্বভাবজাত অপস্পৃহার কৃত্রিম উপায়ে যারা বহির্বিকাশ ঘটায়, আসলে তারাই অপরাধী। বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা যে কোনও দুর্ব্বল চিত্ত মানুষকে উক্তরূপে লোভী করে তোলা সম্ভব। নওসেরা পদ্ধতি মানুষের দেহকোষে অপস্পৃহার অবস্থিতি প্রমাণিত করে। (অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড দেখুন)। ভারতীয় পুলিশ নওসেরা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক দিকটা বিবেচনা করে প্রতারিত ব্যক্তিদের প্রতি বরং সহানুভূতিশীল হন এবং প্রবঞ্চকদের জন্যে যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এইরূপ ভাবে প্রতারিত হলে প্রতারিত ব্যক্তিদের যথা শীঘ্র থানায় খবর দেওয়া উচিত।

তিমি মৎস্য নয়, আসলে উহা একটি স্তন্যপায়ী জীব। অনুরূপ-

বিড্‌-গ্যাম্ব্‌লিঙ্‌ বা ঘুঁটিখেল্‌, জুয়া নামে অভিহিত হ'লেও আসলে একটি প্রতারণা অপরাধ। এই খেলা যে জুয়া নয়, আসলে উহা প্রতারণা মাত্র—এই বিশেষ সত্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত। বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝতে গেলে প্রথমে বুঝা উচিত, প্রকৃত জুয়া কাকে বলে। যে সকল খেলার হার জিত, চান্স (chance) বা দৈবের উপর নির্ভর করে তাকেই বলা হয় জুয়া বা দ্যুত-ক্রীড়া। যে সকল খেলায় হার বা জিত কোনও না কোনও পক্ষের skill বা নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে

তাকে জুয়া খেলা বলে না। এই নৈপুণ্য দুই প্রকারের হয়; যথা, অনু-নৈপুণ্য এবং প্রতি-নৈপুণ্য। অনু-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অর্জ্জুনের লক্ষ্য ভেদের কথা বলা যেতে পারে। অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেধের মূলে ছিল এই অনুনৈপুণ্য, দৈব নয়। কোনও ব্যক্তির মস্তকোপরি ছোট একটি বল রেখে, ৭০ গজ দূর থেকে বলটিকে গুলি বিদ্ধ করা কিংবা ২০০ গজ দূরের একটি ফল তীর দ্বারা বিদ্ধ করা রূপ খেলার মধ্যেও থাকে এই অনু-নৈপুণ্য। এবংবিধ অনুনৈপুণ্য বা চাতুর্য্য দেখিয়ে যদি কেহ অর্থ লাভ করে তাহলে উহাকে জুয়া বলা হয় না। অনুনৈপুণ্যের কথা বলা হ'ল, এবার প্রতিনৈপুণ্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যাক্। কোনও পক্ষ যদি এমন কোনও চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হতেই অবলম্বন করে, যার জন্যে কি'না উক্ত তীর বা গুলি যথাস্থানে যথাসময়ে পৌছাবে না, তাহলে উহাকে বলা হবে প্রতিনৈপুণ্য। বিড্-গ্যাম্বলিঙে প্রতারকেরা প্রতিনৈপুণ্যের সাহায্য নিয়ে থাকে। চাতুর্য্য সহকারে তারা তাস বা ঘুঁটি এমনভাবে সাজিয়ে রাখে বা সরিয়ে দেয়, যা'তে করে কি'না প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা সহজেই হেরে যায়। এছাড়া প্রতারকরা প্রতারণার উদ্দেশ্যেই মানুষকে তাদের আড্ডা-স্থলে ভুলিয়ে আনে, অর্থাৎ কি'না সুরু হ'তেই তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রতারণা।

এই সব খেলা সত্য সত্যই জুয়া বা প্রতারণা কিনা তা নির্ভর করে এই chance বা দৈব শব্দটির প্রকৃত সংজ্ঞার উপর। এই দৈব শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে হ'লে আরও দুইটি অনুরূপ শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝা দরকার। উহাদের যথাক্রমে Accident বা দৈব-দুর্ঘটনা এবং দৈব-সম্মিলন বা chance coincidence বলা হয়। নৈপুণ্যমূলক খেলার সাফল্যের মধ্যে যেমন থাকে চাতুর্য্য, তেমনি প্রতিটি দুর্ঘটনার মূলে থাকে ব্যক্তি-বিশেষের অবহেলা বা অসাবধানতা। অপরদিকে কোনও

অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা বিনা প্রচেষ্টায় হঠাৎ যদি পেয়ে যাই, কিংবা যে লোকটিকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন, হঠাৎ যদি তাকেই রাস্তায় দেখতে পাই, তাহলে এইরূপ পাওয়া বস্তু বা ব্যক্তিকে আমরা বলে থাকি দৈব-সম্মিলন বা chanced coincidence, এই দৈব-দুর্ঘটনা বা দৈব-সম্মিলনের সহিত আসল দৈব বা 'চান্স'এর কোনও সম্বন্ধ নেই। স্পটি সাহেব জুয়া খেলার মূল ভিত্তি, এই দৈব বা 'চান্স'এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এইরূপ। "যে খেলায় হার জিতের আশা এবং আশঙ্কা থাকে প্রায় সমান সমান বা ৫০%, ৫০%, তাকে বলা যেতে পারে জুয়া খেলা। সাহেবের মতে হারার আশঙ্কা শতকরা ৫০ ভাগের বেশী থাকলে বুঝতে হবে, এই খেলার মধ্যে কারসাজী আছে। একটি পয়সা যদি বার দশেক "টস্" করা যায় তা হলে কতবার "হেড্" এবং কতবার টেল্ পড়বে তা বুঝা যায় না। কিন্তু কেহ যদি এই পয়সাটিকে দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার বার "টস্" করেন তা হলে দেখা যাবে, "হেড্" এবং টেলের সংখ্যা হয়েছে প্রায় সমান সমান। এই দৈব বা 'চান্স'এর প্রকৃত দর্শন বা ফিলসফি হওয়া উচিত এইরূপ। যে সকল খেলায় এই দৈব বা চান্স উপরি উক্ত সংজ্ঞানুযায়ী হয় না, সেই সকল খেলাকে জুয়া না বলে প্রতারণাই বলা উচিত। রেশ বা ঘোড়দৌড়ের কোন্ ঘোড়াটি প্রথম হবে তা সাধারণতঃ নির্ভর করে দৈব বা চান্সএর উপর, কারণ অশ্ব পশু মাত্র, পশু জীবের মতিগতির উপর কারো হাত নেই। কিন্তু কোনও "জকি" যদি শেষ সময়ে রাশ টেনে ধরে অশ্বটিকে প্রথম হতে না দেয়, তা হলে উহাকে প্রতারণা বলা হবে। এই সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বলা যাক্।

"কোনও এক শহরের রেইস্‌কোর্সে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। যে ঘোড়াটিকে সকলেই "গুড ফর নাথিং" বলে জানতো সেই ঘোড়াটিই

সেইদিন প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই ঘটনার ফলে বহু লোকের বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়, এবং দৌড় ক্লাবের মালিকদের ক্ষতি হয় অসামান্য। তদন্ত দ্বারা পরে জানা যায় যে ঘোড়াটিকে দৌড়ানর অব্যবহিত পূর্ব্বে মাদক দ্রব্য সেবন করানো হয়েছিল, এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবি ফল স্বরূপ অশ্বটি হঠাৎ অত্যন্ত রূপ তেজী হয়ে উঠে। অশ্বটির মূল পরীক্ষার দ্বারা এই সত্য প্রমাণিত হয়। জনসাধারণকে এইরূপ ভাবে প্রতারিত করার জন্য ষ্টুয়ার্টগণ অশ্বের মালিকের শাস্তি-বিধান করেন।"

উপরি উক্ত বিতণ্ডা (Argument) দ্বারা আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পারি, এইরূপ ঘুঁটিখেলা বা বিড্ গ্যামবিলিঙ্ আসলে জুয়া নয়, উহা প্রতারণা মাত্র। এইরূপ প্রতারণার জন্যে নওসেরা অপরাধীদের দণ্ড হওয়া উচিত। এইরূপ অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

এই সকল অপরাধীদের সাজা দেওয়ার অপর আর এক অসুবিধা আছে। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে এমন কতকগুলি ধারা আছে, যে সকল ধারানুযায়ী মামলা হলে ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে আসামীর বিরুদ্ধে তাদের নালিশ প্রত্যাহার করতে পারে। ইংরাজীতে এইগুলিকে বলা হয় "কমপাউণ্ডেবল কেস। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে প্রতারণা একটি কম্পাউণ্ডেবল কেস। এই কারণে ধরা পড়ে চালান হবার পর দুর্ব্বৃত্তেরা ফরিয়াদীকে তার অপহৃত অর্থ ফেরত দিয়ে তার সঙ্গে মামলাটি মিটিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করে।* কখনও কখনও এরা

* কখনও কখনও নিম্ন আদালতে সাজা হওয়ার পর এরা হাইকোর্টে আপীল দায়ের করেছে, এবং ঐ উচ্চ আদালতে শুনানির সময় মামলাটি তারা ফরিয়াদীর সহিত মিটিয়ে নিয়েছে।

ফরিয়াদীকে টাকা খাইয়ে তাকে পুলিশের নাগালের বাইরে সরিয়েও নেয়। আমার মতে ফরিয়াদীর এই দ্বিতীয়বারের অপরাধ সত্যকার অপরাধ এবং উহা ক্ষমারও অযোগ্য।

এইবার মানুষ কেন এইরূপ হাস্যকর ভাবে ঠ'কে থাকে, সেই সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। কথিত আছে—লোভ এবং ক্রোধ, এই দুই রিপু মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়। এই অবস্থায় তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না, এই অবস্থায় শিশুরও বোধগম্য সত্যটিও সে উপলব্ধি করতে অপারক হয়। কথাটি অতীব সত্য। এর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে; প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নির্ব্বুদ্ধিতা এবং চতুরতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এই লোভ মানুষের চতুর মনটিকে বিচ্ছিন্ন করে (split up) এমন ভাবে প্রদমিত রাখে, যে উহা কিছুক্ষণের জন্য আর কার্য্যকরী থাকে না। উত্তেজনার কারণেও এইরূপ ঘটে থাকে। এই সুযোগে দুর্ব্বৃত্তরা বাক্‌প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মনের দুর্ব্বল বা নির্ব্বোধ অংশটিকে ভুল বুঝিয়ে তার দ্বারা নানারূপ কার্য্য করিয়ে নেয় বা নিতে পারে। উপরি উক্ত রূপ অসাধারণ-প্রবঞ্চনা এই মতবাদের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই কারণে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রস্তাব সকল কোনও এক নিরপেক্ষ ব্যক্তি দ্বারা সকল সময়েই যাচাই করে নেওয়া উচিত। লোভ, আশা এবং উত্তেজনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বক্তিদের কিরূপ পরিমাণে বুদ্ধিহীন করতে পারে তা এইভাবে প্রতারিত কোনও এক স্কুল মাষ্টারের নিম্নোক্তরূপ বিবৃতিটি পাঠ করলে বুঝা যাবে।

"আমি পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি স্মরণ করে বরং লজ্জিতই হয়ে উঠি। আমার মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তারা যে এভাবে ঠকাল, তা ভেবে আমি অবাক হই। আমি নিজেও অনেককে ঠকিয়েছি, ঠকামীর পন্থাগুলি সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত থাকা সত্ত্বেও আমি ঠকেছি, তার কারণ

লোভ আমার স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি সাময়িক ভাবে অপহরণ করেছিল; তা না হ'লে অত বড় একজন মহাজনের সন্ধানে আমি ঐ সামান্য খোলার বাড়ীতে যেতাম না। তারা যখন বলল, মহাজনটি কোনও এক বিশেষ কারণে এই সময়টায় ঐখানে এসে থাকেন, তা তখন আমি অবলীলাক্রমেই বিশ্বাস করি। মহাজনের সাজানো ভৃত্যটি যখন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে জানাল, 'দয়াময়, আপনি আমার মনিবকে বাঁচান, তা না হ'লে ওরা ওঁকে মেরেই ফেলবে।' তার সেই কান্নাকে আমি মায়া কান্না বলে আদপেই বুঝি নি। সাজানো জুয়ায় সর্বস্বান্ত হওয়ার পরই কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি আবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রায় মাইল পাঁচেক উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হেঁটে চলি, প্রায় সাত আট দিন এই লজ্জাজনক কথা কাউকে জানাইও না, জানালে হয়ত সেইদিনই আসামীরা ধরা প'ড়ত এবং আমার অপহৃত অর্থও হয়ত আমি পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করতে সক্ষম হতাম।"

নওসেরা—অন্যান্য

এই বিড্ গাম্বলিঙএর অভিনয় ব্যতীত অন্যান্য রূপ অভিনয়ের দ্বারাও নওসেরা দুর্ব্বৃত্তরা দুর্ব্বল চিত্ত মানুষদের ঠকিয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন নূতন ব্যবসাদার। আমার ঔষধপত্রের কারবার আছে। দুষ্প্রাপ্য বিধায় আমার দোকানে কিছু কুইনাইনের ঘাটতি পড়ে। ফলে প্রয়োজনীয় কুইনাইন আমি চোরা বাজার (Black market) হতে সংগ্রহ করতে মনস্থ করি। অচিরে একজন

দালালেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে পারমিট্ বা ছাড়পত্র ব্যতীত কুইনাইন্ ক্রয় বা বিক্রয় নিষিদ্ধ। দালালটি আমাকে গোপনে এই কুইনাইন্ ক্রয় করবার জন্যে পরামর্শ দেন। এই জন্য একজন বড় ভাটিয়া ব্যবসাদারের কাছে তিনিই আমাকে নিয়ে যান। ভাটিয়া ব্যবসাদার ভদ্রলোকটির কাছে আমি এও শুনি যে সরকারী ট্রেজারী হতে কুইনাইনের টিনগুলি কোনও এক ব্যক্তি চুরি করে তাঁর কাছে রেখে গেছে বিক্রয় করে দেবার জন্যে। এই সময় কুইনাইনের আমার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আমার লোভ বেড়ে যায়, চোরাই মাল জেনেও সস্তা দরে আমি উহা কিনতে রাজী হই, ভাটিয়া মহাজনটি কিন্তু কিছুতেই স্ববাটীতে মাল আনতে রাজী হন না। তিনি আমাকে সহরের একটি নিরালা উদ্যানে দুপুর বেলায়, মূল্য বাবদ চারি হাজার টাকা সমেত হাজির থাকতে অনুরোধ জানান। যথা সময়ে নির্দ্ধারিত স্থানে এসে আমি হাজির হই। ঔষধের মূল্য বাবদ চারি হাজার টাকা ব্যাপারীটির হাতে হিসাব মত তুলে দিয়ে মার্কামারা কুইনাইনের টিনগুলো গুণে নিচ্ছিলাম। নিরালা দুপুর। সেই সময় সেইখানে জনপ্রাণীরও আসবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই সেখানে মোটা মোটা জন চার সি আই ডি পুলিশের আবির্ভাব হল।* পুলিশরূপে তাদের বুঝতে পারা মাত্র, দালাল ও সেই ব্যাপারীটি উভয়ে টাকা নিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। পালাবার সময় দালালটি অস্ফুট্ স্বরে আমাকে সাবধান করে বলে গেলো, 'মশাই পালান, শীঘ্র পালান, গোয়েন্দা পুলিশ এসেছে, ঐ।' তাদের পিছু পিছু আমিও সরে পড়ছিলাম, কিন্তু পুলিশ ক'য়জন দৌড়ে

* যে সকল পদ্ধতিতে পুলিশের অভিনয়ের ব্যবস্থা আছে, তাকে বলা হয় "ধড়িবাজ" পদ্ধতি।

এসে আমাকে ধরে ফেলল, তাদের নেতা ছিল একজন ছদ্মবেশী জমাদার। গোঁফ মুচড়ে আমার মাথায় একটা চাঁটি কসিয়ে তিনি বললেন, 'বাতায়ে শালা জলদি, কোউন লোগ ভাগা আভী।' এর পর জমাদার সাহেব কুইনাইনের টিন কয়টি আমার নিকট হ'তে কেড়ে নিয়ে সঙ্গের লোকেদের হুকুম জানাল, 'লে চলো, শ্যালেকো থানামে।' চোরাই মাল ক্রয়ের শেষ পরিণতি যে জেল তা আমার জানা ছিল, নাচার হয়ে কুইনাইনের টিনগুলো, এবং সেই সঙ্গে আমার শেষ কপর্দ্দকটিও তাদের ঘুষ দিয়ে আমি মুক্তি ক্রয় করি। তিন দিন তিন রাত পরে আমি জানতে পারি যে এই লেন্‌দেন্‌টি আসলে ছিল একটি অভিনয় মাত্র। এমন কি পুলিশ কয়জনও আসল পুলিশ নয়, জাল পুলিশ মাত্র। দালাল, ব্যাপারী, পুলিশ—সকলেই একই ঠগী দলের দলী। ভয়ে ও লজ্জায় বিষয়টি আমি চেপেই গিয়েছিলাম কিন্তু পরে কোনও এক বন্ধুর পরামর্শে আমি এ সম্বন্ধে থানায় এজাহার দিই। তদন্তের পর পুলিশ অপরাধী কয়টিকে ধরে আনলে আমি তাদের সনাক্তও করি।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অপরাধ-পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু অদল বদলও দেখা যায়। অর্থাৎ কি'না জাল পুলিশের বদলে প্রথমে এসে হাজির হয় সাজানো গুণ্ডার দল—জন পাঁচ ছয় ষণ্ডামার্কা লোক হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে উভয় পক্ষকেই মারধর করে এবং অর্থাদি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে থাকে। এর কিছু পরেই আবির্ভূত হয় জাল পুলিশের দল। এই জাল পুলিশের আবির্ভাবে, সাজানো গুণ্ডারা পলায়ন করে এবং পলায়নে অপারক হয়ে প্রতারিত ব্যক্তি যথারীতি ধরা প'ড়ে ঘুষ দিয়ে আত্মরক্ষা করে।

উপরের ঘটনাটি অসাধারণ প্রতারণার অপর একটি উদাহরণ। আমি এমন অনেক ব্যক্তির কথাও শুনেছি যে কি'না গোপনে নিষিদ্ধ কুইনাইন

কিনে দেখেছেন টিনগুলিতে কুইনাইনের বদলে ময়দা ভরা রয়েছে। এইভাবে প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও এ কথা তাঁরা পুলিশকে জানান নি, কারণ তাঁদের ধারণা, নিষিদ্ধ পণ্য বে-আইনি ভাবে সংগ্রহ করতে তারা প্রয়াস পেয়েছেন, এ কথা স্বীকার করলে তাঁদেরও হয়ত সাজা হবে। কিন্তু তাঁদের এইরূপ ধারণা ভুল। নওসেরা দুর্বৃত্তদের প্রত্যেকটি অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধেই পুলিশ অবগত আছে। কি রূপে মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত করে নওসেরা দুর্বৃত্তরা মানুষকে লোভী করে তুলে তাদের ঠকিয়ে থাকে, তা পুলিশ ভালরূপেই জানে। এই সব অপরাধ সম্বন্ধে প্রতারিত ব্যক্তিরা থানায় যথাসত্বর এজাহার দিলে তাঁরা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের উপকারই করবেন—এই ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে তাদের কোনওরূপ বিপদেরই সম্ভাবনা নেই।

সাধারণতঃ নওসেরা অপরাধীরা অপকর্মের সময় কোনওরূপ বল প্রকাশ করে না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগেরও কথা শুনা গিয়েছে। প্রতারণার জন্য অকুস্থলে নীত ব্যক্তিদের কেহ কেহ দুর্বৃত্তদের এই অভিনয় (মধ্যপথে) ধরে ফেলে স্থান ত্যাগ করতে চায়, সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের অক্ষত দেহে যেতে দেওয়াই হয়। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অবস্থায় তার অর্থাদি বলপ্রয়োগ দ্বারা অপহরণ করা হয়েছে এইরূপও শোনা গিয়েছে। এইরূপ অপরাধকে রাহাজানি (Robbery) অপরাধ বলা হবে, প্রতারণা বলা হবে না। সাধারণতঃ ঠগী দলেরা নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধী হয়ে থাকে, এই কারণে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। বলপ্রয়োগের কথা শোনা গেলে বুঝতে হবে আসলে অপরাধীরা নওসেরা দলের নয়, কিংবা ঐ দলে এমন কাউকে কাউকে (নবাগত) নেওয়া হয়েছে, যারা কি'না আসলে সক্রিয় শোণিতাত্মক অপরাধী।

টপকা ঠগী.

টপকা ঠগী বা টপকাওয়ালারা অসাধারণ প্রবঞ্চকদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। প্রায়শঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুস্থানীরাই এই বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে লোক ঠকিয়ে থাকে। টপকা ঠগীদের দলগুলি সাধারণতঃ চার কিংবা পাঁচজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এরা পালিশ করা পিতলের টুকরাকে সোনা বলে চালিয়ে লোভী লোকদের ঠকিয়ে থাকে। সাধারণতঃ এঁরা মজুরদের হপ্তার দিনে তাদের যাতায়াতের পথে কিংবা পল্লী অঞ্চল হ'তে আগত যাত্রীদের অপেক্ষায় রেলওয়ে ষ্টেশনগুলিতে ওত পেতে বসে থাকে। শহুরে লোকেরা এদের টপকা ঠগী বলে থাকে। পল্লী গ্রামের লোকেরা এদের বলে থাকে বালা খেলার দল।

চাম্পরণ এবং নেপালের মুনিয়া, মজঃফরপুরের সোনার, দুসাদ্ ও মুণ্ডা মুসলমান প্রভৃতি স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় লোকেরা পল্লী অঞ্চলে এই খেলার সাহায্যে লোক ঠকিয়ে থাকে। এরা পিতলের বালাকে সোনা বলে চালিয়ে লোক ঠকায়; এই কারণে লোক ঠকানোর এই পদ্ধতিকে কেউ কেউ 'বালাট্রিক্'ও বলে। প্রদেশের রেলওয়ে ষ্টেশন সকল ও রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্টগুলিই এদের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। শহুরে টপকা ঠগীরা বালার পরিবর্ত্তে বার বা বাট্ ব্যবহার করে। বিড্ গ্যাম্বলিঙ এর ন্যায় ইহাও একটি বাস্তব অভিনয়। এই প্রবঞ্চকদের মধ্যে কেহ সাজে পথচারী, কেহ সাজে স্যাকরা, কেহ সাজে ভিখারী, কেহ বা সাজে পুলিশের সিপাহী। কিরূপ পদ্ধতি দ্বারা টপকা ঠগীরা বড় বড় সহরের পথচারীদের ঠকিয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"ঠাকুরমার অনুরোধে আমি পঞ্চাশ টাকা ছোটকাকাকে মণিঅর্ডার করবার জন্যে পোষ্ট আফিস যাচ্ছিলাম। রৌদ্রের প্রখর তাপে ফুটপাথগুলো তেতে উঠেছে। আমি অতি কষ্টে পথ চলছিলাম। হঠাৎ একজন আধাবয়সী গেঁইয়া গোছের লোক আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কইতে পারেন, সোনাপট্টি কোন দিকে যাতি পারবো?' ভদ্রলোককে কোলকাতায় নবাগত বলে মনে হলো; সহানুভূতির স্বরে আমি উত্তর দিলাম, 'কোলকাতায় আপনি নূতন বুঝি? তা বেশী দূর নয়, এই রাস্তা ধরেই এগিয়ে যান।' ঠিক এই সময়েই পাশের গলিটা থেকে একদল লোক সেখানে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। তাদের কথাবার্ত্তা হতে বুঝা যায় যে তারা কাল্লুভকত নামে একখানা হিন্দী ছবি দেখতে চলেছে। গেঁইয়া ভদ্রলোকটি ভিড় ঠেলে অদৃশ্য হবামাত্র, ঠং করে একটা আওয়াজ হলো। শব্দটি লক্ষ্য করে চোখ নামাতেই আমি দেখতে পেলাম নীল কাগজে মোড়া একটা সোনার বাট্ রাস্তায় পড়ে রয়েছে। বেশ বোঝা গেল, সোনাটা ওই ভদ্রলোকের পকেট থেকেই পড়েছে। এই সময় অপর একজন পথচারী যুবক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ভিখারী গোছের লোক সোনার বাটটা কুড়িয়ে নিয়ে ওই যুবককে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ মশাই বলতে পারেন, এটা কি সোনা?' এই টপকা ঠগী দলের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আমি শুনেছিলাম, তাই কৌতুহলবশতঃ কাউকে কিছু না বলে ব্যাপারটা আমি পরিলক্ষ্য করতে থাকি। ইতিমধ্যে সোনাপট্টিগামী গেঁইয়া লোকটি সেখানে ফিরে এলেন। গেঁইয়া লোকটিকে ফিরে আসতে দেখে, সেই ভিখারী লোকটি বিনাবাক্য ব্যয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। গেঁইয়া ভদ্রলোকটি সেই পথচারী যুবককে শুনিয়ে শুনিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ মশাই,

আপনারা কি কেউ একটা সোনার বাট কুড়িয়ে পেয়েছেন। পাঁচ হাজার টাকা দাম মশাই। এইখানটায় বোধ হয় পড়েছে। হায় হায় হায়!' এর পর প্রায় পাগলের মত হয়ে ভদ্রলোকটি স্থান পরিত্যাগ করলেন। সেই ভিখারী লোকটি এইবার পুনরায় সেইখানে হাজির হয়ে সোনাটা পরীক্ষা করছিল, এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে আর একটা লোক বেরিয়ে এসে বলে উঠল, 'মাইরি মাইরি, এ তো সোনা—সোনা।' 'দেখি দেখি দেখি—' ইতিমধ্যে অপর আর একজন গুণ্ডাগোছের লোক এগিয়ে এসে বলে উঠল, 'এই খবরদার বলছি, ঐ ভদ্রলোকের পকেট থেকে পড়েছে। আমি নিজে দেখেছি। ডেকে আন্ লোকটাকে, না হয় থানায় জমা দে।' ঘাবড়ে গিয়ে তাদের সকলেই সোনাপড়িগামী ভদ্রলোকটিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু তাঁর কোনও সন্ধানই আর পাওয়া গেল না। এর পরে সকলেই প্রস্তাব করলে, সোনাটা থানায় জমা দেবার জন্যে। কিন্তু যে লোকটি সোনাটা পেয়েছে সে কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজী হয় না, বরং সে একটা উল্টো প্রস্তাব আনল। মাথা নেড়ে সে বলে উঠল, 'রেখে দেন মশাই, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। পুলিশের পেটে না দিয়ে আসুন এটা আমরা নিজেরাই ভাগ করে নিই। ক'টা টাকা পেলে যে আমরা এক্ষুণি মেট্রোয় যাব, চামলীবিবির বাড়ীতেও। কি মশায় রাজী আছেন তো?' অত দামী একটা সোনার বাট অত সস্তায় কিনতে কে না রাজী হয়, সকলেই ঝুঁকে প'ড়ে সোনাটা পরীক্ষা করতে সুরু করল। এদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'দেন মশায়, দেন, আমিই নেব। কিন্তু আমার কাছে আছে, মাইরী এই কুল্লে পঞ্চাশ টাকা।' কিন্তু সেই ভিখারী লোকটা কিছুতেই আশি টাকার কমে সেটি ছাড়তে রাজী হয় না। পথচারী সেই যুবকটি এতক্ষণ

অবাক হয়ে বিষয়টি পরিলক্ষ্য করছিল। এদের মধ্যে একজন এইবার সেই যুবকটির কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'ত্রিশটা টাকা ধার দিতে পারেন, আমার হাতের এই সোনার ঘড়িটা বন্ধক রেখে। কালই আমি টাকাটা আপনার ঠিকানায় দিয়ে আসব।' এই লোকটাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সামনের আর একজন লোক বললে, 'শুনবেন না মশাই, ওর কথা।' আমি দিচ্ছি পঞ্চাশ টাকা আর আপনি দিন পঞ্চাশ। আসুন আমরা দু'জনে মিলে সোনাটা কিনে নিই। সোনাটা অবশ্য আপনিই রেখে দিন। আমি বিক্রী করতে গেলেই তো পুলিশে আমায় পাকড়াও করে বলবে, 'শালা বিড়িওয়ালা তোর বাবা তোর জন্যে সোনা রেখে গেছে, না? আপনারা মশাই সে ভদ্দরলোক আছেন ঠিক বিক্রী করে নেবেন। নিন্ নিন্ মশাই সোনাটা কিনে নিন্।' পথচারী সেই যুবকটি এরপর আর লোভ সামলাতে পারল না। প্রায় একশত টাকা সঙ্গে নিয়ে সে'ও পোষ্ট আফিসে চলছিল, কাউকে মণিঅর্ডার করবার জন্যে। মনে মনে বোধ হয় সে ভেবেছিলো, সোনাটি এক্ষুণি সোনাপট্টিতে বিক্রয় করে হাজার দুই টাকা সে লাভ করতে পারবে এবং তারপর তা থেকে একশ' টাকা বার করে নিয়ে মণিঅর্ডারটা না হয় সে পরের দিনেই করে দেবে। ইতিমধ্যে রাস্তার ওপারের ফুটপাতের উপর জন দুই তিন হিন্দুস্থানী এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে তাদের ছোট খেঁটে লাঠি। সেই লোকগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে একজন বলে উঠল, 'এই গোয়েন্দা পুলিশ এসে গেছে।' নেবেন তো তাড়াতাড়ি নিয়ে নিন্।' লোভে পড়ে যুবকটি তাড়াতাড়ি একশত টাকা পকেট থেকে বার করে সোনাটা কিনে নিচ্ছিল আর কি, এমন সময় আমি এগিয়ে এসে ছোকরাটিকে নিরস্ত করে বললাম, 'কি করছ খোকা? ও

কখন সোনা নয়, ওটা একটা চক্‌চকে পেতল। এরা সব টপকা ঠগীর দল; এমনি করে লোক ঠকায়।' এরপর ঠগীগুলোকে আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'চালাকি পেয়েছ সব, না? আমার কথা শুনে যুবকটি ভড়কে গিয়ে সরে দাঁড়াবামাত্র অপর আর একজন ভদ্রবেশী পথচারী এগিয়ে এসে সোনাটা আশি টাকায় কিনে নিয়ে বলে উঠলেন, 'না, এ সোনাই। আমাদের দোকান ছিল যে।' এর কিছু পরেই ঠগীর দল সোনা বলে পিতলটি ভদ্রলোককে গছিয়ে দিয়ে একে একে সেখান থেকে সরে পড়ল। ঠগীর দল চলে যাবার পর ভদ্রলোকটি ফুটের সানের উপর সোনার বাটটি একটু ঘসে নিলেন। বেশ বোঝা গেল, বাটটা সোনার নয়, পিতলের। ভদ্রলোকটি অস্থির হয়ে কেঁদে ফেলে আমাকে বললেন, 'কেন আপনার কথা শুনলাম না, মশাই। আমাকে আপনি বাঁচান একটু। ঐ গলিটার মধ্যে ওরা ঢুকেছে। আসুন একটু খুঁজে দেখি।' ভদ্রলোকের এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তার উপর আমার দয়া এসেছিল। তার সেই কান্নাকাটি আমাকে অভিভূত করে দিল। দয়াপরবশ হয়ে ভদ্রলোকটিকে নিয়ে আমি কলাবাগান বস্তীর একটা নির্জ্জন গলির মধ্যে, দুর্ব্বৃত্তদের সন্ধানে ঢুকে পড়লাম। এই নির্জ্জন গলিটার ভিতর এসে ভদ্রলোকটির চেহারাটা হঠাৎ যেন বদলে গেল। পকেট থেকে চক্‌চকে ধারাল ছোরা বার ক'রে সেটা আমার মাথার উপর উঠিয়ে ভদ্রলোকটি হেঁকে উঠলেন, 'এবে শালা যান বাঁচাও, ভাগাও হামাদের শিকার!' দেখতে দেখতে সেখানে আরও সাত আটজন গুণ্ডা এসে হাজির হল। তাদের কারুর হাতে ছিল লোহার ডাণ্ডা, কারুর হাতে বা ছিল ছুরি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি একে একে আমার হাতের আংটি, মণি-ব্যাগ, সোনার ঘড়ি, ফাউণ্টেনপেন্‌, এমন কি পেনসিলটা পর্য্যন্ত

তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হই। এইরূপে তাদের ব্যবসা মাটি করে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে আমি অবসাদ ক্লান্ত দেহে থানায় এসে এজাহার দিই। মনে মনে আমার একটা দম্ভ ছিল, আমি চালাক, আমি বড় সাবধানী, কিন্তু সেই দম্ভ আজ আর আমার নেই। গুণ্ডার দল আমার সেই দম্ভ ভেঙে দিয়েছে।"

এই টপকা ঠগীরা অপরাপর ঠগীদের ন্যায় নিষ্ক্রিয় অযৌনজ সাম্পত্তিক অপরাধী হয়ে থাকে, পারতপক্ষে তারা বলপ্রকাশ করে না, নিষ্ক্রিয় প্রবঞ্চনার দ্বারাই এরা মানুষের অর্থ অপহরণ করে থাকে। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই দলের কাউকে কাউকে আমরা বল-প্রকাশ করতেও দেখলাম। এর কারণ স্বরূপ সহরে অপরাধী দলের মধ্যে দৃষ্ট মিশ্র দলের কথা বলা যেতে পারে। সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এই উভয়বিধ ব্যক্তিদেরই নিয়ে এই দল গঠিত হয়। তবে এইরূপ মিশ্র দল এখনও পর্য্যন্ত কদাচিৎ দেখা যায়; সাধারণতঃ এই টপকা ঠগীরা নিষ্ক্রিয় অপরাধীই হয়ে থাকে। এরা অপকর্ম্মের সময় কখনও কাউকে আঘাত হানে নি। সক্রিয় অপরাধীদের সহিত তাদের প্রায়ই কোনও রূপ সম্পর্ক থাকে না। এই মিশ্র দল সম্বন্ধে আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। বুঝবার সুবিধার জন্যে উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। • অপরাধ-বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড পৃঃ ১০১ দ্রষ্টব্য।

"সাধারণ ভাবে আমরা দেখে এসেছি, পকেটমার, ছিঁচকে চোর, ঠগী প্রভৃতি অপরাধীরা ধৃত হওয়ার কালীন কাহাকেও কখনও আঘাত হানে নি, কারণ উহারা নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধী, শোণিতপাতে স্বভাবতঃই তারা অনভ্যস্ত। কিন্তু অধুনাকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পকেটমারদের আত্মরক্ষার্থে ছুরিকাঘাতের কথা শুনা গিয়েছে। ইহার

কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে। আসলে এই সকল অপরাধী থাকে শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধী। জনবহুল সহরে সুবিধার জন্যে এরা পিক-পকেটদের কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ [illegible] কিন্তু অনভ্যাসের কারণে তারা ধরা পড়ে, এবং ধরা পড়ার সঙ্গে [illegible] এদের আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরা তখন আত্ম[illegible] করে। আসলে ইহারা পিক-পকেট করে না, ইহারা করে [illegible] রাহাজানি বা Robbery, এবং উহা তারা করে পকেটমারার অছিলায়। তাদের অপপদ্ধতির উহা পূর্ব্বাংশরূপে প্রকাশ পায় মাত্র।

আজকালকার পিক-পকেটরা সেফটি-রেজার ব্লেড্ ব্যবহার করে। ইহারা কখনও ছুরি ব্যবহার করে না, এমন কি ইহারা ছুরি সঙ্গেও রাখে না। ইহা ছাড়া বড় বড় সহরে চণ্ডুখানা, জুয়ার আড্ডা প্রভৃতি স্থান অপরাধীদের ক্লাব ঘর বা আড্ডাখানায় কাজ করে। এই সব আড্ডায় এবং বেশ্যাগৃহে নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের সহিত সক্রিয় অপরাধীদের মেলা-মেশার সুযোগ ঘটে। একটি বোমারু বা বোমাবর্ষী বিমানকে যেমন [illegible] পাহারাদার বা ফাইটার প্লেন ঘিরে নিয়ে চলে, তেমনি বন্ধুত্ব [illegible] একজন নিষ্ক্রিয় পিক্-পকেটকে তার দল হতে ভাঙিয়ে নিয়ে একজন সক্রিয় অপরাধীর অপকর্ম্মে বহির্গত হওয়াও অসম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কথিত সক্রিয় অপরাধীটি পাহারাদারের কাজ করে। এই স্থলে নিষ্ক্রিয় অপরাধীটি ধরা পড়লে, সক্রিয় অপরাধীটির পক্ষে বন্ধুর উদ্ধারের জন্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।”

টপকা ঠগী প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় প্রবঞ্চকদের পক্ষেও তাদের সক্রিয় অপরাধী বন্ধুদের নিয়ে ঘুরাফিরা করা অসম্ভব নয়। এই সব ঠগীরা প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্থ অপহরণে অসমর্থ হলে এদের এই সকল বন্ধুরা নির্ব্বাক

দর্শকের ন্যায় আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। এরা তখন ধৈর্য্যহারা হয়ে পথচারী ব্যক্তিটির উপর বল প্রকাশে উদ্যত হয়। এই কারণে কখনও কখনও সোনা ক্রয়ে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অর্থাদি এদের দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনীও শুনা গিয়েছে। আমার মতে সহরে অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট মিশ্র দলই অপরাধীদের এইরূপ ব্যবহারের একমাত্র কারণ।

নোট ডব্‌লিঙ

নোট ডব্‌লিঙকে কেহ কেহ দোনাখেল পদ্ধতিও বলে থাকে। অসাধারণ প্রবঞ্চনার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ঠগীরা সরল চিত্ত লোকদের বুঝায় যে তারা যে কোনও একটি কারেন্সি নোটের ন্যায় হুবহু অপর একটি অনুরূপ নোট রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে তৈরী করতে সক্ষম। সরল প্রকৃতির ব্যক্তিটি দুর্ব্বৃত্তদের এই মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাস ক'রে তার হাতে একখানি হাজার টাকার নোট তুলে দেয়, ঐরূপ দুইটি নোট্ ফেরত পাবার আশায়, কিন্তু একখানিও সে আর ফেরত পায় না। কতকগুলি ফটোগ্রাফিক কেমিক্যাল এবং সেন্‌সিটিভ পেপারের সাহায্যে দুর্ব্বৃত্তরা সরল প্রকৃতির মানুষদের বুঝায় যে সত্য সত্যই একটি নোটকে দুইখানি করা সম্ভব। কিরূপ পদ্ধতিতে তারা মানুষকে তার অর্থাদি দ্বিগুণ করে দেবার লোভ দেখিয়ে ঠকিয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"ঠগী লোকটির কথা প্রথমে আমি বিশ্বাস করি নি। আমি প্রথমে তার এইরূপ ক্ষমতা সম্বন্ধে তাকে পরখ করতে চাই। লোকটা তখন আমার কাছ থেকে একটা দশ টাকার নোট চেয়ে নিয়ে একটা

ফটোগ্রাফিক্ ফ্রেমে এঁটে দেয় এবং তার পর নোটের মাপ অনুযায়ী কাটা একটি সাদা কাগজ নোটখানার সামনে মেলে ধরে—এই কাগজটায় সে কি সব মাখিয়েও দিয়েছিল। এরপর সে উভয় কাগজটি আলোর দিকে সরিয়ে আনে। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর আমি নোটের অনুযায়ী একটা ছাপ সাদা কাগজটার উপর পড়তে দেখি। ঠগী লোকটি তখন আমায় বুঝায়, 'এই দেখুন ধীরে ধীরে আপনার এই নোটখানিই দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কি'না ঐরূপ আর একখানি দশ টাকার নোট তৈরী হচ্ছে। এর পর দুর্বৃত্তটি আমাকে বুঝায়, পুরাপুরি নোটখানি তৈরী হতে খরচ হবে একশোর উপর। এজন্যে এতে খরচেও পোষাবে না। দুর্বৃত্তটি এর পর আমাকে একটি হাজার টাকার নোট জোগাড় করতে বলে; তাহলে না'কি মাত্র একশো টাকা খরচে হাজার টাকা পাওয়া যাবে। আমি তার এই কথা বিশ্বাস করি। এইভাবে নোট ডবল করে গভর্ণমেণ্টকে ঠকান একটি বে-আইনি কার্য্য, এই কারণে বিষয়টি আমি তৃতীয় ব্যক্তিরও কানে তুলি না। এর পর আমি আমার স্ত্রীর গহনা বন্ধক রেখে এ[illegible] হাজার টাকার নোট সংগ্রহ করে আনি। দুর্বৃত্তটি তখন নোটের মাপে কাটা একটি সাদা পার্চ্চমেণ্ট কাগজ হাজার টাকার নোটের উপর নিক্ষেপ-করে। পূর্ব্বের মতই সাদা কাগজটার উপর হাজার টাকা নোটের একটা হুবহু ছাপ আমি পড়তে দেখি। এর পর দুর্বৃত্তটি দুইখানি নোটই (আসল নোট এবং ছাপপড়া কাগজ) একটা কাগজে বেঁধে দিয়ে আমাকে মোড়কটি দুই দিন পরে খুলবার পরামর্শ দিয়ে সেখান থেকে সে সরে পড়ে। এদিকে কখন যে হাত সাফাইএর সাহায্যে তিনি আসল নোটটি সরিয়ে ফেলেছেন তা আমি জানতেও পারি নি। দুই দিন দুই রাত্রি পরে মোড়কটি আমি খুলে দেখি আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আসল

বা নকল কোনও নোটই মোড়কটির মধ্যে নেই, সেখানে আছে শুধু নোটের সাইজে কাটা দুইখানি সাদা কাগজ। দুর্ব্বৃত্তটি আমাকে বুঝিয়েছিল, দুই দিন দুই রাত্রি পরে অপর কাগজটি হুবহু আসল নোট হবে, এর পূর্ব্বে আলোয় আনলে না'কি উহা আর তা হবে না। এই কারণেই তার উপদেশ মত আমি দুই দিন দুই রাত্রি অপেক্ষা করেছিলাম।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সেন্‌সিটাইজড্ পেপার হাত সাফাই-এর সাহায্যে সরিয়ে ফেলে দুর্ব্বৃত্তরা সেখানে একখানি সত্যকার নোট এনে সরল প্রকৃতির মানুষদের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে। ছাপ ধরা কাগজটি হঠাৎ সত্যকার নোট হয়ে উঠায় তখন আর তার কোনও সন্দেহ থাকে না। এর পর অনুরূপ ভাবে হাতের কায়দায় দুইখানি নোটই সরিয়ে ফেলে মোড়কের মধ্যে মাত্র দুইখানি সাদা কাগজ ঢুকিয়ে তার উপর প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে ঘণ্টা পাঁচেক ধরে এ্যাসিড ঢালবার উপদেশ দিয়ে দুর্ব্বৃত্তটি বামালসহ সরে পড়েছে নির্ব্বিবাদে এবং নির্ব্বিঘ্নে।

দোনা খেল—অন্যান্য

দোনাখেল অপরাধীরা নানারূপে শহর ও পল্লীর লোকদের ঠকিয়ে থাকে। কোনও কোনও সময় এরা প্রচার করে এদের কোনও এক ব্যক্তি দশখানা হাজার টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে, এবং যেহেতু হাজার টাকার নোট ভাঙ্গান তাদের মত গরীব লোকদের পক্ষে নিরাপদ নয়, সেই হেতু মাত্র একশো টাকার খুচরা নোটের বিনিময়ে হাজার টাকার নোটগুলি তারা বিক্রয় করতে প্রস্তুত। সরল প্রকৃতির লোভী মানুষরা তাদের এই কাহিনী বিশ্বাস করে নোটগুলি দেখতে

চায়। এই সকল দুর্বৃত্তদের নিকট প্রায়ই দুই তিন খানি হাজার বা একশো টাকার জাল নোট মজুত থাকে। নোটের মাপে কাটা খানকতক কাগজের উপরে ও নিচে জাল নোটগুলি রেখে দূরে থেকে সেগুলো প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের দেখিয়ে তারা তাদের বিশ্বাসও উৎপাদন করে। এর পর নির্দ্ধারিত দিনে রাত্রিকালে কোনও এক নির্জ্জন স্থানে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অর্থসহ উপস্থিত হয় এবং সেই শুভমুহূর্ত্তেই কতকগুলো গুণ্ডা লোক এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মার-ধর করে তাদের অর্থ কেড়ে নেয়, কিংবা সহসা জাল পুলিশ এসে উভয় পক্ষকে গ্রেপ্তার করে, পরে উৎকোচ স্বরূপ উভয়পক্ষেরই অর্থাদি হস্তগত করে তারা স্থান পরিত্যাগ করে। তবে সব সময়েই যে জাল পুলিশ বা জাল গুণ্ডার আবির্ভাব হয় তা নয়, অধিক ক্ষেত্রে এই সব ঠগীরা প্রথমে আসল বা জাল নোট দেখিয়ে, পরে কতকগুলো কাগজের একটা বাণ্ডিল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের (Victims) হাতে হাত সাফাইএর সাহায্যে গছিয়ে দেয়। এই সব ঠগীদের মধ্যে যারা রেলওয়ের কুলি সাজে তারা বলে নোটগুলি তারা ট্রেণের কামরায় কুড়িয়ে পেয়েছে, এবং যদি তারা রাজমিস্ত্রি সাজে তাহলে তারা বলে একটা ভাঙ্গা বাড়ী সারাতে গিয়ে সেগুলো তারা হস্তগত করেছে, কেউ কেউ মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্ত ধন পেয়েছে, এইরূপও ভাণ করে থাকে। কোনও একটা বড় ট্রেণ দুর্ঘটনা বা বড় একটা জাহাজ ডুবির খবর কাগজে বেরুলে এই সব ঠগীদের অত্যন্তরূপ সুবিধা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নোটের বদলে সোনার গহনা পেয়েছে—এইরূপও তারা বলে থাকে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা এই গহনা গোপনে কিনতে গিয়ে তারা সোনার গহনা না কিনে সহস্র সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে কিনে আনে কতকগুলো পিতলের বা গিল্টি করা গহনা।

পল্লী অঞ্চলে নিম্নবঙ্গীয় ব্যাধ নামধেয় ধোঁকাখেল অপরাধীরা এক

অদ্ভুত উপায়ে সরল প্রকৃতির গ্রামবাসীদের ঠকিয়ে থাকে। লোক ঠকানোর এই অভূতপূর্ব্ব পদ্ধতিকে বলা হয় "লক্ষ্মীর ভর" পদ্ধতি। এরা মানুষকে বুঝায় যে তাদের কাছে একটি অক্ষয় ঘট বা কলস আছে। মোহর ভরা এই কলস কখনও না'কি ফুরাবে না। আসলে কিন্তু কলসটি মাটি দিয়ে ভর্ত্তি করে উপরে কতকগুলো গিল্টি করা মুদ্রা বা চকচকে পয়সা রেখে তারা রাত্রিকালে গৃহস্থদের তা দেখিয়ে থাকে। লোভী গৃহস্থদের কেউ কেউ বহু অর্থের বিনিময়ে উপরি উল্লিখিত "লক্ষ্মীর ভর" কিনে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, এইরূপ বহু কাহিনী বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের গোচরে এসেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব ঠগীরা মোহর ভরা কলস মাটি খুঁড়ে পেয়েছে, এইরূপ কাহিনী গ্রামবাসীদের বলে তাদের কাছে অনুরূপ মাটি ভরা কলস বিক্রয় করতেও সমর্থ হয়েছে। এই সব ঠগীদের কাছে কয়েকটি সত্যকার আকবরি মোহর মজুত থাকায় এই সব অপকার্য্যে তাদের বিশেষ সুবিধা হয়। গ্রামবাসীরা এই সব মোহরগুলি স্যাকরা দ্বারা প্রথমে যাচাই করে নেয়। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও তাদের আমরা প্রবঞ্চিত হতেই দেখি—এর একমাত্র কারণ অতি লোভ। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" প্রবচনটি অতীব সত্য কথা। লোক ঠকানোর এই বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হয় "Tresure Trove Trick বা গুপ্তধন প্রাপ্তির পদ্ধতি।"

'অসাধারণ অপরাধে'র দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমি একজন প্রৌঢ় চিকিৎসা ব্যবসায়ী। এই দিন সকালে আমি আমার বহির্কক্ষে বসেছিলাম এমন সময় একজন সুবেশ যুবক ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকাবাবু ভাল আছেন?' এর পর সে আমার পদধূলি গ্রহণ করে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু

বহু চেষ্টা করেও এই যুবকটিকে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। বিব্রত হয়ে আমি উত্তর করলাম, 'কৈ বাবা, তোমাকে তো চিনতে পারছি না?' আদুরে আদুরে ভাব দেখিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতীব নম্রভাবে যুবকটি বললে, 'সে কি কাকাবাবু? চিনতে পারলেন না, খুবই ছোট দেখেছিলেন কি'না, তাই! আমি রায় বাহাদুর সুব্রতবাবুর ছোট ছেলে।' সুব্রতবাবু ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু, তবে বছর কুড়ি হল তিনি পাটনায় কর্ম্ম বাহাল ছিলেন, মাঝে মাঝে কোলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত। মাত্র বছর দুই পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করে তিনি বালিগঞ্জে বাড়ী করে বাস করছিলেন। আমি খুসী হয়ে বলে উঠলাম, 'আরে তাই না'কি, তুমি এত বড় হয়েছ। তা তোমার মেজদা কোথায়?' 'মেজদা, মেজদা, মেজদা কাকাবাবু?' আদুরে আদুরে ভাব দেখিয়ে ঠিক পূর্ব্বের মতই হাত কচলাতে কচলাতে যুবকটি উত্তর দিলে, 'মেজদা কাকাবাবু এখন মস্ত বড় অফিসার। ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্কে একটা ভাল কাজ পেয়ে গিয়েছেন।' 'এঁ্যা বল কি?' অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি বলছ তুমি? দেড় মাস হল তোমার বাবার সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবে দেখা হয়েছিল! তিনি বললেন, তোমার মেজদা বর্ম্মায় আটকা পড়ে গিয়েছে। সে তো অনেক দিন ধরে যুদ্ধের ব্যাপারে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তোমার বাবা খুবই চিন্তিত তার জন্যে দেখলাম।' কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে যুবকটি উত্তর করল, 'না কাকাবাবু, মাসখানেক হ'ল দাদা ফিরে এসেছেন। পায়ে স্প্লিণ্টার লেগে পা'টা একটু জখম হয়েছিল, সেই সুযোগে ডিসচার্য হতে পেরেছিলেন। ফিরে এসেই কাকাবাবু, মেজদা এই চাকুরীটা জোগাড় করে নিয়েছেন, সবই ভগবানের দয়া কাকাবাবু।' এর পর আমি যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা বেশ, তা এখন ব্যাপার কি বল।' হাত

কচলাতে কচলাতে যুবকটি বলল, 'কাকাবাবু! পরশু আমার ছোট বোনের বিয়ে, মা বিশেষ করে আপনাকে যেতে বললেন।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বোন? বোন তোমার ছিল না'কি?' হাত কচলাতে কচলাতে যুবকটি উত্তর করলে, 'হাঁ কাকাবাবু, আমার পরেই তো আমার বোন। আপনি সব ভুলে গিয়েছেন কাকাবাবু। আমাকেই আপনি খুব আদর করতেন ছোট বেলায়, তাই মনে আছে। বোনটা তখন মাত্র এক মাসের, আপনি তো বহুদিন আমাদের বাড়ী যান নি কি'না! তা কাকাবাবু উঠি এবার। প্রায় আটশো লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে; সব আমাকেই করতে হচ্ছে।' আটশো লোককে নিমন্ত্রণ করার কথায় আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি? এত রেশন যোগাড় করলে কি করে!' উত্তরে যুবকটি আমতা আমতা করে জানাল, 'সে কথা কেন জিজ্ঞেস করেন কাকাবাবু। চাল তো যোগাড় করেছিই, তা ছাড়া বিশ গাঁট কাপড়ও।' 'এঁ্যা!' বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিশ গাঁট কাপড়? অত কাপড় কি করবে? পেলেই বা এতো কি করে? আমরা ত কিছুই পাই না!' উত্তরে যুবকটা আমতা আমতা করে জানাল, 'আমি টাউন হলের এখন যে রেশন অফিসার। সিভিল সাপ্লাইতে আমি গোড়া থেকেই আছি।' এর পর আমিও আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা বাবাজীবন, আমাকে কয়েক জোড়া কাপড় যোগাড় করে দিতে পার?' আমাকে লজ্জিত করে তুলে যুবকটী উত্তর করলে, 'তা কি করে হয় কাকাবাবু! এ আপনি আমাকে বড় মুস্কিলে ফেললেন।' এর পর সে কিছুতেই রাজী হয় না, কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর যুবকটি যেন অনিচ্ছা সত্বে রাজী হয়ে বললে, 'তাহলে কাকাবাবু এক গাঁট কাপড়ের দাম ১০০৲ টাকা দিন। খুচরা কাপড় বার করা সম্ভব হবে

না। আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে না হয় ওগুলো বাঁটোয়ারা করে নেবেন। এই দুষ্প্রাপ্যের বাজারে আমি কৃতার্থ হয়ে ১০০৲ টাকার একটা নোট আমার ২০ বৎসর বয়স্ক পুত্র অজিতের হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, 'যা তো তোর এই দাদার সঙ্গে এই টাকা নিয়ে, একটা ট্যাক্সি করে কাপড়গুলো নিয়ে আসবি।' 'হাঁ হাঁ, করে উঠে যুবকটি বললে, 'সে কি কাকাবাবু, আপনি কি শেষে আমাকে বিপদে ফেলবেন না'কি। কাপড় যে কনট্রোলড। আমাদের লরী করে ওগুলো আমিই পৌছে দিয়ে যাব। অজিত টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে আজই চলুক, এক্ষুণিই জমা দিতে হবে।' অজিতকে কিন্তু আড়ালে ডেকে আমি বলে দিলাম, 'দেখ খোকা, কাপড় লরীতে না তুললে কিন্তু টাকা দিস্ নি।' এর পর যুবকটি আমার পদধূলি গ্রহণান্তে অজিতকে নিয়ে বার হয়ে গেল।

যুবকটি মাত্র আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল, এর মধ্যে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা আমার কল্পনারও বাইরে। এছাড়া টাকা কয়টা আমিই জোর করে তার হাতে তুলে দিয়েছি, বরং তাকে এই ব্যাপারে জোর করেই আমাকে সাহায্য করতে রাজী করিয়েছি। এর মধ্যে সন্দেহ করবার কিছুই ছিল না। কিন্তু ছয় সাত ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সত্বেও আমার পুত্র বাড়ী ফিরছিল না। পরিশেষে আমি থানায় গিয়ে বিষয়টি জানাতে বাধ্য হলাম। সকল কথা শুনে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমায় অভয় দিয়ে বললেন, 'চিন্তা করবেন না, ছেলে আপনার এক্ষুণি ফিরে আসবে।' প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'কিন্তু টাকা যে জিনিস না পেলে তাকে দিতে আমি বারণ করেছি। সে যদি অস্বীকৃত হয়, ফলে তারা যদি তাকে মারধর সুরু করে।' হেসে ফেলে ইনেস্‌পেক্‌টার ভদ্রলোক বললেন, 'কিছু ভাববেন না। বাপ যখন দিয়েছে ছেলেও দেবে। ছেলে আপনার ফিরে এল বলে।' ইনেস্‌পেক্‌টারবাবু

ঠিকই বলেছিলেন, তাঁর কথা শেষ হতে না হতে পুত্রও আমার থানায় এসে হাজির হ'ল। মুখটা কাঁচুমাচু করে পুত্র আমায় জানাল, তার কাছ হতে যুবকটি টাকা ক'টা ধাপ্পা দিয়ে চেয়ে নিয়ে, তাকে একটা আফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে 'এক্ষুণি আসছি বলে' চলে গিয়েছে, এবং পুত্র আমার তার জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃথাই অপেক্ষা করে এইমাত্র ফিরে এসেছেন। এর পর থানা হ'তে আমি রায় বাহাদুর সুব্রতবাবুর বাড়ীতে ফোন করে জানতে পারি যে তার কোনও কন্যা নেই, এবং বিবাহের নিমন্ত্রণের ব্যাপারটিও আগাগোড়া মিথ্যা। আমার ধারণা ছিল আমি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কিন্তু এই দিন আমি বুঝতে পারি যে আমার মধ্যে বুদ্ধির ন্যায় নির্ব্বুদ্ধিতাও আছে।

[উপরের কাহিনী হ'তে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এই সত্যটি হচ্ছে এই যে, স্বার্থ ও লোভ মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে তাকে বোকা করে তুলে এবং সেই সময়ে যে কোনও সাজেস্‌সন তার উপর কার্য্যকরী হয়। এইজন্য রায় বাহাদুরের কন্যা নেই জেনেও ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করানো গিয়েছিল যে তাঁর কন্যা আছে। এ'ছাড়া মানুষের মনে 'আছে বা নেই'—এই সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকে বা তাদের তা স্মরণ না, থাকে তথন বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্‌সেন দ্বারা তাদের সেই সম্বন্ধে 'হাঁ বা না' রূপে বিশ্বাস করানো সম্ভব।]

বোগাস্ ম্যারেজ ট্রিক্স্

অসাধারণ প্রবঞ্চনা অপরাধ অযৌনজ পদ্ধতির স্থায় যৌনজ পদ্ধতি দ্বারাও সমাধিত হয়। অর্থাৎ কি'না কেহ ভুলে টাকার লোভে, কেহ বা ভুলে স্ত্রীলোকে [illegible] গহে। কাহাকেও কাহাকেও আবার উভয় প্রকারেই ভুলান যায়। [illegible]র অন্তর্নিহিত যৌনজ বা অযৌনজ স্পৃহার পৃথক পৃথক বা একত্র অবস্থিতি ইহা প্রমাণিত করে। মানুষের এই উভয় প্রকার দুর্ব্বলতা সম্বন্ধেই দুর্ব্বৃত্তরা অবহিত আছে। অসাধারণ প্রবঞ্চনার অযৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এইবার ইহার যৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক, উদাহরণ স্বরূপ "অলীক উদ্বাহন" বা মিথ্যা বিবাহের কথা বলা যেতে পারে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে বোগ্যাস্ ম্যারেজ ট্রিক্স্ (Bogus marriage tricks)। এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা দুর্ব্বৃত্তরা বিবাহেচ্ছু লোভী যুবক বা তার অভিভাবককে বুঝায় যে তারা পাত্রপক্ষের জন্যে একজন ধনীলোকের একমাত্র কন্যাকে বধূরূপে এনে দিতে পারে। এ'জন্য তাকে যে বেশী কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে একথাও সে তাদের জানিয়ে রাখে। এই প্রস্তাবে রাজী হলে একদিনে রাজা এবং রাজ-কন্যা লাভ হবার সম্ভাবনা। এই কারণে দুর্ব্বৃত্তদের এই প্রস্তাবে পাত্র-পক্ষ খুসী হয়েই একশ' বা দুইশ' টাকা এদের অগ্রিম দিয়ে বসেন। এদিকে বরপক্ষের যাবতীয় দুর্ব্বলতা সাবধানে গোপন রাখা [illegible]; এই কারণে বিবাহের ব্যাপারে যা কিছু কথাবার্ত্তা তা দুর্ব্বৃত্তদের মারফৎই চলতে থাকে। আসলে কিন্তু দুর্ব্বৃত্তরা একটি বেশ্যাকন্যাকে জমিদার কন্যা সাজিয়ে পাত্র পক্ষকে বধূরূপে গছিয়ে দিয়ে থাকে। এজন্য ভদ্রপল্লীতে বড়

বাড়ী ভাড়া করে, উহা ভাড়া করে আনা দামী আসবাবপত্রে সাজিয়ে রাখাও হয়। এই সব বাড়ীতে দুর্বৃত্তরা কোনও এক বেশ্যাকে গৃহিণী সাজিয়ে এবং নিজেরা বাড়ীর কর্ত্তা প্রভৃতি সেজে দুই এক মাস সকন্যা বাসও করে থাকেন। এর পর দুই একদিনের মধ্যে আসল ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে পড়ে। বরপক্ষ তখন বধূ এবং দ্রব্যাদির উপর কোনও রূপ আর দাবী-দাওয়া না রেখে মানে মানে সরে পড়েন, কারুর কাছে কোনরূপ নালিশ না জানিয়েই।

অবশ্য সাধারণ প্রবঞ্চনার সাহায্যে সত্যকার ধনী ভদ্রকন্যাদেরও এরা যে সর্ব্বনাশ না করেছে তা'ও নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরাই বরপক্ষ সেজে উক্তরূপ অভিনয় দ্বারা একটির পর একটি সালঙ্কারা রূপবতী ধনী কন্যাদের বধূরূপে সংগ্রহ করেও নগদে ও অলঙ্কারে বহু সহস্র টাকা উপায় করেছে। বিবাহের কয়েকদিন পরেই এরা বধূটির অলঙ্কারগুলি এবং আসবাবপত্র সকল অপহরণ করে সদলে ভাড়া করা বাটীটি হঠাৎ পরিত্যাগ করে চলে যায়। এইরূপ দুই একজন বিবাহ-বিশারদ অপরাধীর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ভালরূপ তথ্য তল্লাস না করে বিবাহ দেওয়ার জন্যেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বরকে উপযুক্ত কনে এবং কনেকে উপযুক্ত বর জুটিয়ে দেবার অজুহাতে আজকালকার স্বাবলম্বী বর এবং স্বাবলম্বিনী কন্যাদের কাছ থেকে দুর্বৃত্তরা প্রতি বৎসর বহু অর্থ ঠকিয়ে নিয়ে থাকে।

এছাড়া এদেশে এমন অনেক ভদ্র সন্তান আছেন যাঁদের কি ...'কি প্রাইভেট্ গার্ল বা গৃহস্থ কন্যাদের উপর ঝোঁক দেখা যায়। শ... র পর এমন অনেক দালাল আছে যারা কি'না এঁদের উপভোগের জন্যে গোপ... রি। গৃহস্থ কন্যাদের সংগ্রহ করে আনেন। এই সব দালালেরা এঁদের বুঝ... মাকে কন্যারা পেটের দায়ে গোপনে ব্যবসা করছে মাত্র; কখনও ...

অলীক ধনীর * কন্যাদেরও এনে দেন, এই বলে যে তারা কেবলমাত্র আত্মচরিতার্থের কারণেই দেহ দিতে চায়, পয়সার জন্যে নয়। আসলে কিন্তু এই সব দালালেরা বা নারী কুটনীরা বেশ্যা-কন্যাগণকে ভদ্র-কন্যা সাজিয়ে তাদের কাছে এনে দেয়। অবশ্য শহরাঞ্চলে প্রাইভেট্ রূপ-জীবিনীর অস্তিত্ব যে নেই তাও নয়। এই সম্বন্ধে পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে আমরা আলোচনা করব। তবে এই সব হতভাগ্য ভদ্রসন্তানদের বুঝা উচিত যে, এইসব তথাকথিত প্রাইভেট গার্লস কেবলমাত্র তার একার জন্যেই সংগৃহীত হয় না। এক দিক থেকে এরা সাধারণ বেশ্যা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। সাধারণ বেশ্যাদের তাদের দয়িতাদের বেছে নেবার অধিকার আছে, এই সকল মেয়েরা কিন্তু এতটুকু স্বাধীনতাও পায় না। এবিষয়ে তাদের দালালদের উপরই নির্ভর করতে হয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে গৃহস্থ কন্যাগণও এইরূপ ভাবে ব্যবসা যে না চালায় তা নয়, কিন্তু তাদের সহিত সাধারণ বেশ্যাদের কি কোনও প্রভেদ আছে? এই ভাবে প্রতারিত হয়ে অর্থের বিনিময়ে এরা লাভ করে কুৎসিত ব্যাধি। পাঠকবর্গ হয় তো বলবেন, এতে তো উভয় পক্ষই দেখা যায় সমান অপরাধী; একে প্রতারণাই বা বলা হচ্ছে কেন? এর উত্তর ইতিপূর্ব্বে আমি বহুবার দিয়েছি। মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক যৌন-স্পৃহা জাগ্রত করে যারা মানুষ ঠকিয়ে থাকে তারাই আসল অপরাধী। এ ছাড়া দেশের আইনের উদ্দেশ্য সহানুভূতি বা সমাজ সংস্কার করা নয়, মানুষের প্রতি সুবিচার করা বা দুর্ব্বৃত্তদের হাত হতে রক্ষা করাই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সামাজিক ভাবে এই ভদ্রসন্তানদল নিন্দনীয় হ'লেও আইনের চক্ষে

আমার কথিত উক্তি

তারা এতদ্দ্বারা কোনও রূপ অপরাধ করেনি। অধিকন্তু তাঁদের এই ভাবে ঠকানোর জন্যে ঐ সব দালাল বা কুটনীরাই হয় আইনের চক্ষে একমাত্র অপরাধী। এইরূপে প্রবঞ্চিত হওয়ামাত্র ভদ্রসন্তানদের লজ্জিত না হয়ে থানায় এসে এজাহার দেওয়া উচিত। এই সব অপকর্ম্মের জন্যে দুর্ব্বৃত্তরা শহরে অনেক "এমটি হাউস" বা খালি বাড়ী ভাড়া করে থাকে। এই সকল বাটী দিবাভাগে খালি থাকলেও রাত্রে নরনারীর লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠে। শহরের কোনও কোনও "হোটেল কিপার"ও এই বিষয়ে দুই এক ঘণ্টার জন্যে এক একখানি কামরা দুর্ব্বৃত্তদের ভাড়া দিয়ে তাদের সাহায্য করে। এই সকল বাড়ীতে বা হোটেলে তথাকথিত গৃহস্থ কন্যাদের আনবার সময় দালাল বা কুটনীরা অত্যন্তরূপ সাবধানতার ভাণ করে থাকে, একরকম নিষ্প্রয়োজনেই।

এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা যাক। বিবৃতিটি হতে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"দালাল ভদ্রলোক আদালতের একজন মুহুরী। এই জন্যে আমি তাকে অবিশ্বাস করি নি। সে আমাকে জানায় যে তার সন্ধানে এমন অনেক গৃহস্থ-কন্যা আছে, যাদের কি'না সে তাদের অভিভাবকদের অজ্ঞাতে আমার ভোগের জন্যে এনে দিতে পারে। এই সকল মেয়েদের কেউ বা থাকে হোষ্টেলে কেউ বা থাকে স্বগৃহে। এই ভাবে সে আমাকে ভদ্রকন্যাদের প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলে। সে আরও বলে যে সে কোনও কন্যার ভাইয়ের, কোনও কন্যার বা পিতার বন্ধু, এই জন্য ... বাড়ীর লোকে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে মেয়েগুলিকে ছেড়ে দেয়। ... র পর আমি তার নির্দ্দেশমত চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা ... করি। "ঐ আসছে, এই এল বলে"—ইত্যাদি স্তোকবাক্য দিয়ে সে ... মাকে সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক অপেক্ষা করিয়ে রাখে। ... আমাকে

উত্তলা করে ভুলিয়ে রাখার এ যে একটা চালাকি মাত্র, তা আমি সেদিন বুঝি নি। ভদ্রঘরের কন্যাদের যে অত সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আনা যায় না, এইটেই এইরূপ বিলম্ব দ্বারা দালাল ভদ্রলোক যে আমাকে বুঝাতে চেয়েছিল তা আজ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পারছি। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে কন্যাটি রিক্সায় করে বাড়ীর ঝিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। মেয়েটিকে আমি গাড়ীতে তুলে হোটেলের নির্দ্ধারিত কামরায় এনে উপভোগ করি। কিন্তু বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে আমাকে তার নাম বা বাড়ীর ঠিকানা বলে নি। থেকে থেকে তাকে আমি লজ্জায় অধোবদন হতে দেখি, অপকর্ম্মটি যেন তার এই প্রথম, একবার সে কেঁদেও ফেললে। এ জন্যে যেন সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, এ কথাও সে আমাকে জানাতে ভুলল না। এইভাবে আরও দুই তিন বার তার সঙ্গে আমি সম্মিলিত হই। পরিশেষে আমাদেব আলাপ এত অধিক জমে উঠে যে কন্যাটি আমাকে গোপনে তার বাড়ীতেও নিয়ে যায়। একদিন গোপনে পিছনেব দরজা দিয়ে রাত্রিযোগে তার ঘরে এসে আমি অর্গল বন্ধ কবছি এমন সময় সেখানে তার বড় দাদা এসে হাজির, উকিলের পোষাক পরে। আমার ঘাড়টা চেপে ধরে তার উকিল ভাই হেঁকে উঠলেন, 'হারামজাদা, দাঁড়াও এইবার ঠিক করছি তোমায়।' এদিকে বড ভাইকে সেখানে দেখে প্রিয়তমা আমার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এর পর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই হাজার টাকা তার উকিল ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে আমি থানা পুলিশ বা মামলার দায় এড়াই, সেই সঙ্গে লজ্জারও। অতি কষ্টে আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা হয়। এর দুই মাস পরে আমি জানতে পারি কথিত কন্যাটি দুষ্ট পুরুষের বেশ্যামাত্র এবং তার উকিল ভাইটি আসলে উকিল বা ভাই নয়, সে একজন দালাল মাত্র, বর্ত্তমানে সে সেই

মেয়েটিরই উপপতি। এরা সকলে অভিনয় দ্বারা আমাকে প্রতারিত করেছে মাত্র।*

এই সকল বেশ্যা মেয়েরা আজকাল মাষ্টার রেখে কিছু কিছু পড়াশুনাও করে থাকে, তাদের ব্যবসার সুবিধার জন্যে। এ ছাড়া যে সকল নাবালিকাদের বেশ্যালয় হতে প্রতি বৎসর (নূতন আইনানুসারে) উদ্ধার করে পুলিশ হোমে বা স্কুলে পাঠায় তাদের বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ছাড়া পায়। হোমে বা স্কুলে থাকাকালীন তারা রীতিমত শিক্ষা পেয়ে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষাসহ, এদের কেউ কেউ তাদের পালিতা মাতার কাছেই ফিরে আসে। এই সব মেয়েদের কথাবার্ত্তা শুনলে তারা যে উচ্চ শিক্ষিতা এবং বড় ঘরের মেয়ে, এইরূপ ভুল করা কাহারও পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া ভদ্রসন্তানদের সহিত সংলাপের মধ্যে তারা যে দুই একটা ইংরাজী কথা বা বুকনী শিক্ষা করে তা'ও তাদের এইরূপ ব্যবসার অনেক সুবিধা করে দেয়। এই সকল সুবিধার সুযোগ এই সব মেয়েরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। এরা ভদ্রসন্তানদের জানায় যে তারা শহরের কোনও এক মহিলা কলেজের ছাত্রী, তাদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করলে, তারা যেন অমুক কলেজের গেটের কাছে চারটার সময় দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে মেয়েটি একগোছা কলেজের বই হাতে করে, বেলা তিনটা থেকে সেই কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে এমন ভাব দেখিয়ে যেন সে এইমাত্র গেটের ওপার থেকে বেরিয়ে এলো। এইরূপ অভিনয় দ্বারা এই সব মেয়েরা প্রায়ই ভদ্রসন্তানদের ঠকিয়ে থাকে।

---

* বিবৃতিটার কিয়দংশে Black Mailingএর সন্ধান পাই। মিশ্র দলই এর কারণ। দলের মেয়েটি নিষ্ক্রিয় অপরাধী হলেও তার ভাইটি ছিল সক্রিয় অপরাধী।

[হোম হতে ছাড়া পাবার নির্দ্ধারিত দিনে পালক বেশ্যা মাতারা ঘোড়গাড়ী করে হোমের গেটের সামনে অপেক্ষা করে এবং মাতারে তাকে গাড়ীতে তুলে তাদের পূর্ব্বগৃহে নিয়ে আসে। বহু বেশ্যামাতারা এজন্য নিজেরাই তাদের পালিত কন্যাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে হোমে পাঠিয়েছে। এতে পালন করার খবচাব দায় হ'তে তারা অব্যাহতি পায় এবং ঐ কন্যাদেব ব্যবসার সুবিধার্থে চৌকসও করে তুলা হয়। তবে তাদের মমতা বোধ জাগিয়ে রাখবার জন্য ঐ পালকমাতারা মধ্যে মধ্যে ভালমন্দ দ্রব্য নিয়ে কন্যাদেব সঙ্গে হোমে গিয়ে দেখা করে আসে। এদেব জন্য 'আফটার্ কেয়ার হোমের' ব্যবস্থা না থাকার জন্যই এইরূপ অঘটন ঘটে।]

এ ছাড়া এমন অনেক পেশাদার গৃহস্থ কন্যা (তথাকথিত) আছে, যারা কি'না ভদ্রসন্তানদের সহিত মিলিত হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমটায় এখানে ওখানে একটু বেড়িয়ে নিতে চায়। এরা ভদ্রসন্তানটির সহিত সিনেমা দেখে, হোটেলে সান্ধ্যভোজন সমাপন করে শেষ বরাবর একটা দোকানে ঢুকে অনেক দ্রব্যাদি কিনে নেয়—খরচখরচা যা কিছু তা অবশ্য ভদ্রসন্তানটিকেই বহন করতে হয়, একরকম বাধ্য হয়েই। এমনি ভাবে অনেকটা সময় অতিবাহিত হ'লে মেয়েটি বলে উঠে, "ওমা-আ। ন'টা বেজেছে ? দেখুন, বড্ড ভয় করছে আমার। এত দেরীতে বাড়ী ফিরলে মা আর বেরুতে দেবে না। লক্ষ্মীটি, আজ আপনি মাপ করুন। আজ আর আপনাব সঙ্গে (নিভৃত স্থানে) কোথাও যাবো না। কাল হেদোর মোড়ে এসে সাতটার সময় অপেক্ষা করবেন, আপনার সঙ্গে আজ থেকে রোজই ঐখানে আমি দেখা করব।" তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলে চট করে একটা রিক্সায় উঠে সেখান থেকে সে সরে পড়ে। [illegible] দিন ভদ্রসন্তানটি হেদোর মোড়ে সন্ধ্যা সাতটা হ'তে রাত্রি এগারোটা

পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও কারুর দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে আসে। এই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক এইখানেই শেষ হয়ে যায়। মেয়েটি এইবার অপর আর একটি ভদ্রসন্তানের সন্ধানে বাহির হয়। আমি এইরূপ তিনটি মেয়েব কথা শুনেছি, ভদ্রসন্তানরা এদের নাম দিয়েছেন মিস্ চিপ (cheap), মিস্ চিট (cheat) এবং:মিস্ ব্লাফ (Bluff)। আমি শুনেছি, এরা এই ভাবে না'কি বহু অর্থ উপায় করে থাকে।

এ ছাডা এমন অনেক দুর্ব্বৃত্ত আছে—যারা কিনা নিজেব বা কোনও বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রী বা ভগ্নীকে (তাদের অজ্ঞাতে) দূব থেকে ভদ্রসন্তানদের দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে, এই বলে যে সে শীঘ্রই ঐ সব মেয়েদের তাদেব কাছে এনে দেবে। সাধারণতঃ সিনেমা, থিয়েটার বা প্রদর্শনীতে এইরূপ দেখাশুনাব পর্য্যায় সমাপ্ত হয়। এই ভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা ভদ্রসন্তানদেব অর্থ অপহরণ করে ভদ্রঘরের দুর্ব্বৃত্তরা বেমালুম সরে পড়ে, এবং ভদ্রসন্তানগণ আব তাদেব কোনও খোঁজ খবরই পায় না।

এই ধরণের যৌনজ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্তস্বরূপ অপর আব একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করে আমি বর্ত্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করব। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি যে অফিসে কাজ করি, সেই অফিসে একটি শিক্ষিত সুন্দরী মেয়ে কাজ করতে আসে। জানি না, কেন, মেয়েটিকে আমার অত্যন্ত রূপ ভাল লেগেছিল, কিন্তু সাহস করে একদিনও আমি তার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারি নি। তবে প্রায়ই আমি তার যাতায়াতের পথে ওত পেতে অপেক্ষা করতাম। একদিন সে নিজে হ'তেই আমাকে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা, আপনি তো দেখি, রোজই আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন, কিন্তু আমাকে তো একদিনও ডাকেন না?'

হ্যাংলা ছেলের মত জিভ্‌ বাঘ্‌ করে আমতা আমতা করে আমি উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু ভয় করতো বলে কথা বলতে পারি নি।', এর পর যে এটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আজকে তো আপনি মাইনে পেয়েছেন! কত পেলেন?' উত্তরে আমি মেয়েটিকে জানালাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডিয়ারনেস্‌ এলাওয়েন্স নিয়ে এই মাত্র ৯৫৲ টাকা।' এইবাব মেয়েটি নিজেই আমাকে অনুরোধ করল, 'চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি, যাবেন?' আমি যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলাম, আমাব ভাগ্য যে এতদূর সুপ্রসন্ন হবে তা আমি কল্পনাই করি নি। কৃতার্থ হয়ে আমি উত্তর করলাম, 'যাবেন, নিশ্চয় যাবেন, কোথায় যাবেন?' আমাদের সম্মুখ দিয়ে একটি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছিল, মেয়েটী আমার মতামতের আর অপেক্ষা না করে ট্যাক্সিটাকে থামিয়ে আমাকে নিয়ে তাতে উঠে বসল। শ্রীমতী এইবার আমাকে নিয়ে এলেন একটা হোটেলে এবং সেখানে আমারই খরচায় প্রায় টাকা পনেরোর খাদ্যসামগ্রী খেলেন এবং কিনলেন। এর পর হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন একটা দোকানে। দোকান থেকে যে জিনিসটি তিনি কিনলেন তার বিল হ'ল ত্রিশ টাকার। লজ্জাব খাতিরে বিলটা আমিই চুকিয়ে দিই, কারণ দোকানদার বিলটা আমার দিকেই এগিয়ে দিল। এর পর আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে হুকুম করলেন, 'চলো আভি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, সিধা।' উদ্দাম গতিতে ট্যাক্সিখানি ছুটে চলল, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে। ট্যাক্সি যতই চলে ততই আমি তার মিটারের দিকে তাকাই। মিটারে ততক্ষণে বার টাকা উঠে গেছে, তেরর একটা অক্ষরও। আমার বুক দুর দুর করে উঠে, শ্রীমতীর দিকে আর তাকাতেও ইচ্ছে হয় না, তার সঙ্গে কথা কওয়া তো দূরের কথা। শ্রীমতী আমার কাঁধটা ধরে বার

দুই ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কথা কইছেন না যে, বাঃ! বেশ। আমিও তাহ'লে কথা বলব না। আমার সারা দেহ হতে ঘাম বেরিয়ে আসছিল। চোখ দিয়ে জলও, উত্তরে একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে আমি জানাই, 'না তা নয়, শরীরটা কি রকম ঝিম্ ঝিম্ করছে, কেন জানি না।' এর পর পলতার হোটেলে আর এক প্রস্থ চা পান করে আমি যখন শ্রীমতীকে তার বাড়ী পৌঁছে দিলাম ট্যাক্সির মিটারে তখন উঠেছে ত্রিশ টাকা। পরের দিন আফিসে এসে ভাবছি কার কাছে গোটা সত্তোর টাকা ধার করা যাবে কিনা, এ মাসের সংসার খরচের জন্যে, এমন সময় আফিসের একজন বেয়ারা এসে আমাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। চিরকুটটিতে শ্রীমতী লিখে পাঠিয়েছেন, 'আজ বিকালে বেড়াতে যাবেন তো? যাবেন কিন্তু—' চিরকুটটি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে টুকরাগুলো ওয়েষ্ট পেপার বক্সে ফেলে দিয়ে আমি বেযারাকে জানালাম, 'আচ্ছা, তুম্ যাও আভি।' মনে মনে বলে উঠলাম—বা-বাঃ, আবার, ছিঃ—।'

[অনেক সময় জনবহুল পথে ট্যাক্সি থামিয়ে এই সব মেয়েরা এমন হাতে হাত ধরে শিকারমন্ত যুবকদের উহাতে উঠার জন্য অনুরোধ করতে থাকে যে পরিচিত ব্যক্তিদের চোখ এড়ানোর জন্য ও সম্মান হানির আশঙ্কায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ সকল যুবকদের ট্যাক্সিতে উঠে জনবহুল স্থান ত্যাগ করে নিরালা স্থানে আসতে বাধ্য হতে হয়েছে।

এই সব মেয়েরা নানাস্থানে নানা অছিলায় যৌন লোভী যুবকদের সহিত আলাপ করে, কিন্তু নিজেদের প্রকৃত নাম ঠিকানা তারা তাদের জানায় না। প্রায়শঃক্ষেত্রে কোনও একটা গলির মুখে তারা ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছে এই বলে যে অমুক স্থানে অমুক দিন ঐ সময়ে সে তাদের সঙ্গে দেখা করবে।]

প্রবঞ্চনা—ধর্ম্মের পোষাকে

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের নামে এবং জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের অজুহাতে মানুষ মানুষের যত ক্ষতিসাধন করেছে; তত ক্ষতি অপরাধী নামধেয় কোনও ব্যক্তির দ্বারা কখনও সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে এদেশে ধর্ম্মের নামে সংঘটিত অপরাধসমূহ সম্বন্ধে বলা হবে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীদের ধর্ম্মের নামে দুর্ব্বৃত্তরা প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে; কিরূপ পদ্ধতিতে উহাদের দ্বারা ওই সব অপরাধ সংঘটিত হয়, সেই সম্বন্ধে এইবার কিছু বলা যাক। আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবরণটি হ'তে বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে। সাধারণতঃ সরল বিশ্বাসী এবং অজ্ঞ গ্রামবাসীদের এই পদ্ধতিতে দুর্ব্বৃত্তরা ঠকিয়ে থাকে। বিবরণটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমার তখন বয়স বাইশ কিংবা তেইশ হবে, গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করতাম। হঠাৎ একদিন দেখি দলে দলে লোক দীঘির পূব পাড়টার দিকে ছুটে চলেচে। শুনলাম প্রকাণ্ড এক সাধু কোথা থেকে এসে সেখানে উদয় হয়েছেন। এরই মধ্যে রটে গিয়েছে তিনি একজন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ, সম্প্রতি কাশী থেকে সেখানে এসেছেন। কাশীর বিশ্বনাথও না'কি শীঘ্রই সেখানে আসবেন। তিনি তাঁর অগ্রদূত মাত্র, ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন, তিনি শূন্য থেকে নেমে এসেছেন, কেউ কেউ আবার এমনও মনে করেন, তিনি না'কি মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠেছেন। এমনি বিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্য বহু কাহিনী লোকের মুখে মুখে ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছে। এর পর আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। কৌতূহলী হয়ে আমিও সাধু দর্শনের উদ্দেশ্যে বহির্গত হলাম। অকুস্থলে হাজির হয়ে দেখি,

সাধুবাবা ধ্যানে বসেছেন। সামনেই একটি নাতিউর্দ্ধ ভূখণ্ড। সাধুবাবার নির্দ্দেশমত শিষ্যের দল 'ব্যোম ব্যোম শব্দে গগন মুখরিত করে চিহ্নিত ভূখণ্ডটির উপর কলসের পর কলস জল ঢালছেন এবং সাধুবাবার শিষ্যদের সঙ্গে ভক্ত ও বিশ্বাসী গ্রামবাসীরাও যোগ দিয়েছে। বহু ব্যক্তিই সেখানে এসে জড় হয়েছেন। সকলের মুখেই সেই এক কথা, শিবঠাকুর নাকি পাতাল হতে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠবেন। দিনের পর দিন চলে যায়, জল ঢালারও কামাই নেই, আমরা হাসি, উপহাস করি, এবং প্রত্যহদিন একবার করে অকুস্থলে এসে বেড়িয়ে যাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমরা লক্ষ্য করি মাটিটা একটু চিড় খেয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করি ধরিত্রী দেবী আরও একটু ফাঁক হলেন। এর পর আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। ভক্তের দল কিন্তু অধিকতর উৎসাহে জল ঢালতে থাকে। আমরা সভয়ে লক্ষ্য করলাম, শিবঠাকুর ধীরে ধীরে মাথা তুলছেন। দেখতে দেখতে প্রায় দুই হাত উঁচু কুচকুচে কালো কষ্টি পাথরের একটি শিবলিঙ্গ ধীরে ধীরে মাথা তুলে মর্ত্ত্যে উঠলেন। চক্ষের সামনে শিবঠাকুরকে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠতে দেখে সকলে মোহিত হয়ে গেল, এমন কি নাস্তিক জমিদার হরকান্তবাবু পর্য্যন্ত। সাধুবাবার জন্যে জমিদার তৎক্ষণাৎ সেখানে একটা কুঠি বানিয়ে দিলেন, এর পর হতে দূর দূর গ্রাম হ'তে লোক এসে প্রণামি দিয়ে যায়, গ্রামের লোক তো দেয়ই। টাকাকড়ি সোনাদানায় সাধুর পকেট ভর্ত্তি হতে থাকে নির্ব্বিবাদে। মাঝে মাঝে সাধুবাবার উপর ভর হয়, তিনি তখন নানারূপ ভবিষ্যৎ বাণী করতে থাকেন, কতক মেলে কতক বা মলে না, কিন্তু তাহলে কি হয়, লোকে তাঁকে বিশ্বাসই করে যায়। কোনও কথা না মিললে লোকে বলে, তুই শুনতে ভুল করেছিস, উনি যা বলেছেন তার প্রকৃত অর্থ হবে এইরূপ, ইত্যাদি। সাধুবাবার দিনগুলো শ্রীশ্রীদেবাদিদেবের

কৃপায় ভালই চলছিল, কিন্তু বাদ সাধলেন শ্রীশ্রীমহাদেব নিজেই। হঠাৎ একদিন গ্রামে পুলিশের আবির্ভাব হ'ল। শুনা গেল, সাধুবাবা না'কি একজন ফেরার আসামী। দারোগার আদেশে সিপাইরা শিবঠাকুরকে উঠিয়ে ফেলে, মাটির নীচে অনেকখানি খুঁড়ে ফেলিল, মাটির তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল এক পিপে জলে ভিজে ফুলে উঠা ছোলা। এই ছোলার দানাগুলার উপরই শিবটা বসানো ছিল। আসলে ব্যাপারটি হয়েছিল এইরূপ। সশিষ্য সাধুবাবা রাত্রিযোগে শুখ্‌না ছোলা ভর্ত্তি একটা পিপে মাটির তলায় পুঁতে রেখে, তার ঠিক উপরেই শিবটা বসিয়ে রেখেছিলেন। শিবের মাথাটা শুখ্‌না মাটি ও ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিয়ে রাত্রিযোগে তাঁরা সরে পড়েন। ক্রমাগত জল ঢালার ফলে ফাঁপা মাটির মধ্য দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে নেমে, পিপের ভিতরকার শুখ্‌না ছোলাগুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে সেগুলাকে ফুলিয়ে দেয়, ফলে শিবঠাকুরও ধীরে ধীরে উপর দিকে ঠেলে উঠে ভূপৃষ্ঠে উদয় হন। মহাদেবের হঠাৎ আবির্ভাবের মূল কারণই ছিল এইরূপ। পুলিশ সাধু এবং তাঁর শিব, উভয়কে নিয়েই গ্রাম পরিত্যাগ করেন, অজ্ঞ গ্রামবাসীদের বিশ্বাস না ভাঙ্গিয়েই। তাই তারা এখনও বিশ্বাস করে মহাদেব ঠিকই এসেছিলেন, কিন্তু জমিদারের পাপে তিনি অন্তর্ধান হয়েছেন। যে দিনটিতে প্রথম শিবঠাকুর উঠেছিলেন, প্রতি বৎসর সেই দিনটায় ঐ স্থানে গাঁয়ের লোক জড় হয়ে আজও জল ঢালে। পরবর্ত্তীকালে সেইখানে সত্যকার একটি শিবও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

গ্রামবাসীদের এবংবিধ অন্ধ-বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে, ভণ্ড তপস্বীরা কিরূপ নৃসংশ ভাবে তাদের ঠকিয়ে থাকে তা শহরবাসীদের কল্পনারও বাইরে। এর কারণ, ধর্ম্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে অপহরণ করে সময় সময় তাকে অমানুষ করে তুলে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা অপহরণ, তার

ঐশ্বর্য্য অপহরণ অপেক্ষা যে অধিক ক্ষতিকর, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এ কথা স্বীকার করবেন। সাধারণতঃ দেখা গেছে, নাস্তিক ভাবাপন্ন বা কম ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই এই সকল কপট সাধুদের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন! এই কারণে আমি মনে করি যে, ধর্ম্মকে আজ বিজ্ঞান, যুক্তি এবং ন্যায়ের কাঠামোতে ফেলে তাকে নূতন করে রূপ দেবার প্রয়োজন হয়েছে, জাতির কল্যাণের জন্যে। পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে তাকালেই এই বিশেষ সত্যটি আমরা উপলব্ধি করতে পারব। মানবতার দিক হ'তে বিবেচনা করলে, দেশপ্রেম আদর্শের ক্ষেত্রে পুতুল পূজা মাত্র। অনুরূপ ভাবে জাতির অগ্রগতির পথে ধর্ম্ম মধ্য-যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার হলেও, আধুনিক যুগে উহা একেবারে অচল; এমন কি ক্ষতিকরও বটে। দেশপ্রেমের নামে ভণ্ড রাষ্ট্রনায়কেরা পৃথিবীর মানুষদের যেমন অমানুষিক ক্ষতি করে এসেছে, চুরি ডাকাতির দ্বারা তদনুরূপ ক্ষতি পৃথিবীর হয় নি। অন্ধ ও উৎকট ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কদের যেমন ছলের অভাব হয় না, স্বার্থান্ধ ধর্ম্মব্যবসায়ীদেরও তেমনি কখনও কৌশলের অভাব হয় না। সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন, এই উভয় স্তরেই আমরা ভণ্ড তপস্বীদের সন্ধান পেয়ে থাকি। এইসব ভণ্ড সাধুরা মুখে বিজ্ঞানের নিন্দা করলেও, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁরা বিজ্ঞানেরই সাহায্য নিয়ে থাকেন। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপ পদ্ধতিতে তাঁরা লোক ঠকিয়ে থাকেন, সেই সম্বন্ধে নিম্নে কোনও এক ভণ্ড তপস্বীর বিবৃতি তুলে দিলাম। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"সূর্য্যদেব যখন প্রচণ্ড প্রতাপে ঠিক মাথার উপর বিরাজ করছিলেন, ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তটিতে শিষ্যকে আমি দীক্ষা দিতে মনস্থ করলাম।

শিষ্যটিকে আমি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দিকে মুখ ক'রে করযোড়ে দাঁড়াতে বললাম এবং আমি দাঁড়ালাম সূর্য্যের দিকে পিছন ফিরে। এর পর আমি শিষ্যের হাতে ধান ও দূর্ব্বা দিয়ে সূর্য্যদেবের দিকে তীক্ষ্দৃষ্টিতে চেয়ে, তাকে সূর্য্যস্তব পাঠ করতে বললাম। জ্বলন্ত সূর্য্যদেবের দিকে তীক্ষ্দৃষ্টিতে চেয়ে শিষ্য স্তব পাঠ করতে লাগল, "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্," ইত্যাদি। এর কিছুক্ষণ পর শিষ্যকে আমি আমার দিকে তাকাতে বললাম, শিষ্য আমার কথা শুনতে পেল, কিন্তু আমাকে দেখতে পেল না। সে মনে করল আমি অন্তর্ধান হয়ে গেছি। কেঁদে উঠে শিষ্য জিজ্ঞেস করল, 'গুরুদেব, গুরুদেব, দেখা দাও। কোথা গেলে তুমি ?' উত্তরে আমি অভয় দিয়ে জানালাম, 'ভয় নেই বৎস! আমি এইখানেই আছি। শীঘ্রই আমাকে দেখতে পাবে তুমি।' কয়েক মিনিট পরেই শিষ্যের চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল এবং আমিও পুনরায় প্রকট হয়ে উঠলাম এবং এই সুযোগে আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, 'বৎস! তোমার প্রথম দীক্ষা শেষ হ'ল। এইবার তোমার দ্বিতীয় দীক্ষা সুরু হবে।' প্রথম দীক্ষার কথা বললাম, এইবার দ্বিতীয় দীক্ষার কথা বলি, শুনুন। দ্বিতীয় দীক্ষার সময় আমি সারা অঙ্গে সাদা বিভূতি * মেখে শিষ্যের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে রাখলাম একটি লাল রঙের কাঁচের পাত্রে লাল রঙ করা গঙ্গোদক (জল)। এর পর শিষ্যকে আমি আদেশ করলাম, 'বৎস, স্থির দৃষ্টিতে লাল পাত্রটির দিকে তাকিয়ে থাক।' শিষ্য আমার আদেশ প্রতিপালন করল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, আমি শিষ্যকে আমার মুখের দিকে তাকাতে বললাম। শিষ্য আমার

---

* উদ্দেশ্য দেহটি আমার শ্বেত বর্ণের করা।

মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি দেখছো, বৎস? আমার সারা অঙ্গে কি তুমি সবুজ আভা দেখতে পাও?' উত্তরে শিষ্য বলল, 'হাঁ, গুরুদেব, আপনি সবুজ হয়ে উঠেছেন।' উত্তরে আমি জানালাম, 'হাঁ বৎস, এইটেই পৃথিবীর আসল রূপ।' এর পর আমার সাকরেদরা এসে লাল পাত্রটি সরিয়ে নিয়ে, আমার নির্দ্দেশ মত, সেখানে একটা পীতোদক ভরা পীত বর্ণের কাঁচপাত্র রেখে যায়। আমি পূর্ব্বের ন্যায় শিষ্যকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পাত্রটির দিকে চেয়ে থাকতে বলি। এর পর আমার আদেশ মত চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে শিষ্য দেখতে পায় আমি নীল হয়ে গেছি। আমি তখন মহা আনন্দে শিষ্যকে জানাই, 'বৎস, এইটেই ঈশ্বরের আসল রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন এই নীল বর্ণের।' এই সব অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করে শিষ্য আমার অভিভূত হয়ে পড়ে এবং আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠে বলে, 'প্রভু! তোমার অসীম দয়া প্রভু, এই ভক্তের উপর। এই কি সেই বিশ্বরূপ, তুমি কি তা হলে।' এর পর আমি তাকে আমাকে তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে আদেশ দিই, অর্থাৎ কি'না গুরুর পাদপদ্মে, স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত এবং নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে তাকে আমি উপদেশ দিই। এইভাবে শিষ্যকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করে, তার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়ে, বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ মঠের নামে আত্মসাৎ করে আমি সরে পড়ি।"

এইবার এই বিশেষ পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করা যাক। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেরই জানা আছে; লাল রঙের উল্টা রঙ সবুজ এবং হরিদ্রা বা পীত রঙের উল্টা রঙ নীল, ইহাদের যথাক্রমে "রেড্ গ্রীণ প্রশেস্ এবং ইয়োলো ব্লু প্রশেস্ বলা হয়। "মস্তকের মধ্যকার ঘিলুর (মগজ) মধ্যে এইগুলি অবস্থান করে। দুই ইঞ্চি স্কোয়ার পরিমিত

একটি লাল চৌকা কাগজের প্রতি কেহ যদি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি রেখে, পরে হঠাৎ সাদা দেওয়ালের দিকে তাকায় তা হলে সে সবুজ রঙের অনুরূপ পরিমাপের ছাপ দেওয়ালের উপর দেখতে পাবে। কারণ লাল রঙের উল্টা রং সবুজ। এই একই কারণে পীত রঙের কোনও একটি বস্তুর দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেওয়ালের দিকে হঠাৎ তাকালে সেখানে দৃষ্ট হবে নীল রঙের ছাপ, কারণ পীতের উল্টা রঙ নীল। এইভাবে লালের দিকে তাকালে সবুজ, সবুজের দিকে তাকালে লাল, এবং হল্‌দের দিকে তাকালে নীল, নীলের দিকে তাকালে হল্‌দে রঙ মানুষ দেখে থাকে। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যকার রেড্ গ্রীণ্ প্রশেস্ (বা লাল সবুজ দণ্ড) এবং ইয়োলো ব্লু প্রশেস্ (বা পীত নীল দণ্ড) এইরূপ ব্যবস্থার জন্যে দায়ী। ইহা একটি নিছক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার মাত্র। এর মধ্যে বাহাদুরির বা কেরামতির কোনও কিছুই নেই। এই কারণেই সাধুবাবা একবার সবুজ এবং একবার নীলবর্ণের হ'তে পেরেছিলেন।

সূর্য্যের খররশ্মির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরালেই, মানুষ কিছুক্ষণের জন্য আঁধার দেখে। এই সময়ের মধ্যে সামনে কোনও মানুষ যদি দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে যদি নড়াচড়া না করে স্থিরভাবে থাকে, তা হলে তাকে (সেই ব্যক্তিকে) কিছুক্ষণের মত সে দেখতে পায় না। সূর্য্যের প্রখর রশ্মি চক্ষুমণিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় যে মানুষ তার চক্ষু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত সামনের কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে সে আর দেখে না। এই কারণেই সাধুবাবা কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্ধান হয়ে শিষ্যকে চমৎকৃত করতে পেরেছিলেন।

এই সকল বিজ্ঞ ভণ্ড সাধুরাই যে এইভাবে লোক ঠকিয়ে থাকে তা নয়, অজ্ঞ গ্রাম্য সাধুরাও লোক ঠকাবার জন্য এইরূপ ভেল্কিবাজীর সাহায্যে লন। নিম্ন বঙ্গের ব্যাধজাতি, পাটনার যতুয়া ব্রাহ্মণ, যোধপুর

এবং উদয়পুরের বৈদ মুসলমান নামধারী ভ্রাম্যমাণ স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতির ঠগীরা প্রায়ই এইভাবে 'গ্রাম্য লোকদের ঠকিয়ে থাকে। এই সকল দুর্ব্বৃত্তরা যোগী ও সাধুর বেশে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গমন করে শিষ্য সংগ্রহ করেন। এর পর তারা উপরি উক্ত উপায়ে নিজেদের অন্তর্ধান করে; কখনও বা শিষ্যদের রাত্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মা' লক্ষ্মী * দেখিয়ে, কখনও বা হাত সাফাইএর সাহায্যে পিতলকে সোনা বানিয়ে গ্রামবাসীদের মোহিত করে তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করেন এবং তারপর এঁরা লোকেদের জানান তাঁরা রূপা বা সোনাকে পূজার্চ্চনা ও প্রক্রিয়াদির দ্বারা দুগুণ ক'রে দিয়ে লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করতে সক্ষম। সংসারে সকলেই চালাক লোক নয়, বোকা লোকও থাকে। কয়েকজন বোকা গ্রামবাসী সাধুর কথা বিশ্বাস ক'রে এবং তাদের যাবতীয় সঞ্চিত সোনা রূপা সাধুবাবার কাছে গোপনে এনে দেয়। সাধুবাবা তখন এই রূপার ও সোনার অলঙ্কারাদি একটা মাটির তালের মধ্যে পুরে মৃত্তিকার তলায় প্রোথিত করেন এবং এর পর তাঁরা উপরকার সেই ভূমিখণ্ডের উপর পূজা হোম যাগ যজ্ঞের আয়োজন করেন। কয়েকদিন যাবৎ এই পূজা হোম যাগ যজ্ঞ চলতে থাকে, এদিকে সাধুবাবাও অলঙ্কার কয়টি গোপনে বার করে নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁরা চরণামৃতের নামে শিষ্যদের

---

* সাধুবাবারই এক সাকরেদ যে লক্ষ্মীমাতা সেজে জঙ্গলের মধ্যে আবির্ভূত হন একথা বলা বাহুল্য। সাধারণতঃ রাত্রিকালে এবং জঙ্গলের মধ্যে মাতৃ দর্শনের ব্যবস্থা হয়, ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়া সাধুবাবার সাকরেদদের পূর্ব্বগামী একটা দল, চাষী ও ব্যবসায়ীর বেশে গ্রামের মধ্যে ঘুরাফিরা করে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সাধুবাবাকে পূর্ব্ব হতেই তা জানিয়ে দেয়; এতে করে সাধুবাবার ভবিষ্যদ্বাণী করার ও হাত দেখার সুবিধে খুবই

সোমরস (সিদ্ধি, ভাঙ বা মদ) খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। একদিন সুযোগও মিলে যায়, সাধুবাবা তৎক্ষণাৎ অলঙ্কারগুলি মৃত্তিকার তলা হ'তে উঠিয়ে নিয়ে এক বিশ্বাসী চেলার মারফৎ সরিয়ে দেন। এদিকে যাগ যজ্ঞ কিন্তু সমানভাবেই চলতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে সাধুবাবার ষোড়শোপচারে পূজাও। এর দুই দিন পরে সাধুবাবা শিষ্যকে জানান, সোনা এবং রূপা প্রায়ই দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে, তবে এই দ্বিগুণ হওয়া অলঙ্কার বা সোনা সাত দিন পরে সে যেন উঠায়, তা না হ'লে সর্ব্বনাশ হ'তে পারে। এর পর শিষ্যকে আরও সাত দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়ে সাধুবাবা দেবীর প্রত্যাদেশে সদলে দেশ ত্যাগ করেন। এই নয় দিনের মধ্যে সাধুবাবা কোনও এক দূর দেশে সরে এসে একান্তভাবে নিরাপদ হ'তে সক্ষম হন। এই নয় দিন পর শিষ্যরা সাধুবাবার উপদেশ মত মাটি খুঁড়ে দেখে, তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাবতীয় অর্থাদি অপহৃত হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে এইসব সাধুবাবারা হাত সাফাই-এর (Sleight of hands) সাহায্যে প্রথম চোটেই মূল্যবান অলঙ্কারাদি সরিয়ে ফেলে তৎপরিবর্ত্তে পিতলের অনুরূপ অলঙ্কারাদি শিষ্যদের চোখের সামনেই মৃত্তিকা তলে প্রোথিত করে দেন। লোক ঠকানোর এই বিশেষ পদ্ধতির দুর্ব্বৃত্তেরা নাম দিয়েছে, "দোনাখেল"। এই সব ঠগীদেরও বলা হয় দোনাখেল-ঠগী।

অযৌনজ অপরাধ সকলের ন্যায় যৌনজ অপরাধ সকলও অনেক সময় ধর্ম্মের পোষাকে সংঘটিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গুরু নামধেয় দুর্ব্বৃত্তরাই এই সকল অপকর্ম্মের হোতা হয়ে থাকেন। ভাড়াটে গুণ্ডা বা ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগের পদ্ধতি পৃথিবীতে আবহমানকাল হ'তে প্রচলিত আছে। অনুরূপ ভাবে অর্থ দিয়ে পুরোহিত নিযুক্ত ক'রে ঈশ্বরের কাছে আবেদন নিবেদন পৌছানোর পদ্ধতিও এ পৃথিবীতে দেখা

যায়। এ দেশের অনেকেরই ধারণা পুরোহিত এবং গুরুরা উকিলের ন্যায় ভক্তদের হয়ে ঈশ্বরের দরবারে ওকালতি না করলে, ভক্তদের সকল আবেদন ঈশ্বরের দরবারে হয়তো সঠিক ভাবে পৌঁছাবে না। পুরোহিতগণ অনেকটা উকিল বা পেশকারের পর্য্যায়ে পড়েন। গুরুরা কিন্তু আরও উর্দ্ধে স্থান পান। শেষ বরাবর তাঁরা ঈশ্বরের একজন সোল এজেণ্ট হয়ে দাঁড়ান. তাঁদের সুপারিশ এবং সাহায্য ব্যতিরেকে যেন ভগবানের ত্রিসীমানায় পৌছানও অসম্ভব। এই সম্বন্ধে আমি এক গুরু নামধেয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের তো সম্পর্ক পিতাপুত্রের। আমরা নিজেরাই তো সরল ভাষায় তাঁকে আমাদের নিবেদন জানাতে পারি, এর মধ্যে আপনাদের কোনও সাহায্যের কি কোনও প্রয়োজন আছে?' গুরু নামধেয় ভদ্রলোকটি নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর দেন, 'দেখ, গুরু হচ্ছে একটা দর্পণ বা আরসী। গুরু রূপ দর্পণের সাহায্য ব্যতিরেকে ঈশ্বর সন্দর্শন হয় না।' এর পর গুরুঠাকুর আমাকে আরও বোঝান যে গুরু হওয়া নাকি এক জন্মের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না। এর জন্যে নাকি জন্মজন্মান্তরের সাধনার প্রয়োজন। গুরুদেব পৃথিবীতে এসেছেন, কেবল মাত্র উপযুক্ত ভক্তদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করবার জন্যে। পৃথিবীটা না'কি সবই মায়া, এবং এই মায়াজাল ছিন্ন করে, একমাত্র তিনিই ভক্তদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করতে সক্ষম। গুরুঠাকুর, অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ এমনি সব বাক্যজাল সৃষ্টি করতে সুরু করলেন, যাতে ক'রে কি'না আমার মত লোকও কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে উঠে। সত্য কথা বলতে গেলে, গুরুদেবের মুখনিঃসৃত 'বিরাট ব্যোম' রূপ অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থটি আজও পর্য্যন্ত আমার বোধগম্য হয় নি।

চিত্ত প্রস্তুতি বা Predispositonএর কারণেই এইরূপ সম্ভব হয়।

এই চিত্ত প্রকৃতির কারণে ধর্ম্মের নামে সহজেই আমরা উতলা হ'য়ে উঠে আমাদের বিবেচনা শক্তি হারিয়ে ফেলি। অবাল্য বাক্-প্রয়োগ (suggestion) এবং ধর্ম্ম ও সংস্কার, কতকটা জাতীয় অভ্যাসও, এই জন্যে দায়ী।

এদেশের লোকদের, বিশেষ ক'রে এদেশের মেয়েদের সব চেয়ে বড় শত্রু ছোকরা গুরু। গুরু অনেক প্রকারের হয়, যথা—উদাসী, বিদেশী, গৃহী, সস্ত্রীক গুরু, ছোকরা গুরু ইত্যাদি। এমন অনেক গুরু আছেন, যাঁরা সস্ত্রীক গুরুগিরি করেন। অর্থাৎ কি'না খোকা মহারাজ (গুরুপুত্র) বিলাত যাবেন, টাকা যোগাবেন শিষ্যরা। খুকী মাতার (গুরুকন্যা) বিবাহ হবে, কিন্তু তার ব্যয়ভার বহন করবেন শিষ্যেরা, কোনও এক সস্ত্রীক গুরু প্রতি বৎসরই সপরিবারে প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করে মধুপুরে যেতেন, শিষ্যদের অর্থে। এই সম্বন্ধে আমি তাঁর কোনও এক অন্ধ-ভক্তকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, উনি সাধু হবেন তো অরণ্যে না গিয়ে প্রতি বৎসর উনি মধুপুরে যান কেন? কামিনী কাঞ্চনই বা উনি ত্যাগ করেন না কেন? প্রতি বৎসরই শহরে ওঁর একটা ক'রে বাড়ী উঠছে, এতই বা ওঁর প্রয়োজন কি? এর কি কোনও সদুত্তর আপনারা দিতে পারেন?' এই সব প্রশ্নে ভক্ত শিষ্যটি কিছুমাত্র বিব্রত বোধ না করে এইরূপ উত্তর দেন, 'ওঃ, এই কথা। গুরুদেবকে আমরা এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিনি? জিজ্ঞাসা করেছি বই কি? গুরুদেব কি বলেন জানেন? গুরুদেব বলেন, 'ভোগের মধ্যেই ত্যাগ,' 'সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা নিজে ভোগ করে তিনি ভক্তদের তা থেকে মুক্ত করতে চান।' অপর আর এক ভক্ত শিষ্যকে আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, গুরুঠাকুর শুনেছি মানুষের ব্যাধি নিরাময় করতে সক্ষম। তাই যদি হয়, তাহলে ওঁর নিজের নিউমোনিয়া হ'ল কেন?

ওঁর জন্যে বড় বড় ডাক্তার বৈদ্যই বা ডাকা হচ্ছে কেন?' উত্তরে শিষ্য মশাই বলেন, 'রোগটা আসলে না'কি হবার কথা ছিল গুরুঠাকুরের কোনও এক শিষ্যের। ভক্ত শিষ্যের সেই কাল-ব্যাধি গুরুঠাকুর তাঁর নিজ দেহে তুলে নিয়ে তার সেই ভক্ত শিষ্যকে তিনি এ যাত্রা রক্ষা করলেন মাত্র।'

পুনঃ পুনঃ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা মানুষকে কতদূর নির্ব্বোধ এবং নির্ব্বাক করে তুলতে তাঁরা সক্ষম তা উপরি উক্ত উক্তিগুলি অনুধাবন করলে সহজেই বুঝা যায়। অন্ধ-ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকেদের এই সকল দুর্ব্বলতার সুযোগ বিজ্ঞ দুর্ব্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকেন। এই সম্বন্ধে জনৈক ছোকরা গুরুর একটি চমকপ্রদ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি পাঠ করলে আলোচ্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"গুরুগিরি করতে হ'লে দুইটি জিনিস জানা দরকার, মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি, আর কিছুটা ম্যাজিক। এই দুইটি জিনিসের মার-প্যাঁচে, আমি একটি সদ্য বিবাহিত তরুণ শিষ্যকে আয়ত্তে আনি। আমার উপদেশে (আদেশে) সে অচিরে তার পিতামাতা, ভাই-বোন প্রভৃতি আত্মীয়দের বিদেয় দেয়। তার স্ত্রীটি ছিল অপূর্ব্ব সুন্দরী। প্রথমে সে কিছুতেই আমার ভক্ত হ'তে চায় নি। বিরক্ত হয়ে আমি শিষ্যটিকে ব্রহ্মচর্য্য পালনে আদেশ দিলাম। এমন কি বাক্-প্রয়োগ দ্বারা আমি তাকে তার স্ত্রীর উপর নানারূপ অত্যাচার করতেও প্ররোচিত করি। এইরূপ কার্য্যের মধ্যে আমার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য, স্বামীর উপর তার বিরক্তি আনা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, স্বামী-সাহচর্য্য হ'তে তাকে বঞ্চিত করে তার যৌনবোধকে তীক্ষ্ণ করা। গোপনে আমি আমার শিষ্যকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেও, প্রকাশ্যে কিন্তু আমি তাকে তার স্বামীর অত্যাচার হ'তে ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করতাম।

উদ্দেশ্য, তার মনটাকে স্বামীর বিরুদ্ধে বিরূপ করে আমার দিকে টেনে আনা। এর পর সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। শিষ্যকে আমি সারা রাত জাগিয়ে রেখে ধর্ম্মকথা শুনাতাম। সারা রাত জাগিয়ে রেখে তাকে দিনের বেলায় আমি অফিসে পাঠাতাম। সারাদিন আমি ঘুমাতাম, শিষ্যকে কিন্তু ছুটীর দিনেও আমি ঘুমাতে দিই নি। ঘুমাবার সে কোনও সুযোগই পেত না। রাত্রে চরণামৃতের নামে তাকে আমি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়েছি, এ ছাড়া তাকে কখনও পরলোকের ভয় দেখিয়ে, কখনও বা তাকে নানারূপ অশুভ দুর্ঘটনার সম্ভাবনার কথা শুনিয়ে, সর্ব্ব সময়ই আমি তার মনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতাম। ঘুমের অভাবে তার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়ে আসত। তার উপর আরক পান আছে। এইরূপ ভাবে অচিরেই তাকে আমি পাগল বিশেষে পরিণত করি। অর্থাৎ কি'না, দেখেও সে দেখে না, বুঝেও সে বুঝতে পারে না। এদিকে বাড়ীতে তখন আমি একমাত্র পুরুষ। স্ত্রীর মন স্বামীর প্রতি একেবারে বিষিয়ে উঠেছে। তার উপর তার আর কোনও সহচর বা সম্বলই নেই। একটি পয়সার দরকার হলে তাকে তা আমার কাছেই চাইতে হয়। ওদিকে স্বামীর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য। স্বামীর এইরূপ ব্যবহারের জন্যে তার মন প্রতিশোধ নিতে চাইছে। ঠিক এই সময় আমি তার মুখে সুধার পাত্র তুলে ধরলাম। হতভাগা শিষ্য বুঝেও বুঝল না, চোখে দেখেও সে তা দেখল না। বরং অপকার্য্যে প্রকারান্তরে সে আমার সহায়তাই করল। কারণ তখনও পর্য্যন্ত সে আমাকে ঈশ্বরের অবতার রূপেই জ্ঞান করছে। পরিশেষে কিন্তু শিষ্যর চেয়ে শিষ্যাই আমার বেশী ভক্ত হয়ে উঠে।"

এইরূপ গুরুগিরি অবশ্য বেশী দিন চলে নি। মেয়েটির বাপ এবং ভাই খবর পেয়ে মেয়েটিকে জোর করে নিয়ে যায়, পাড়ার লোকেরা বাড়ী

ঢুকে গুরুকে মারধর ক'রে বার করে দেয়। শিষ্যমশাই দোতলা থেকে আস্ফালন করেন, কিন্তু গুরুরক্ষায় তিনি অপারক হন। এর পর শিষ্যমশাই ধীরে ধীরে সেরে উঠেন, পূর্ব্বের কথা স্মরণ করে তিনি এখন বিশেষ লজ্জিত। হঠাৎ সেরে উঠার কারণ সম্বন্ধে তিনি আমার নিকট নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"চোখের সামনে দেখতে পেলাম, শ্রীশ্রীভগবান নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারলেন না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এত সত্ত্বেও আমি যীশুর কাহিনী স্মরণ করে মনকে সুস্থির করি। দুই দিন, দুই রাত্রি আমি ঘুমালাম, কাঁদলামও। ঘুম ভাঙার পর বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছি মাত্র, হঠাৎ শুনতে পেলাম, নীচের ভাড়াটিয়াটা অকথ্য ভাষায় আমায় গাল দিচ্ছে, 'হারামজাদা, নেমে আয়, আয় দেখি। তোর জন্তেই তো আমার এই সর্ব্বনাশ হ'ল। তুই-ই তো জোচ্চরটাকে সাধু বলে আমায় তার শিষ্য করিয়েছিলি।' ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মাসখানেক আগে সে গুরুদেবের কাছে এসে স্বেচ্ছায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সে আমার চেয়েও তাঁর বেশী ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ভক্তি দেখে, আমার হিংসা হ'ত, কিন্তু এ কি পরিবর্ত্তন ; তবে কি— আমার মনে সন্দেহ জাগে, আমি তাঁকে বলি, 'ওপরে আসুন না মশাই, যা বলবার আছে, ওপরে এসে বলুন। খামকা গাল পাড়েন কেন?' আমার অনুরোধে লোকটি ওপরে উঠে এসে বললে, 'শুনুন তবে বলি সব কথা। গুরুর নির্দ্দেশ মত, দরজা বন্ধ করে আমি পূজা করছিলাম। হঠাৎ কোনও এক ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায়, গুরুদেবের বাক্সটা খুলে ফেলি। বাক্সের ভিতরের কাগজপত্র থেকে আমি বুঝতে পারি, তিনি একজন ঠগ্। আমাকে, আপনাকে এবং আরও অনেককে তিনি ঠকিয়েছেন।' আমি সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠার পর ভদ্রলোক আমাকে

জানান, জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে আমাকে রক্ষা করার জন্যেই তিনি না'কি গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আমাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে সেদিন তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে এবং আমার গুরুদেবকে গাল দিচ্ছিলেন। আমারই মত একজন গুরুভক্তকে গুরুনিন্দা করতে শুনেই না'কি আমি সত্বর নিরাময় হই।"

এই গুরুটি আরও অনেক শিষ্য-পত্নীর অনুরূপ ভাবে সর্ব্বনাশ করেছেন। এইরূপ এক শিষ্য-পত্নীকে আমি জানতাম, তিনি আমাকে জানান, 'দেখুন, স্বামীর মূর্খতা ও অত্যাচারের জন্যে তাঁর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই আমি গুরুদেবকে দেহ দান করি।' উত্তরে আমি তাঁকে এইরূপ উপদেশ দিই, 'তা বোন্, বেশ করেছ, লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু যা করেছ, তা করেছ, আর করো না। আর যা বলেছ, আমাকে বলেছ, আর কাউকে বল না, কার কাছে এ কথা স্বীকার করতে নেই। জানতে পারলেই দোষ, না জানতে পারলে দোষ নেই। মানুষ মাত্রেরই ভুল-চুক হয়ে থাকে। তোমার স্বামী ছিলেন তখন একজন রোগী। রোগীর উপর রাগতে নেই। এখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। এইবার একনিষ্ঠ হয়ে ঘরকন্না কর। পূর্ব্বের ঘটনাগুলিকে দুঃস্বপ্নের মত উপেক্ষা করে সুখী হও। এই আমার আশীর্ব্বাদ।'

এই সকল ছোকরা গুরু হ'তে পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হওয়া ভাল। এমন অনেক গুরু আছেন, যাঁরা শিষ্যদের বিশ্বাস করান, তিনি ভগবান এবং শিষ্যা ও শিষ্য, উভয়েরই দেহ ও মনের অধিকারী। শিষ্যার সংযম পরীক্ষার ভাণ করেও তাঁরা অগ্রসর হন। এইরূপ এক ছোকরা গুরু কোনও এক মহিলাকে বুঝান, যে তিনি (গুরু) সাক্ষাৎ নারায়ণ, এবং তাঁর (শিষ্যার) দুই (বয়স্থা) কন্যা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর অংশ মাত্র। প্রতি দিন গভীর রাত্রে তিনি রূপার বাঁশী নিয়ে কন্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে নৃত্য করতেন

এইরূপ অবস্থায় গুরুসেবার দ্বারা কন্যা বিশেষের সন্তান সম্ভাবনা হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই রোগীর আত্মীয়দেব এবং পড়শীদের এই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া মাত্র আইনানুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

উপরি উল্লিখিত ছোকরা গুরু ছাড়া আর একপ্রকার ছোকরা গুরু দেখা যায়। এঁরা ভাণ করেন, কোনও এক দেবতা তাঁর উপর ভর করে-ছেন; এবং এই ভাবে তারা লোকচক্ষে হঠাৎ একদিন দেবতা হয়ে উঠেন, এইরূপ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নয। এদেশের অধিকাংশ লোকই জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একেশ্বরবাদি হলেও বহু-দেবদেবীতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরও এদেশে অভাব নেই। অনেকে আবাব এই সকল দেব বা দেবীকে একই ঈশ্বরের এক একটি রূপ বা অংশ রূপে কল্পনা ক'রে থাকেন। এই সকল দেব বা দেবীর (কিংবা খোদ ঈশ্বরের) নামে দুর্ব্বৃত্তরা কিরূপ প্রণালীতে ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের ঠকিযে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পাঠ করলে বুঝা যাবে।

'সাধারণতঃ ছেলে ছোকরারা হঠাৎ গুরু বা সাধু হ'য়ে উঠলে, প্রাচীন লোকেরা তাদের আদপেই আমল দেন না। অথচ এই সম্বন্ধে প্রবীণবাই একমাত্র সমঝদার। এদেব মস্তিষ্ক এই সময়ে একটি পাকা রিসিভারের মত হয়ে উঠে। এই কারণে এদের যা তা বিশ্বাস করানও সহজ হয়, বিশেষ ক'রে বৃদ্ধাদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। পরলোকের পথে এগিয়ে এসে মৃত্যুবিশ্বাসী বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মৃত্যুভয অতিষ্ঠ ক'রে তুলে। পিছনেব জীবন-ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে এঁরা কোনও রূপ পাথেয়র সন্ধান পান না। এর ফলে হঠাৎ এঁরা পরলোকে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। জীবনব্যাপী অতৃপ্ত বাসনার কারণে এবং আত্মপ্রবঞ্চনার ফলে, তাঁরা প্রায়ই স্নায়বিক রোগে ভুগে থাকেন। এইরূপ স্নায়বিক রোগের সহিত সন্নিবেশিত থাকে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা। পরলোকের

চিন্তা তাদের এই সময় অত্যন্তরূপ উদ্বিগ্ন করে তুলে। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের এই দুর্ব্বলতা আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করি এবং তাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে আমি মনস্থ করি।

—কিন্তু আমি একজন যুবক মাত্র, আমার অমৃতবাণী কে বিশ্বাস করবে? অনেক ভেবে-চিন্তে আমি একটা মতলব ঠিক করে ফেলি। একদিন ঠাকুর ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি বিভোর হয়ে কেঁদে উঠি এবং তার অব্যবহিত পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে ভূমিব উপর লুটিয়ে পড়ি। মা, পিসিমা ও ঠাকুমা নিকটেই ছিলেন। 'আমাকে এই ভাবে পড়ে যেতে দেখে, তেনারা তো ছুটে এলেনই, তা ছাড়া পাড়াপড়শীদেরও অনেকের সেখানে আগমন হ'ল। কিছুক্ষণ পরে আমি উঠে ব'সে চোখ পাকিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা, মা, জানো? জানো, আমি কে?' ইতিমধ্যে পাশের বাড়ী থেকে কাকা কাকিমাও সেখানে এসে গেছেন। নানা লোকে আমাকে প্রশ্ন করে, কিন্তু আমি কারো কোনও প্রশ্নের উত্তর দিই না। হঠাৎ মা আমার কেঁদে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কে বাবা তুমি? আমার বাছার উপব ভর করছ?' উত্তরে চোখ পাকিয়ে আমি বলে উঠি, 'কে? কে জানিস আমি? আমি শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।' আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বা করে না। কেউ বা বিশ্বাস করে বলে উঠে, 'না ভাই ছেলেটা তো এ রকমের নয়। নাঃ, ওর উপর ভরই হয়েছে। এ সব ঠাকুর দেবতারই ব্যাপার।' এর পর আমি বাণীর পর বাণী দিতে থাকি, সমাগত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে। আমার মুখনিঃসৃত কতকগুলা কথা কারুর কারুর সম্বন্ধে মিলেও যায়। বলা বাহুল্য এই সকল গোপন কথা আমি পূর্ব্বাহ্নেই অতি কষ্টে সংগ্রহ করেছিলাম। এর কিছুক্ষণ পরে আমি হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠে বসে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাকি।

মা এইবার ছুটে এসে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছো বাবা ? কি হয়েছিল তোমার বাবা ? একটু ভাল মনে হচ্ছে তো ?' অবাক হয়ে যাওয়ার ভাণ করে আমি উত্তর দিই, 'না মা, না তো। কিছু হয়নি তো আমার।' অধিকতর অবাক হয়ে মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওমা, সে কি রে! এই যে তুই কি সব বলছিলি। তুই না'কি রামচন্দ্র ?' আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি নি, এইরূপ ভাব দেখিয়ে উত্তর দিই, 'আমি রামচন্দ্র ? মানে ? সে আবার কি ?'

বিষয়টি সজ্ঞানে এইভাবে অস্বীকার করায় আমার উপরে সকলের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। এর পর হতে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আমার ওপর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের ভর হতে থাকে। এই সময় আমি ভূত ভবিষ্যৎ, এমনি নানারূপ জানা ও অজানা তথ্যাদি বলে যেতাম। এর কতক মিলে যেতো, কতক বা মিলতো না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বাণী শুনবার জন্য দূর দূরান্তর থেকে লোক এসে আমার কাছে হত্যা দিতো। ভরের সময় আমি আগন্তুকদের ঔষধাদির সন্ধান বলে দিতাম, এমন কি ছেলেপুলেদের আশীর্ব্বাদ করে তাদের রোগও সারিয়েছি। আমি ভক্তদের সাবধান করে জানিয়ে দিতাম, 'দেখ বাপু, ডাক্তার দেখাচ্ছিস্ দেখা, খবরদার, গরীবের পয়সা কটা যেন মারা না যায়, তবে এর রোগ অবশ্য আমিই সারাব।" ডাক্তারের ডাক্তারী চলার ফলে রোগী এমনিই সেরে উঠত, কিন্তু নাম হ'ত ডাক্তারের নয়, নাম হ'ত এই আমার। এছাড়া ভরের সময় খুড়ো মশাইএর মাথায় নির্ব্বিবাদে আমার শ্রীচরণ তুলে দিয়ে আমি জানিয়ে দিতাম, 'এ বেটার কিছু হবে না। এ বেটা সুগ্রীব আছে।' খুড়া মশাই, আর জন্মে তিনি সুগ্রীব রূপ ভক্তবীর ছিলেন, এই কথা জ্ঞাত হয়ে বরং খুসীই হয়ে

উঠতেন, রাগ তো করতেনই না। এ ছাড়া মাড়োয়ারী এবং ভাটিয়া ব্যবসায়ীরাও আমার মন্দিরে এসে ধন্না দিতে থাকে, বাড়ীর সামনে রোলস্‌রয় ও মিনার্ভা কারের গাঁতি লেগে যায়। টাকা পয়সা ও গিনি মোহরে আমার সিংহাসনের তলাকার রৌপ্য রেকাবগুলি প্রতিদিনই কাণায় কাণায় ভরে উঠত।

এমনিভাবে আমার দিনগুলা বেশ ভালভাবেই চলছিল, আরও কিছুদিন হয়ত আমার এই ভাবেই চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার মাথায় এক দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হল। হঠাৎ একদিন পূর্ব্বের মত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আমি বলে উঠলাম, 'মা, জান? জান তুমি, আমি কে?' উত্তরে যশোদা মাতা জানালেন, 'জানি বই কি বাবা। তুমি শ্রীরামচন্দ্র, এ জন্মে অভাগিনীকে দয়া করেছ।' গম্ভীরভাবে আমি উত্তর দিলাম, 'হুঁ, ঠিক বলেছ তুমি। এখন যাও সীতাকে নিয়ে এস।'

এই ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি বিবাহ করেছিলাম। এতদিন পর্য্যন্ত মায়ের সঙ্গে আমার স্ত্রীও নির্ব্বিবাদে আমার সেবা করে আসছিলেন। সীতাদেবীর কথা শুনে ভীত নয়নে আমার স্ত্রী আমার দিকে (অর্থাৎ কিনা রামচন্দ্রের দিকে) তাকালেন। ব্যগ্রভাবে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি বলছ বাবা? সীতা? কোথায় আছেন তেনা?' জলদ গম্ভীরস্বরে আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আছে, নিকটেই। যা চলে যা, সোজা চীৎপুরের মোড়ে। পুলের তলায় হলদে রঙের টিনের বাড়ী। প্রতুল চক্রবর্ত্তীর ঘরে জন্মেছে সে, তার মধ্যম কন্যারূপে। যা যা, ভাল চাস তো এক্ষুণি তাকে নিয়ে আয়। সীতা, সীতা, আমার সীতা—'আমার এই শেষ আদেশ জানিয়ে দিয়ে 'সীতা সীতা' বলতে বলতে আমি পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হওয়ার পর সকলে ছুটে এসে আমাকে সীতা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন

করতে লাগলেন। আমি কিন্তু, যেন এই সম্বন্ধে কিছুই জানি না, এইরূপ ভাণ করতে থাকি। এর পর অনেক সলা-পরামর্শের পর বাড়ীর লোকেরা এবং অপরাপর ভক্তেরা সীতা অন্বেষণে বহির্গত হন। শ্রীরামচন্দ্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রতুল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীটা তাঁরা সহজেই খুঁজে বার করেন। প্রতুলবাবুর মধ্যম কন্যা সীতাদেবীরও তাঁরা দর্শন পান। বলা বাহুল্য, কিছুদিন যাবৎ এই সীতা নাম্নী কন্যাটির সহিত আমার প্রেম চলছিল। এই সুযোগে আমি তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করি। এর পর মহা ধূমধামের সঙ্গে আমি আমার সীতাকে বিয়ে করে ঘরে ফিরি, ভরের মুখেই। বিবাহের যাবতীয় ব্যয় ভার শিষ্যরাই বহন করেন। আমার প্রথমা স্ত্রীকে দিয়েই আমার মা নববধূকে বরণ করান। বেচারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমাদের ফুলশয্যার বিছানা প্রস্তুত করতেও বাধ্য হয়, যশোদা মাতার আদেশে। এর পর বেশ আনন্দেই আমাদের দিনগুলা কাটা উচিত, কিন্তু গোল বাধাল আমার প্রথমা স্ত্রী। একদিন নাচার হয়ে ভরের মুখে আমার প্রথমা স্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে আমি বলে উঠলাম, 'মা, মা, জানো ও কে? ওই সেই শূর্পণখা। ওর নাসিকা কর্ত্তন কর, এক্ষুণি।' জ্ঞান হওয়ার পর, কিন্তু আমি আমার উক্তরূপ আদেশ সম্বন্ধে অস্বীকার করি। এদিকে মা, খুড়ামশাই এবং ভক্তবৃন্দরা বিব্রত হয়ে উঠেন। কি ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ প্রতিপালিত করা যাবে, সেই সম্বন্ধে বহুবিধ গবেষণা চলে। ব্রিটিশ রাজ্যে, হঠাৎ একজনের নাসিকা কর্ত্তন সম্ভব নয়, উচিতও নয়। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশও প্রতিপালিত হওয়া চাই, তা না হলে হয় তো তিনি এ গৃহ ত্যাগ করে যাবেন, এতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অবশেষে বধূমাতার (আমার প্রথমা স্ত্রীর) নাসিকার কিয়দংশ নরুণের সাহায্যে একটু চিরে দেওয়াই ঠিক হ'ল, অনেকটা

নিয়ম রক্ষারই মত। আমার প্রথমা স্ত্রী কিন্তু (নাসিকা কর্ত্তনরূপ) এই সাধু প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হলেন না। অবশেষে বাড়ীসুদ্ধ লোক জোর করে তাকে শুইয়ে ফেলে নরুণ দিয়ে তার নাকের কিয়দংশ চিরে দিলেন। পাড়ার নাস্তিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সংবাদটি শুনামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমার প্রথমা স্ত্রীর পিতা মাতাকে সংবাদ পাঠান, তেনারা দল বেঁধে এসে প্রথমা স্ত্রীকে অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুতের পর উদ্ধার করে বাড়ী নিয়ে যান, পুলিশেও খবর পাঠান। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের এই শেষ লীলারও অবসান ঘটে।"

সকল সময়েই যে এই সব ভর হওয়ার ব্যাপারের মধ্যে বজ্জাতি বা বুজরুকি থাকে তা নয়। অনেক সময় ভাবাবিষ্ট ব্যক্তি সাময়িকভাবে বিশ্বাস করে যে তিনি সত্য সত্যিই একজন দেবতা। ইহা এক প্রকারের হিষ্টিরিয়া রোগ মাত্র। এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা দেব বা দেবীর নামে উচ্চাঙ্গের বুলি আওড়ান, তাদের আমরা ভরাগ্রস্ত বা inspired বলি। এইরূপ অবস্থায় আমরা বলি তাঁর উপর ভর হয়েছে, কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ভূত পেত্নী বা ব্রহ্মদৈত্যের নাম নিয়ে অশ্লীল গালিগালাজ করে বা অন্যভাবে কথা বলে, তাহলে আমরা বলি তাকে ভূতে (possed) পেয়েছে। আসলে কিন্তু (উভয় ক্ষেত্রেই) উহা একপ্রকার স্নায়বিক রোগ মাত্র। সাময়িকভাবে কোনও কোনও ব্যক্তি এই রোগে ভুগে থাকে। এই সময় তারা চেতন মনের অজ্ঞাতে অবচেতন মনের রত্ন ভাণ্ডার উজাড় করে কথা বলতে থাকে; জ্ঞান হওয়ার পর এর কোনও কথাই কিন্তু তার আর স্মরণ থাকে না। মনের কতকাংশ মূল মন হ'তে সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন (Split up mind) হওয়ার কারণেই এইরূপ হয়ে থাকে। এই রোগ হতে রোগীরা কখনও দিনে একবার বা দুইবার, কখনও বা

সপ্তাহ ভর ভুগে থাকে। উৎসাহ পেলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই রোগ বহুকাল স্থায়ী হয়। কোনও কোনও রোগী বা রোগিনী সামান্য মাত্র চিন্তা দ্বারা যখন তখন তাদের এই পোষা রোগ ডেকে আনতেও সক্ষম হন।

এই ধরণের ব্যক্তিদের অজ্ঞ ব্যক্তিরা মিডিয়াম, মধ্য ব্যক্তি বা ভরাগ্রস্ত বলে থাকেন। এই ভরাগ্রস্ত বা অনুপ্রেরিত এবং তথাকথিত আবিষ্ট (ভূতাবিষ্ট) ব্যক্তিদের কথাবার্ত্তা প্রায়ই সহজাত বুদ্ধি (instinctive) প্রণোদিত হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি প্রবল এবং শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি এই সময় প্রখর হয়ে উঠে। এই সময় এরা দূরাগত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম শব্দের প্রভেদ বুঝতেও সক্ষম। দূর হতে কাকা বা পিতার জুতার শব্দ শুনে এরা বলে দিয়েছে কাকা বা পিতা আসছেন, কিন্তু এইরূপ শব্দ অপর কেহ শুনতে পায় নি। সহসা আসা 'হাইপার-সেনসিগিলটির' কারণে এইরূপ হয়ে থাকে। বহুদিন অসুখ ভোগ করার পর সাধারণ মানুষও ইহা প্রায়ই উপলব্ধি করেছে। এই সময় তারা নিজেদের মূল মনের অজ্ঞাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে কথা বলতে থাকেন। কোনও কোনও মানুষের মধ্যে দৃষ্ট বহু ব্যক্তিত্ব বা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কারণেও এইরূপ ঘটে থাকে। বিচ্ছিন্ন মন বা Split up mindই ইহার কারণ, এই সব ব্যক্তিত্বের (personality) একটি থাকে জাগ্রত এবং বাকিটি (কিংবা বাকিগুলি) থাকে সুপ্ত। এই সুপ্ত ব্যক্তিত্বের একটি ব্যক্তিত্ব হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠে মূল ব্যক্তিত্বটিকে প্রদমিত করে কর্ম্মতৎপর হওয়ার কারণেই এইরূপ হয়ে থাকে। মানুষের এই সুপ্ত ব্যক্তিত্ব অলক্ষ্যে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখে, এবং সে যাহা কিছু শুনে বা দেখে তা সে মনে রাখে, যদিও কি'না তার জাগ্রত ব্যক্তিত্বটি এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় শুনেও শুনে না, দেখেও দেখে না, অর্থাৎ কি'না এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় সে নির্লিপ্তভাবে এড়িয়েই যায়। ভরের সময় উপরের জাগ্রত ব্যক্তিত্বটি

হয়ে যায় সুপ্ত এবং নিম্নের সুপ্ত ব্যক্তিত্বটি হয়ে উঠে জাগ্রত। এই কারণে আমরা সাধারণ ভাবে দুষ্ট মূর্খ ব্যক্তিদেরও ভরের মুখে বহু ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথা বলতে শুনে থাকি। ইংলণ্ডের কোনও এক মুদী রাত্রে উঠে বসে ভাবের মুখে বহু কবিতা লিখত এবং সে কবিতাগুলো বিক্রয় করে বহু অর্থ উপার্জ্জনও করেছে, কিন্তু দিবাভাগে সে এই কবিতার "ক"ও সে কখনও লিখতে পারে নি। কারণ এই সময় সে তার মনে ভাব বা Mood আনতে পারে নি। কোনও কোনও ব্যক্তি এক সঙ্গে এবং একই সময় দুইটি কাজ সমান ভাবে করে যেতে সক্ষম হয়েছে, এইরূপও দেখা গেছে। এরা একজনের সঙ্গে একটি বিষয় কথা বলছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি বিষয় সম্বন্ধে পাতার পর পাতা নির্ভুলরূপে লিখে চলেছে, এমনও দেখা গেছে। উপরি উক্ত কারণগুলাই এজন্য দায়ী। ভরাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অপরাধী বলা চলে না, কিন্তু যে সকল ধূর্ত্ত ব্যক্তি জেনে শুনে এই সব রোগীর সাহায্যে ব্যবসা চালিয়ে অর্থোপার্জ্জন করে তাদেরই আমরা অপরাধী বলে থাকি।

এই সকল গুরু সাধু দেবতা বা অপদেবতার কবলে পড়ে ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নয়। এমন অনেক বিধবা মহিলাকে আমি জানি যারা কিনা তাদের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি গুরুর পাদপদ্মে উৎসর্গ করে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। এই সকল বকধার্ম্মিকগণ বাঙলার কত সরল প্রকৃতির সমৃদ্ধ পরিবারের যে সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। আমার মতে এই সকল দুর্ব্বৃত্তদের শায়েস্তা করার জন্যে সাধারণ আইনের বহির্ভূত একটি বিশেষ আইন (ordinance) প্রণয়নের সময় এসেছে। এই সকল দুর্ব্বৃত্তরা কিরূপ পদ্ধতিতে প্রতারণার উদ্দেশ্যে শিষ্য সংগ্রহ করে সেই সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক।

সাধারণতঃ এই সকল দুর্ব্বৃত্তরা কতকগুলি প্রচারক পুষে থাকেন। এই সকল প্রচারক ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে স্ব স্ব গুরু বা সাধুর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে প্রচার করে বেড়ান। ভক্তদের সাধুর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হয়, নানারূপ বচন-বিন্যাসের সাহায্যে এই সকল প্রচারক বা দালালেরা ভক্তদের মন সাধুর প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে এইরূপ কয়েকটি বচন-বিন্যাস উদ্ধৃত করা হ'ল।

"হাঁ মশাই, বলি শুনুন, এ মশাই শোনা কথা নয়, নিজের চক্ষে দেখা এসব। আমি তখন দানাপুরের ষ্টেশন মাষ্টার। অফিসে বসে হিসেব মেলাচ্ছি, এদিকে ট্রেণও এসে পড়েছে। সকলেই খুব ব্যস্ত, হঠাৎ বাইরে একটা মহা হট্টগোল শোনা গেল। বেরিয়ে এসে দেখি, সাড়ে সাত ফুট লম্বা এক সাধুকে চার পাঁচ জন এ্যাংলো চেকারে মিলে নামিয়ে আনছে। এর পর সাধুবাবা কি করলেন জানেন? বলি শুনুন, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইঞ্জিনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যস্ ইঞ্জিন একেবারে নিশ্চল, আমরা ঘন্টি মারি, ইঞ্জিন সিটি দেয়, কিন্তু চলে না। বেশ বুঝা গেল, সবই সাধুর কীর্ত্তি। সাধুকে টেনে প্ল্যাটফরমের বাইরে আনার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ট্রেণটাও চলতে সুরু করে দিল। যাক্, সাধুবাবা তো প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে এলেন, কিন্তু এসে কি করলেন জানেন? হাঁ, বলি শুনুন, সে এক অবাক কাণ্ড। তিনি দুই হাতের দশটা আঙুল তাঁর লম্বা লম্বা দাড়ির ভিতর সেঁদিয়ে দিয়ে টিকিট বার করতে সুরু করলেন, দেখতে দেখতে ভিড়ও জমে গেল বিস্তর। সাধুবাবা একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় যাবে?' উত্তরে লোকটা বললে, 'আজ্ঞে দিল্লী।' দাড়ির ভিতর আঙুল চালিয়ে একটা দিল্লীর টিকিট বার করে সাধু বললেন, 'লাও।—আর তুমি?' একজন বললে,

'আজ্ঞে পুরী।' দাড়ির ভিতর হতে আর একটা পুরীর টিকিট বার করে সাধুবাবা বললেন, 'লাও।' এমনি করে কাউকে দিলেন তিনি মোগলসরাইএর টিকিট, কাউকে বা বেনারসের। মথুরা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দার্জ্জিলিং, ঢাকা, লাহোর, পেশোয়ার, যে যেখানে যাবে বলে তাকে তিনি সেইখানকার টিকিট দিতে থাকেন। টিকিট আর কেউ কেনে না। টিকিট ঘর এমনিই বন্ধ হয়ে গেল, আমরা তখন বাধ্য হয়ে এজেণ্টকে 'তার' করলাম। এজেণ্ট এল, ডি টি এস এল, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব তো এলেনই, অনেক সলা পরামর্শ হ'ল। এর পর এজেণ্ট হাতীর দাঁতের প্লেটের উপর নিজে হাতে খোদাই করে, চারজনের মত একটা পাশ সাধুবাবাকে লিখে দিলেন, যাতে করে কি'না তিনি সারা ভারতবর্ষ ইচ্ছা মত ভ্রমণ করতে পারেন।

"এই তো গেল একদিনের কথা, আর একদিনের ঘটনা বলি শুনুন, এই সময় আমি হেড অফিসে বদলি হয়েছি। দরকারী কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে দেখি সেই সন্ন্যাসী। বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আরে আপ্ হিঁয়াপর?' কোনও কথার উত্তর না দিয়ে, সাধুবাবা টেবিল থেকে কয়েকটা দরকারী সরকারী কাগজ উঠিয়ে নিলেন। আমি 'হাঁ হাঁ হাঁ' করে বলে উঠলাম, 'আরে এ কেয়া করতা, মহারাজ, ই বহুৎ জরুরী কাগজ! মেরি নোকরী চলি যায়গা।' আমার কথা শুনে, সাধু মহারাজ একটু হেসে নিলেন, কি মিষ্টি সে হাসি। এর পর সস্নেহে একটা হাত আমার পিঠের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসিকো বাস্তে নকরী করতি বেটা?' আশ্বস্ত হয়ে আমি উত্তর করলাম, 'রূপেয়াকে বাস্তে মহারাজ!' উত্তরে সাধুবাবা বললেন, 'কেয়া? রূপেয়াকো বাস্তে? হুঁ—' এর পর হঠাৎ সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে তিনি সেই কাগজগুলা ছিঁড়ে টুকরা

টুকরা করে মেঝের উপর ছড়িয়ে দিয়ে, বলে উঠলেন, 'লেও।' মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সেই টুকরাগুলা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। চমকে উঠে সকলে চেয়ে দেখি, খাস সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আমলের টাঁকশালে তৈরী; গরম গরম সিকি, আনি, দুয়ানি আর আধুলি এধার ওধার গড়িয়ে পড়ছে। এর কতদিন পর আমি পেনসন্ নিয়েছি, তার পরও আরও কতদিন চলে গেছে, এতদিন পর আজ হঠাৎ আমি আবার তাঁর সন্ধান পেলাম। সকালে স্ত্রীকে নিয়ে মর্ণিং ওয়াক করে ফিরছি, হঠাৎ দেখি তিনি একটা ধুনি জ্বেলে গঙ্গার ধারে বসে আছেন। আমাকে ডাক দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়া বেটা চিনোত হামা? তবিয়েত সে ঠিক আছে তো?' 'কেঁদে উঠে আমি জানালাম, সে সবই ভাল প্রভু, কিন্তু জামাইটা আমার বাঁচে না।' একটু হেসে ঝুলির ভিতর থেকে একটা শিকড় বার করে সেটা আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'সে যক্ষ্মা রোগ তো? বড় খারাপ রোগ মা। লেকেন এটা তো তাকে খাইয়ে দে'।"

খোদ্ সাধুবাবারা সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় অপরাধী হয়ে থাকেন, অর্থাৎ কি'না পারতপক্ষে তাঁরা কাউকে আঘাত হানেন না, এমন কি ধরা পড়ার পরও না। সাধারণতঃ তাঁরা নিষ্ক্রিয় ভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা ধর্ম্মের নামে গৃহস্থদের অর্থে অলস জীবন যাপন করেন, কিন্তু তাঁর দলের এই সব প্রচারকদের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা চলে না, এই সব প্রচারকরা সাধারণতঃ গৃহী হয়ে থাকে, এদের কেউ কেউ এই সকল সাধুবাবাদের স্ব গৃহে পুষেও থাকেন। প্রচার কার্য্যে বাধা পেলে ধর্ম্মের নামে তাঁদের প্রায়ই মারপিট করতে দেখা যায়। কোনও এক প্রচারকের উপরি উক্তরূপ প্রচার কার্য্যের প্রত্যুত্তরে আমার কোনও এক বন্ধু নিম্নোক্ত রূপ একটি কাহিনীর অবতারণা করেন। এর ফলে ছদ্মবেশী প্রচারকটি মারমুখী

হয়ে আমার বন্ধুকে প্রহার করেছিলেন। কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক হেতু পাঠকদের অবগতির জন্যে উহা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমিও বলি তবে শুনুন, আমেরিকার কেণ্ট জার্ণালে বিষয়টি বেরিয়েছিল। আমেরিকার এক বড় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটির আবিষ্কারক। যন্ত্রটির মধ্যে একটি বক্না বাছুর ঢুকিয়ে দিয়ে যদি হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দেন তো দেখবেন, তার একটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ছুরী, কাঁটা, নস্যির কৌটা ইত্যাদি, অর্থাৎ কি'না শিং ও ক্ষুর থেকে যা তৈরী হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই যন্ত্রের দ্বিতীয় মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখবেন, চপ, কাটলেট, আমলেট, স্থপ, অর্থাৎ কিনা মাংস দিয়ে যে সব খাদ্য তৈরী হয়। এরপর এর তৃতীয় মুখটা দিয়ে আপনারা বেরুতে দেখবেন, স্থট্‌কেস্, মণিব্যাগ, বেণ্ট, চামড়ার পেটিমাপ্টু, জুতা বাঁধা ফিতা ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা যে সকল দ্রব্য গরুর চামড়ায় তৈরী হয়, এবং এর শেষ মুখটা হতে আপনারা বেরুতে দেখবেন, ছানা, ঘি, মাখন, সন্দেশ, দই ইত্যাদি, অর্থাৎ কিনা যে সকল সামগ্রী দুধ হ'তে তৈরী হয়। আর সর্ব্বশেষে কি হবে জানেন? সব শেষে যন্ত্রের তলাকার একটা দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসে একটা আস্তো কেলে বাছুর, অর্থাৎ কিনা 'নো লস্ অব এন্যার্জ্জি, শক্তির কোনও রূপ ক্ষয়ই হয় না, বুঝলেন'।"

আমি আমার বন্ধুটির নিকট শুনেছি যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আজগুবী গল্পটি আগন্তুকগণ পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং উপভোগ করলেও, তার এই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আজগুবী গল্পটি তাঁরা বরদাস্ত করেন নি। এই ভাবে তাঁরা একজন ধর্ম্মগুরুকে বিদ্রূপ করার জন্য বন্ধুর উপর ক্ষেপে উঠেন। আগন্তুকদের মধ্যে একজন ভট্টপল্লীর লোক ছিলেন। তিনি নাকি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বন্ধুকে বলেছিলেন, 'জানো-ও! ভট্টপল্লীর মধ্যে

টুকরা হ'লে গাত্র হতে তোমার চর্ম্ম স্খলিত করে নিতাম ইত্যাদি।' পড়ছাড়া পণ্ডিত ভদ্রলোকটি তাঁকে নাকি অর্ব্বাচীন, মূর্খ প্রভৃতি সম্বোধনেও ভূষিত করেছিলেন। এই ধরণের মনোবৃত্তি এ দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্য মাত্র। কোনও এক হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে কোনও এক মন্ত্রগুরু বলেছিলেন, 'আমি অমুক গ্রামে থাকি এবং আমার পেশা গুরুগিরি।' হাকিম মহোদয় না'কি তাঁর এই উত্তরের ইংরাজী করেছিলেন এইরূপ—'আই এ্যাম্ এ রেসিডেণ্ট্ অব্ (সো এণ্ড সো প্লেস) হোয়ার্ আই এ্যাম্ এ রিলিজিয়াস ফ্রড্।' পাঠকবর্গকে আমি কথাটা ভেবে দেখতে বলি। এর মধ্যে কি কোনও সত্য নেই ? আমি এমন অনেক অল্প বয়স্ক গুরুঠাকুরকে জানি, যে কিনা মুমূর্ষু বা মরণযাত্রী অতি বৃদ্ধ শিষ্যা বা শিষ্যদের মস্তকে পা তুলে দিয়েছে, যাতে ক'রে কিনা সে স্বর্গে যেতে পারে। অপরাপর বিষয়ের ন্যায়, ভণ্ডামীরও একটা সীমা আছে, ভণ্ডামী সহ্য করারও। বাক্জাল সৃষ্টি করে অজ্ঞ শিষ্য-শিষ্যাদের ঠকাবার ক্ষমতা এদের অসীম। কোনও এক ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আচ্ছা, ওই যে এয়ারোপ্লেনটা উড়ছে, ওটা কি একটা আশ্চর্য্যজনক নয়? আপনার অলৌকিক গল্পগুলি কি এর চেয়েও আশ্চর্য্য ?' বলা বাহুল্য, অজ্ঞ শিষ্যকে ঠাকুর-মশাইএর কবল হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করি। ঠাকুরমশাই কিন্তু এতে দমে উত্তর দেন, শিষ্যকে শুনিয়ে শুনিয়ে, 'ভারি-ই আশ্চর্য্য ! আরে ওড়বার জিনিস উড়ছে এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে। ওকে তো সৃষ্টি করাই হয়েছে উড়বার জন্যে। ওড়াও তো বাবা, ওই চেয়ারটা বা টেবিলটা, কত বড় তোমার বিজ্ঞান দেখি।' এ বিষয়ে অপর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

"কোনও এক ঠাকুরমশাই শিষ্য বাড়ী গিয়ে স্বপাক ভোজন করতেন,

কারণ তিনি নিরামিষ ভোজন করেন এবং শিষ্যরা করেন আমিষ ভোজন। হঠাৎ একদিন আমি এই ঠাকুরমশাইকে একটা মৎস্য হস্তে গৃহে ফিরতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'এ কি ঠাকুরমশাই, মাছ হাতে যান্ কোথা ?' উত্তরে নির্লজ্জের মত ঠাকুরমশাই আমাকে জানান, 'তা বাবা বাড়ীতে একটা বিড়াল-শিশু আছে কিনা ? ইত্যাদি।' এর কয়েকদিন পর আমি তাঁর এক ধনী শিষ্য সমভিব্যাহারে ঠাকুরমশাইএর গৃহে এসে দেখি তাঁর উঠানে চার পাঁচটি বড় বড় মৎস্য বঁটির সাহায্যে কুটা হচ্ছে, এবং ঠাকুরমশাই তাঁর অহিংস-নীতি ও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বা প্রমাণ স্বরূপ স্বয়ং মৎস্য কুটার তদ্বির করছেন। আমাদের হঠাৎ সেখানে আসতে দেখে কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'এসো বাবাজীবন, এসো। এ মৎস্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর এ যজ্ঞ মদ্‌গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। তা বাবা প্রসাদাদি পেয়ে যাবে। তোমাদের (শিষ্যদের) আর গাঁয়ের গরীবদের জন্যই যা কিছু সব। আমরা তো আর, হে হে হে—"

এই গুরু ও সাধুগণ গৃহস্থদের কতদুর পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ করতে সক্ষম তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে বুঝা যায়। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"হঠাৎ দেশে ফিরে শুনি, আমার শ্বশুরালয়ে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছে, এবং আমার শাশুড়ী শ্যালিকাদ্বয় এবং সেই সঙ্গে আমার স্ত্রীও সাধুসেবায় নিযুক্তা, এমন কি তাদের আহার নিদ্রারও সময় নেই। প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করা মাত্র আমি এ বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাই, কিন্তু অপর লোক ত দুরের কথা, আমার নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত নিবৃত্ত করতে সক্ষম হই না। একদিন শ্বশুরমশাই আমার শিশু শ্যালকটিকে ধমক্ দিয়ে বলছিলেন, 'হতভাগা পড়াশুনা করছিস্ না খাবি কি করে ?' উত্তরে শ্যালকটি সকলকে অবাক করে দিয়ে

বল্লে উঠল, 'কেন? গুরুগিরি করে?' আমি অবাক হয়ে ভাবি, এতটুকু একটি বালকও যা সহজে বুঝেছে, তা বয়স্ক ব্যক্তিরা বুঝছেন না কেন? এরপর আমি ঔৎসুক্যজনিত এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সাধুবাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমাকে অভিশাপ দেন, 'নির্ব্বোধ অবিশ্বাসী। শীঘ্রই তোর সর্ব্বনাশ হবে।' এর মাস দুই পরে আমার একমাত্র জামাতা মারা যায়। কন্যা আমার বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে, এবং মাতার নির্দ্দেশে সেও সাধুসেবায় নিযুক্ত হয়। এই দুর্ঘটনার জন্যেও সকলে আমাকেই দায়ী করে। এর কয়েকদিন পরে আমার মধ্যম পুত্র টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হয়। এর ফলে আমার উপর ভীষণ পীড়াপীড়ি চলে, সকলেরই মতে আমার নাকি সাধুবাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত। সাধুবাবা কিন্তু কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করেন না, তবে তিনি বলেন যে, আমি যদি নীচে হ'তে ওপর পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি সিঁড়ি জিহ্বা দ্বারা চেটে চেটে উপরে উঠে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি, তবে না'কি তিনি আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করলেও করতে পারেন। সাধুবাবা তখন ত্রিতলের একটি নিরালা কক্ষে বাস করছিলেন। আমি সর্ব্বশুদ্ধ আঠারটি সিঁড়ির ধাপ জিহ্বার দ্বারা চাটতে চাটতে উপরে উঠি, নিরুপায় হয়ে। অপত্যস্নেহে আমি তখন এমনিই অন্ধ যে আমার একবারও মনে হ'ল না, এইরূপ কত দুর্ঘটনা ঘরে ঘরে ঘটে থাকে, বা ঘটতে পারে, সাধু সন্ন্যাসীর কোপ ব্যতিরেকেও। আমার এই কৃচ্ছ্রসাধনা বোধ হয় সাধুবাবাকে নিরুদ্বেগ করতে পেরেছিল। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমার গৃহে এসে রুগ্নপুত্রের শিয়রে বসলেন। এ ছাড়া আমার স্ত্রীর সাহায্যে, যে সকল ডাক্তার বৈদ্য আমার পুত্রের চিকিৎসার ভার নিয়েছিল, তাদেরও বিদায় করলেন।

অপর কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকেই না'কি তিনি আমার পুত্রকে নিরাময় করতে সক্ষম। ইন্‌জেক্‌সন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পুত্রের অবস্থা খারাপ হতে আরও খারাপ হতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যের সময় ঘরে ঢুকে দেখি পুত্রের আমার শ্বাস আরম্ভ হয়েছে। ক্ষেপে উঠে তখন সাধুকে শুধাই, 'একি? এ যে শ্বাস আরম্ভ হয়েছে?' উত্তরে খেঁক্‌রে উঠে সাধুবাবা বলেন, 'দেখতে পারছিস্ না, হ্যাচোড়-প্যাচোড় হচ্ছে। অর্থাৎ কি'না যমে একদিকে টান্‌ছে, আর আমি একদিকে টান্‌ছি।' এরপর আমি বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনি এবং তারপর সাধুবাবাকে উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দেই। এইভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে আমি তুইটি পরিবারকে রক্ষা করি। পরে জানতে পারি সাধুসেবার ব্যয় বাবদ, এক বৎসরের মধ্যে শ্বশুরমশাইএর বসত বাটীটা পর্য্যন্ত বন্ধক পড়েছে। নগদ টাকা যা কিছু ছিল, তা তো গেছেই এমন কি জমি-জমাগুলা পর্য্যন্ত নীলামে উঠেছে।"

এইবার কেন শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সময় সময় সাধুভক্ত হয়ে উঠে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। দৈহিক রোগের ন্যায় মানুষ মানসিক রোগেও ভুগে থাকে। এই মানসিক রোগ দৈহিক রোগ অপেক্ষা অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। কিন্তু এই মানসিক রোগকে আমরা রোগ রূপে স্বীকার করি না, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত পুরাপুরি সে পাগল হয়ে উঠে। অনেক সময় এই সকল মানসিক রোগ, দৈহিক রোগ রূপেও চালু হয়। এমন কি মানসিক রোগের কথা রোগীরা পর্য্যন্তও স্বীকার করতে চায় না। দিনের পর দিন, মনের মধ্যে একটা নিদারুণ অশান্তি নিয়ে তারা এই রোগে ভুগে, কিন্তু লজ্জায় এই রোগের কথা সে কাউকে বলে না। এ কথা বলতে পারলে হয়ত ভালই হত, আলোচনার

দ্বারা এর ঔষধেরও সন্ধান মিলত। আমি এমনও অনেককে জানি যে কিনা তার রোগের কথা অপরকে বলার পরেই ভাল হয়ে উঠেছে, এই বলতে না পারাই ছিল তার মানসিক অশান্তির একমাত্র কারণ। অনেকে এই সব মানসিক রোগ স্ববাক্-প্রয়োগ দ্বারা সারিয়ে ফেলে, কারুও বা পরবাক্-প্রয়োগের (outside suggestion) প্রয়োজন হয়। ব্যর্থ আশা আকাঙ্ক্ষা, দমনীত স্পৃহা বা ইচ্ছা এবং দমনীত (Repressed) ভয় বা দমনীত যৌনবোধের কারণে এই সব রোগের উৎপত্তি হয়। হঠাৎ শোক বা ভয় পেলেও এই সব রোগ এসে থাকে। এই সকল রোগ সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে, কোনও একটি বিশেষ চিন্তা, মানুষের অপরাপর চিন্তার ঊর্দ্ধে উঠে মানুষকে নিয়ত আঘাত হানে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষের মন কোনও একটি চিন্তা অধিকক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়, একটির পর একটি চিন্তা মনে এসে মুহুর্মুহুঃ তাকে বিরক্ত করে। এইরূপ অবস্থায় মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। স্ববাক্-প্রয়োগে এই রোগ সারাতে মানুষ অক্ষম হলে অনেক সময় তারা তাদের এই মানসিক রোগের কথা সাধু সন্ন্যাসীদের বলে বসে; মানুষ সাধু বা গুরুর কাছে আসে তখনই, যখন কিনা তাদের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এই গুরু বা সাধুগণও মানুষের এই সকল দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে ভাল রূপেই অবগত থাকেন। এঁরা তখন নানা রূপ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা এই সকল রোগ বা অশান্তি হতে মানুষকে মুক্ত করে দেন। বলা বাহুল্য যে কোনও আত্মীয়স্বজন দ্বারাও এই কার্য্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারত। কয়েক মিনিট বাক্-প্রয়োগ এবং কারণ নির্দেশনের পর রোগী এমনিই নিরাময় হয়ে উঠে। এজন্যে সাধু-সন্ন্যাসীর দরকার হয় না। এই ভাবে নিরাময় হওয়ার পর মানুষ এই সব সাধুদের অত্যন্তরূপ অনুগত হয়ে উঠে। অনেক সময় এই সব

চিন্তারোগ বা অশান্তির পুনরাবির্ভাবও হয়, মানুষ তখন পুনরায় উপকারী সাধুটির কাছে ছুটে আসে। কোনও কোনও সাধু বাক্‌-প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মধ্যে এই সব মানসিক রোগ সৃষ্টি করেন। মানুষের মন যখন এই ভাবে অশান্ত হয়ে উঠে, তখন সেই সাধু আবার উল্টা বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা তাকে নিরাময় করে বশীভূত করেন। এ ছাড়া ম্যাজিকেরও মারপ্যাচ আছে। ম্যাজিক যে আজিকার দিনে হাত সাফাই বা কতকগুলি রসায়ন দ্রব্যের মারপ্যাচ মাত্র, একথা সকলেরই জানা আছে। এই ম্যাজিকের সাহায্যে কোনও কোনও সাধু নানারূপ গন্ধ বার ক'রে গন্ধ-বাবা সাজেন, এমন কি কেহ কেহ শূন্যে অবস্থান করতেও সমর্থ হন। এইরূপ ভেল্কির সাহায্যে অলৌকিক শক্তি দেখিয়েও কেহ কেহ শিষ্যদের বশীভূত করে থাকেন। শিষ্যাদের বশীভূত করার জন্যে সাধুবাবারা আরও একপ্রস্থ এগিয়ে যান। পরপুরুষ সাহচর্য্যের স্পৃহা প্রায় সকল মেয়েদের ভিতরই কম বেশী বর্ত্তমান থাকে। এই বিশেষ স্পৃহা স্ত্রী মাত্রেরই আদিম স্পৃহা, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবী তার এই আদিম স্পৃহা ত্যাগ করেছে, কিন্তু তা হলে কি হয়, যে কোনও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে এই বিশেষ স্পৃহার কবলে পুনরায় পড়তে পারে। ভয়, ভাবনা, আত্মসম্মান এবং কর্ত্তব্যবোধ মানবীকে তার এই স্বাভাবিক স্পৃহা হতে রক্ষা করে। অপরাধ-বিজ্ঞানের ১ম খণ্ডে বিষয়টি সম্যকরূপে আলোচিত হয়েছে, এক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গুরু সেবার মধ্যে লজ্জাবোধের কারণ নেই, মেয়েরাও এই সুযোগে তাদের এই সুপ্ত স্পৃহার (গুরুসেবা দ্বারা) উপশম ঘটায়। তবে উহা অবচেতন মনের মধ্যেই অধিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকে, বাহিরে বা চেতন মনে উহা কদাচিৎ প্রকাশ পায়। তবে তাদের চেতন মনে এই ইচ্ছা বা স্পৃহা প্রকাশ পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করে প্রায়শঃ গুরু বা সাধুর বয়স বা ইচ্ছার উপর।

আসলে বাক্‌-প্রয়োগ এবং অভিনয় দ্বারা সাধু সন্ন্যাসীরা শিষ্য ও শিষ্যাদের বশীভূত করেন। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প উদ্ধৃত করলাম গল্পটি শোনা গল্প, এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হলেও এর বৈজ্ঞানিক দিকটা কখনই অবিশ্বাস্য নয়।

"অমুক ষ্ট্রীট দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি সামনে এক সাধুবাবা। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তিনি একটা খড়ি দিয়ে রাস্তার এপার হতে ওপার পর্যান্ত একটি দাগ কেটে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভো ভাই সব, মাৎ যাও উধার। যো উধার যাযেগা উ জ্বল যায়গা!' ঠিক এই সময় একজন পোষ্টাল পিয়ন এসে সেখানে হাজির। মানা সত্বেও এগিয়ে যাওয়া মাত্র, সাইকেল সমেত ছিটকে পড়ে সে কেঁদে উঠল, 'ওরে বাবা জ্বলে গেলাম, ওঃ।' তার হাতের মণিঅর্ডার ফর্ম ও তার টাকা কয়টাও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সরকারী টাকা-কড়ি ও কাগজপত্র রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল, সাইকেলে মুহুর্মুহু ঘন্টি দিতে দিতে। এর পর খড়ির দাগের ওপারে আর কেউ এগুতে সাহস করে না, দেখতে দেখতে সেখানে প্রায় দুই শত লোকের একটা ভীড় জমে গেল। * এর কিছুক্ষণ পরেই সেখানে এসে হাজির হলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, হাতে তাঁর দধির হাঁড়ি ও সন্দেশের বোঝা, আমরা অনেকেই তাকে ওপারে যেতে মানা করলাম, কিন্তু তিনি কারও কোন মানাই কানে নিলেন না। 'যত সব' বলে তিনি দাগের ওপারে একটি মাত্র পা বাড়িয়েই, 'জ্বলে মলুম, জ্বলে মলুম!'

* বলা বাহুল্য এই ভীড়ের মধ্যে যারা মুড়লী করছিল তারা সাধুবাবারই সাকরেদ ছিল। এই সব লোকেরাই পথচারীদের জোর করে ঐ রেখার ওপারে সরিয়ে রাখছিল।

শব্দে উপুড় হ'য়ে পড়ে গেলেন। তাঁর হাতের দধি ও সন্দেশের পাত্র দুইটিও চুরমার হয়ে রাস্তার উপর ভেঙে পড়ল। এর পর সেখানে এসে হাজির হলেন একজন এ্যাংলো সাহেব ও তার মেম। গট্ গট্ করে এগিয়ে এসে দাগের উপর পা দেওয়া মাত্র তারাও এক লাফে পিছিয়ে এসে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ মাই গড্, বারনিং সেনসেশন্।' এর পর সাধুবাবা একটু হেসে দাগটা পা দিয়ে মুছে ফেলে বলে উঠলেন, 'ঠিক হ্যায়, হো গিয়া৷ আপ লোক যানে শেক্তা আভি।' ততক্ষণে সেখানে প্রায় হাজার দশ লোক এসে জমেছে। এর পর সাধুবাবা লম্বা লম্বা পা ফেলে মাইল খানেক হেঁটে এসে তাঁর আস্তানায় উঠলেন। সাধুবাবার পিছন পিছন তাঁর আস্তানা পর্য্যন্ত এগিয়ে এল, প্রায় হাজার খানেক লোক। আস্তানার ভিতরকার একটা হলঘরে প্রায় জন দশ বারো ভক্ত তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম, সাধুবাবার বয়স নাকি একশ সাতান্ন বৎসর, কায়কল্পের দ্বারা নাকি তিনি এত অল্প বয়স্কের মত হয়েছেন, তা ছাড়া ধ্যানে বসার সময় নাকি তিনি মাটি হতে প্রায় ইঞ্চি দুই উপরে উঠেন। এ ছাড়া এঁর কাছে না'কি লর্ড ক্লাইভের লেখা একখানা চিঠিও আছে। চিঠিখানাতে লর্ড ক্লাইভ তাঁকে 'মাই ডিয়ার ইয়ং সন্ন্যাসী' বলে সম্বোধন করে তাঁর কাছে তিনি সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন, ইত্যাদি। এর পর দেখতে দেখতে হলঘরে সাজানো রেকাবিগুলি সিকি, আনি ও টাকাতে ভর্ত্তি হয়ে উঠতে থাকল। আমি প্রত্যহই এসে সাধুকে একবার করে দর্শন করে যেতাম। এর কয়দিন পরে সেখানে পুলিস এসে হাজির; সাধুবাবা না'কি একজন ফেরার আসামী, তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। পুলিসের ধমকে সাধুবাবা মিনতি জানিয়ে বলে উঠলেন, 'কেন স্যার

আমাকে দিক্ করছেন? সর্ব্বশুদ্ধ এ কয়দিনে আমার আয় হয়েছে মাত্র সাত শ' পঞ্চাশ। এ থেকে আমাকে সেই পিয়নটাকে দিতে হয়েছে দেড় শ' টাকা, যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি খাবার শুদ্ধ পড়ে গিছলেন, তাঁকে আমি দিয়েছি আড়াই শ' টাকা, এ ছাড়া সেই সাহেব ও তার মেমসাহেবকে দিতে হ'ল এক শ' করে দুই শ' টাকা। এই সব খরচ খরচা বাদে আমার ভাগে পেয়েছি কুল্লে মাত্র দেড় শ' টাকা। এবারকার মত আমাকে মাপ করে দেন, হুজুর। আসলে আমার কপালটাই মন্দ। তা না হলে একটা মাসও সবুর সইল না, আপনার—"

এইবার প্রশ্ন উঠতে পারে, আচ্ছা! তাই যদি হয় তা'হলে বড় বড় ব্যারিষ্টার, প্রফেসার, হাকিম এবং জমিদাররা, এমন কি ধুরন্ধর ব্যবসাদাররাও এই সব সাধুবাবাদের ভেল্কিবাজীতে ভুলে যান কেন? এর উত্তরে এইরূপ বলা যেতে পারে। মানুষের মনোদেশে অনেকগুলি কেন্দ্র বা পয়েণ্ট থাকে। একটি কেন্দ্রে হয় তো সে মূর্খ রোগী বা পাগল কিন্তু অন্যান্য পয়েণ্ট বা কেন্দ্রে সে একজন সহজ বা স্বাভাবিক মানুষই থাকে। যান বিশেষের চাকার অনেকগুলি poke বা কাটি থাকে, এর একটি poke কেটে বা ভেঙে গেলেও চাকাটি সমান ভাবেই ঘুরে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটু আধটু শব্দ হয়, এই যা। এই ভাবে মনের একটি কেন্দ্রে মানুষ দুর্ব্বল থাকলেও তার অপর কেন্দ্রগুলি সবলই থাকে। এজন্য অপরাপর বিষয়ে তাদের সহজ মানুষের মতই দেখা যায়।

এই সকল সাধু সন্ন্যাসী বা গুরুদেবেরা অনেক সময় বিকল্পের সাহায্যেও মানুষ ঠকিয়ে থাকেন। বিকল্প দুই প্রকারের হয়, যথা—(১) বহির্বিকল্প (২) অন্তর্বিকল্প। রজ্জু-সর্প, শুক্তি-মুক্তা, মায়া-মরীচিকা প্রভৃতি বহির্বিকল্পের (illusion) দৃষ্টান্ত। এই বিশেষ

ক্ষেত্রে বিকল্প চক্ষু হ'তে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অপর দিকে অন্তর্বিকল্পের (halucination) মধ্যে কোনও রূপ বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অন্তর্বিকল্পের বিষয়বস্তু চিন্তার দ্বারা মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয় এবং পরে উহার ছবি মস্তিষ্ক হ'তে চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায় আমরা ভূত বিভীষিকা প্রভৃতি দেখে থাকি। কেহ কেহ এই অবস্থায় স্ব স্ব আরাধ্য দেবতার অলীক ছবিও দেখে থাকেন। অর্থাৎ কি'না প্রথমক্ষেত্রে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্প বা রজ্জু কোনটিরও অস্তিত্ব থাকে না, অথচ মানুষ সর্প দেখে থাকে। মস্তিষ্ক বিকারের কারণেই এইরূপ ঘটে। এই ধরণের ভুল পরিদর্শনকেই আমরা অন্তর্বিকল্প বলি। ঠগী অপরাধীরা মানুষের এই সব স্বভাবগত বিকল্প সম্বন্ধে অবহিত থাকে এবং তারা প্রায়ই কথনও বাক্-প্রয়োগ (Suggestion) দ্বারা কথনও বা হাত সাফাই বা ম্যাজিকের সাহায্যে দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষের মধ্যে বিকল্পের সৃষ্টি ক'রে নানা রূপে তাদের ঠকিয়ে থাকে। মাদক দ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত শ্রম, দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাহীনতার কারণেও অন্তর্বিকল্পের সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় কোনও কিছু চিন্তা করা মাত্র উহার একটি ছবি মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয়ে থাকে। আমরা প্রায়ই দেবতার দুয়ারে হত্যা দিয়ে ঔষধ লাভের বা স্বপ্নদেখার কাহিনী শুনে থাকি—বলাবাহুল্য ইহাও এক প্রকারে অন্তর্বিকল্প মাত্র। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"বৃদ্ধা মহিলাটি পুত্রের রোগ নিরাময়ের জন্যে প্রায় সাত মাইল হেঁটে আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে এসে পৌছান। এ ছাড়া নিয়ম মত সমস্ত পথ তিনি ভূমি চুম্বন করতে করতে এসেছেন। পথশ্রমে তিনি ক্লান্ত, অতি পরিশ্রমের ফলে পেশীসকল তাঁর অসাড় হয়ে এসেছে। তাঁর

উপোষ [illegible] তিন রাত্রি উপবাস। এই সময় তাঁর মানসিক অবস্থা কিরূপ হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই সুযোগে চরণামৃতের নামে তাকে আমরা মাদক দ্রব্য সেবন করিয়ে দিই। এইরূপ অবস্থায় বৃদ্ধা মন্দিরের দুয়ারে শুয়ে পড়েন। তিনি এইভাবে শুয়ে পড়ে হত্যা দেবার পূর্ব্বাহ্নেই যদি তাঁকে বাক্-প্রয়োগ বা suggestion দ্বারা বলে দেওয়া যায়, যে তিনি এই এই দেখবেন বা শুনবেন তা হ'লে স্বপ্নে তিনি সেই সবই দেখেন বা শুনে থাকেন, সাধারণ নিয়মানুসারেই এইরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু পূজারীরা সকল সময়ই এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে বাহ্ জ্ঞান শূন্য হয়ে শুয়ে পড়লেও, এই অবস্থায় মানুষ বহির্জগতের সহিত একেবারে সম্পর্ক শূন্য হয় না। আমি একজন তথাকথিত জাগ্রত দেবতার পূজারী, তাই বিশেষ সত্যটি সম্বন্ধেও আমি অবগত ছিলাম। বৃদ্ধা হত্যা দিয়ে শুয়ে পড়ার পর আমি রাত্রিযোগে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে থাকি, 'অয়ি বৃদ্ধা, ভয় নেই। তোমার পুত্র নিরাময় হবে। পুকুর পাড়ের সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা শিকড় আছে, সেটি নিয়ে পিষে তাকে খাইও।' বৃদ্ধার এই সময় অল্পমাত্র জ্ঞান ছিল, চোখ বুজে কথা-গুলা শুনার পর সে ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে আমরাও যথাস্থানে বৃদ্ধার জন্যে শিকড়টি রেখে এলাম। কোনও কোনও সময় আমরা এই সকল ব্যক্তিদের হাতের মুঠার মধ্যে ঔষধাদি গুঁজেও দিয়ে থাকি। অকস্মাৎ ক্লান্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক বিকারের কারণে আমাদের এই কারসাজী তারা বুঝেও বুঝতে পারে না। অনেক সময় স্ববাক-প্রয়োগ দ্বারাও সুফল ফলে। স্ববাক-প্রয়োগের (auto-suggestionএর) কারণে তারা স্বপ্ন দেখে, অমুক জায়গায় গেলে সে একটা কিছু পাবেই। কথিত জায়গায় গিয়ে সে 'যা কিছুই' দেখে তার মনে হয় 'তাই'

যেন সে স্বপ্নে দেখেছে। দ্রব্যটি সম্বন্ধে অবসাদ ক্লান্ত দে৲তাকে এনে চিন্তা করা মাত্র মনে ধ্রুব বিশ্বাস হয়, সেই দ্রব্যটিই সে স্বপ্নে দে সেরে এই কারণে হত্যা দিতে আসা ভক্তদের আশে-পাশে আমরা নানাপ্র দ্রব্যাদি ছড়িয়ে রাখি। হত্যা দেবার পূর্ব্ব হতেই সে সব দ্রব্য দেখে, কিন্তু তা হলে কি হয়, মনোবিকারের কারণে উহা তারা সেই সময় দেখেও দেখে না। আসলে ঐ সব দ্রব্যাদির স্মৃতি তাদের অবচেতন মনে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের অবচেতন মন হ'তে সেই সকল দ্রব্যের স্মৃতি চেতন মনে উপনীত হয়, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। এই কারণে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখা দ্রব্য তার হাতের মুঠার কাছে পড়ে থাকতে দেখে তারা অবাক হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে উঠে, 'বাবা দেবাদিদেব, দয়া তা হলে তুমি করলে, বাবা।' 'হত্যা দেওয়ার' দ্বারা স্বপ্নাদ্য ঔষধাদি প্রাপ্তির মূল তথ্য আসলে এইরূপই হয়েথাকে।"

এইবার প্রশ্ন উঠতে পারে, আচ্ছা, তাই যদি সত্য হয় তা হলে এই স্বপ্নাদ্য ঔষধাদির দ্বারা সময় সময় মানুষের ব্যাধি আদি নিরাময় হয় কেন? এর উত্তর স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে, হ্যাঁ, রোগ সারে কিন্তু তা সারে কেবলমাত্র বিশ্বাসের কারণে বা মনের জোরে। বিশ্বাস মানুষের স্নায়ু সকল সতেজ করে তুলে। স্নায়ু সকল এইভাবে সবল হওয়ায় দেহাভ্যন্তরের প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠে—এই কারণে সময় সময় একমাত্র বিশ্বাসের কারণেই মানুষকে নিরাময় হতে দেখা যায়। এছাড়া অধিকক্ষেত্রে মানসিক রোগ সকল দৈহিক রোগ রূপে চালু হয়ে যায়। দৈহিক রোগ বিধায় আমরা দৈহিক রোগের চিকিৎসার দ্বারা কোনও ফলও পাই না। উদর এবং হৃৎপিণ্ডের রোগের মূলে প্রায়ই মানসিক রোগ থাকে। এই অবস্থায় এই সব মন্ত্র মন্ত্র আদি বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রোগীদের নিরা.

উপায় ... এইভাবে চিকিৎসা পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজনরাও করতে ... বিনা অর্থ ব্যয়ে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি তুলে দিলাম।

"আমার কোনও এক প্রতিবেশী বহু বৎসর ধরে শ্বাস (হাঁপানি) রোগে ভুগছিলেন, আমি বাক-প্রয়োগ দ্বারা তাঁর এই রোগের চিকিৎসা করতে মনস্থ করি। একদিন কথোপকথনের সময় আমি তাঁর কাছে একটি অলীক গল্পের অবতারণা করি, দেখুন, 'একজন বড় বৈজ্ঞানিক দুই বৎসর আগে ভারতবর্ষে এসে হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকে একটি মূল্যবান হীরক খণ্ড সংগ্রহ করেন, এই হীরক খণ্ডটি তাঁর গ্রাণ্ড হোটেলের কক্ষ থেকে চুরি যায়। আমি অতি কষ্টে তদন্ত দ্বারা এই মূল্যবান হীরক খণ্ডটি এক পুরানো চোরের নিকট হ'তে উদ্ধার করি। সাহেব তখন খুসী হয়ে আমাকে একটা লালরঙের ঔষধ দেন, ঔষধটি ছিল হাঁপানির ঔষধ, সাহেব বলেন, এই এক শিশি ঔষধের দাম দশ হাজার টাকা, কারণ এর একটি ফোঁটা এক একজন হাঁপানি রোগীকে চিরকালের মত নিরাময় করতে সক্ষম। এই ঔষধটি আমি দুইটি রোগীর উপর পরীক্ষা করেছিলাম, এই দুইটি রোগীই আশ্চর্য্যজনক ভাবে সেরে উঠেছে। ঔষধটি আমি আমার দেশের বাড়ীতে রেখে এসেছি, তাতে মাত্র আর একজনকে সারাবার মত ঔষধ আছে, আপনার জন্যে ঔষধটা আমি আনিয়ে রাখব।' বলাবাহুল্য, কাহিনীটি সর্ব্বৈব মিথ্যা ছিল; কিন্তু ভদ্রলোক আমার কথা রীতিমত বিশ্বাস ক'রে আমাকে ঔষধটি আনিয়ে নেবার জন্যে বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। আমি আজ নয় কাল হবে, কাল নয় পরশু হবে—এইরূপ স্তোকবাক্য দ্বারা তাঁকে অত্যন্তরূপ উতলা করে তুলি, শেষ বরাবর ভদ্রলোক রেগে আমার এই ইচ্ছাকৃত ভুল বা দীর্ঘসূত্রতার জন্যে আমাকে অনুযোগ

কারণে কথিত

করতে থাকেন, শেষে একদিন সত্য সত্যই ঔষধটি আমি তাকে এনে দিই। ঔষধটি কয়েকদিন সেবন করার পর তিনি সত্য সত্যই সেরে উঠলেন। আসলে কিন্তু একটু মধু কিনে তাতে লাল রং করে, রং করা মধুটুকু একটা দামী বিলাতী শিশিতে ভরে সেটা তাঁকে আমি এনে দিয়েছিলাম।”

মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র বিশ্বাস সকল সময় কার্য্যকরী হয় না। বিশ্বাসের সহিত প্রকৃত ঔষধেরও প্রয়োজন আছে। এ ছাড়া শিশুদের এবং জড় (Idiot) ও নির্ব্বোধদের উপর এইরূপ বাক্-প্রয়োগ একেবারেই কার্য্যকরী হয় না। এই স্থলে প্রবঞ্চকগণ ধর্ম্মের নামে, এদের শুধু প্রবঞ্চনা করে না, হত্যাও করে। বহুদিন পূর্ব্বে আমি কোনও এক গ্রামে “বুড়ো শিবতলায়” বেড়াতে গিয়েছিলাম, বহু লোক সেখানে এসে শিবঠাকুরের মাথায় ডাবের জল ঢালতেন। সেই জল একটা নালা ব’য়ে অদূরের একটি গর্ত্তের মধ্যে জমা হ’ত। দূর-দূরান্তর থেকে মেয়েরা রুগ্ন শিশু পুত্রদের সেখানে এনে সেই গর্ত্ত থেকে বিল্বপত্র পচা জল তুলে তাদের পান করাতেন। এর বিষময় ফল সম্বন্ধে চিন্তা করে আমি শিউরে উঠি এবং এক স্থানীয় ডাক্তারকে এই সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত জানাই। উত্তরে ডাক্তারবাবু বলেন, এর অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে বললে কোনও ফল হবে না, বরং নালাটা সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে গর্ত্তের জল প্রতিদিন বদলানোর ব্যবস্থা করাই আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে। এ ছাড়া আমি এও লক্ষ্য করি, অকুস্থলে আনীত শিশুগুলির গলদেশে নানা প্রকারের বহু মাদুলী ঝুলানো রয়েছে, এই তাম্র মাদুলীগুলি তারা মুখে পুরে সেগুলা জিভ দিয়ে চুষছিল। এর পর আমি ভাল রূপেই বুঝতে পারি, পল্লী অঞ্চলে শিশু মৃত্যুর হার এত বেশী কেন?”

পল্লীবাসীদের অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাসই এই সব অঘটনের একমাত্র কারণ। এই সব ধর্ম্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কত সহজে তাদের ঠকানো বা জব্দ করা যায়, তা নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বুঝা যাবে।

"আমরা বাল্যকালে গ্রামের কাউকে জব্দ করতে ইচ্ছা করলে, এ জন্যে আমরা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করতাম। কালী, কার্ত্তিক বা সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব দিনে আমরা একটি কালী মাতার বা কার্ত্তিকের বা সরস্বতী ঠাকুরের মূর্ত্তি কিনে এনে আমাদের শত্রুদের বাড়ীর উঠানে রাত্রি যোগে রেখে আসতাম। এই সব লোকেরা আমাদের এজন্য সন্দেহ করে গাল দিত, কিন্তু কর্জ্জ করেও এই সকল প্রতিমার তারা পূজার ব্যবস্থা করতেও বাধ্য হ'ত।

এ ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতি দ্বারাও আমরা প্রতিবেশীদের ঠকিয়েছি। আমাদের মধ্যে একজন দাড়ি ও পরচুল পরে কসাই সাজত, সঙ্গে থাকত তার একটা বক্না গাভী। এদিকে আমরা মিথ্যে করে রটিয়ে দিতাম যে কসাই লোকটা গাভীটি নিয়ে যাচ্ছে জবাই করবার জন্য; এবং এই বলে আমরা পল্লীবাসীদের নিকট হতে পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই ষাট "সত্তর টাকা (চাঁদা স্বরূপ) আদায় করেছি, গাভীটিকে কসাইএর কবল হতে মুক্ত করবার জন্যে। আমাদের পাঠাগারের জন্যে পুস্তক ক্রয়ের প্রয়োজনেই এই ভাবে প্রয়োজনীয় অর্থাদি আমরা সংগ্রহ করতাম, কারণ আমরা জানতাম যে, ধর্ম্মের নামে অকাতরে অর্থ দিলেও জনহিতকর কার্য্যের জন্যে কখনও একটি পয়সাও এরা দান করবেন না। এ ছাড়া সাধুসন্ন্যাসীদের অনুকরণে, পরচুলা পরে সাধু সেজে আমরা কাউকে সন্তান হবার জন্যে, কাউকে বা রোগ হতে নিরাময় করবার জন্যে মাদুলী বিতরণ করেও প্রচুর অর্থ উপায় করতাম। বিদ্যাটা বাল্যকাল হতেই অভ্যাস করেছি, তাই এই

বিদ্যার দ্বারাই আমি সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। দেখুন, স্যার, অমুক ধনী ব্যবসায়ীকে আমি গুণে বলে দিয়েছি যে সে তার অপহৃত দ্রব্য ফিরে পাবে। দেখুন না মশাই, যদি দয়া করে তদন্ত করে আপনার চোরের সন্ধান করে দ্রব্যগুলি উদ্ধার করতে পারেন, রোজগার-পত্র একেবারে কমে গেছে, কি করব বলুন, মশাই; ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে চুরিটা তো আর করতে পারি না। এ্যাঁ, কি বলছেন, মা কালীর সঙ্গে কথা কই কি'না? তা ওকথা সকলকে বলতে হয় তাই বলি, সবই বুঝতে পারছেন। তান্ত্রিক সাধু সেজে কয়েকটি মড়ার খুলি যোগাড় করে আসন না বানালে লোকে ভয় পাবে কেন? অনেকে যে ভয় পেয়েই বেশী প্রণামী দেয়। তারা ভাবে প্রণামী কম দিলে মা কালীর ভূত পেত্নীরা হয়ত তাদের অনেক ক্ষতি করে দেবে, ইত্যাদি।'

এর আগে কিছুদিন আমি নবদ্বীপে এসে বৈষ্ণব সাধুও সেজেছিলাম। কি উপায়ে ব্যবসাটা আমি প্রথম সেখানে সুরু করি সেই সম্বন্ধে বলছি, শুনুন। নবদ্বীপের কোনও এক মন্দিরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদিন আমি কেঁদে উঠি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমি বলতে থাকি, 'এ কি-ই মূর্ত্তি-ই। এ কি-ই আমি দেখছি-ই ইত্যাদি।' সেই সময় সেখানে অনেকগুলি ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। আমার কপালের শ্বেত চন্দনের ফোঁটা ও লোহিত বস্ত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে একজন প্রৌঢ়া মহিলা বলে উঠলেন, 'কে বাবা তুমি? এ্যাঁ? এ যে রাজপুত্তুর।' বলা বাহুল্য আমার চেহারাটি ছিল ঠিক ননীর পুতুলের মত, এ ছাড়া কণ্ঠ সঙ্গীতে আমি ইতিমধ্যেই নাম করেছিলাম; এর পর আমি সুললিত স্বরে নাম গান করতে করতে গৃহাভিমুখে চলতে থাকি এবং আমার পিছন পিছন চলতে থাকেন অসংখ্য নরনারী। ব্যবসাটি আমার বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় এক নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িত

হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায় আমি হঠাৎ একদিন নবদ্বীপ ত্যাগ করে কলিকাতায় এসে পঞ্চমুণ্ড আসনধারী মহাযোগী পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু হয়েছি। এই পদ্ধতিতে সুবিধা অনেক, এমন কি মদ্যপানেরও।

এইবার কি উপায়ে আমরা হাত দেখি বা প্রশ্ন গণনা করি, সেই সম্বন্ধে বলি, শুনুন। আমাদের কাছে দুই প্রকারের লোক আসে, বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী। এদের আমরা সাবধানে চিনে নিই, অবিশ্বাসী লোকদের আমরা আদপেই আমল দিই না, কিন্তু বিশ্বাসী লোকদের আমরা আদর করে কাছে ডাকি। এমনি নানা কথাবার্তা এবং যত্ন আয়ত্তির মধ্যে সে নিজের অসতর্কতায় নিজেদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে ফেলে, পরে কিন্তু তাদের এই সব কথা প্রায়ই স্মরণ থাকে না। উত্তেজিত মন ও বিভুলতার কারণেই ইহা ঘটে থাকে। এর পর অন্য কথাবার্তার দ্বারা তাকে একটু অন্যমনস্ক করে দিয়ে অনেকক্ষণ পর তার কাছ থেকে কথায় কথায় বার করে নেওয়া কাহিনীগুলিই হাতের রেখা গণনার ছলে তাকেই আমরা শুনিয়ে দিই। একটা দারুণ উদ্বেগ এবং উত্তেজনা তাদের মনের মধ্যে সব সময়ে বিরাজ করার জন্যই আমাদের এই চালাকি তারা ধরতে পারে না। সাধারণতঃ শোকতাপ বিপদগ্রস্ত বা অভাবী অন্নক্লিষ্ট ও লোভী লোকেরাই আমাদের কাছে এসে থাকে। এই কারণে তাদের মনকে নানা উপায়ে চঞ্চল করে পূর্ব্বাহ্নেই তাদের কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নেওয়া সম্ভব হয়। কয়েকটি মাত্র কাহিনী বা কাহিনীর কিছু কিছু জেনে নিলে, বাকিটুকু কাহিনী বা তাদের পরবর্ত্তী কাহিনীগুলি অনুমান করে নেওয়া খুবই সহজ। কারণ জীবনের একটি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ আর একটি ঘটনা ঘটে থাকে। একটি ঘটনার সহিত অপর একটি ঘটনার প্রায়ই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে। ধরুন, প্রতি মাসে আমাদের কাছে গড়ে

একশ' জন ভক্ত আসে। এদের মধ্যে যদি আমরা পনের জনকেই খুসী করতে পারি, তাতেই কি আমাদের সুনামের পক্ষে যথেষ্ট নয়! এই পনের জন আমাদের আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসেই হাজার হাজার লোকের কাছে আমাদের কি সুনামই না গেয়ে বেড়ায়? কোনও লোক আমাদের কাছে এলে প্রথমে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বেশভূষার ও চালচলন পরিলক্ষ্য করি। এই বেশভূষা ও চালচলন থেকে আমরা বুঝে নিই, সমাজে তার স্থান কোথায়। সে একজন ব্যবসায়ী, চাকুরে বা জমিদার, তা থেকে সহজেই বুঝা যায়। তার বয়স ও শরীরের গঠন দেখে আমরা সে বিবাহিত বা অবিবাহিত, কিংবা সে কি প্রকৃতির লোক তাও বলে দিতে পারি। পরিবার ভারাক্রান্ত লোকের চেহারাই হয় আলাদা। এ ছাড়া মানুষের ক্রোধ, বিতৃষ্ণা, দুঃখ ও অভাবাদির পৃথক পৃথক রূপ আছে। মানুষের মুখে চোখে এই সব রূপ তীব্রভাবে ফুটে উঠে—বিশেষ করে প্রশ্ন করার সময়। প্রশ্নের মধ্যেও মানুষ তার নিজের অসতর্কতায় একটা সূত্র ধরিয়ে দেয়। এই সব সূত্রের সাহায্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অনেকের অনেক পূর্ব্বকাহিনী বলে দিতে সক্ষম। গোলমাল বুঝলে আমি ভক্তদের জানিয়ে দিতাম, 'আচ্ছা কাল মাকে (মা কালীকে) জিজ্ঞাসা করে আপনাকে জানাব।' অনেক সময় আমরা মিথ্যা করে ভক্তদের ভয় দেখিয়েছি, 'দেখুন, শীঘ্রই আপনার একটা বিপদ আসছে—এমন কি জীবনহানিরও সম্ভাবনা আছে।' এইরূপ বাক-প্রয়োগের কুফল স্বরূপ—এই সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা মানুষ রোগগ্রস্তও হয়ে পড়ে। এই সুযোগে আমরা যাগ-যজ্ঞ বা মাদুলী বিতরণ করে বেশ কিছু অর্থও ভক্তদের কাছ হ'তে পেয়ে থাকি। কারুর উপর ক্রুদ্ধ হলে তার নামে উল্টা তুলসী দেব এইরূপ ভয় দেখিয়ে তাদের আমরা জব্দও করে থাকি। ভক্তদের মনে বিশ্বাস আনবার জন্যে আমরা

নানারূপ উপায় অবলম্বন করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি পন্থার কথা বলি, শুনুন।

'গতকল্য একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার কাছে তার ফলাফল জানতে এসেছিল। আমি একটা পৃথক কাগজে 'জবা ফুল' এই কথাটি লিখে কাগজটি তারই মুঠার মধ্যে গুঁজে দিই। এর পর তাকে আমি একটা ফুলের নাম করতে বলি, বিশেষ ক'রে যে ফুলটা কি'না সে বেশী পছন্দ করে। লোকটা উত্তর দেয়, 'জবা'। আমি তখন কাগজটা তাকে খুলে দেখতে বলি। সে কাগজের মোড়ক খুলে দেখে, তাতে 'জবা'ই লেখা রয়েছে। এদিকে তার অলক্ষ্যে আরও দুই চার টুক্‌রা কাগজে যথাক্রমে মল্লিকা, গোলাপ ইত্যাদির ফুলের নাম আমি লিখে রেখেছিলাম। যদি সেই লোকটির উত্তর হ'ত 'গোপাল', তা হলে তার হাতের মোড়কটা ক্ষণিকের জন্যে স্পর্শ করে হাত সাফাইএর দ্বারা গোলাপের মোড়কটা তার হাতে গুঁজে দিতাম, 'জবা' লেখা মোড়কটা অলক্ষ্যে সরিয়ে নিয়ে। সাধারণতঃ মধ্য-বয়স্ক ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরা জবা ফুল এবং যুবকেরা গোলাপ ফুলই প্রথম মনে করে, অভিজ্ঞতা হ'তে আমরা এইরূপ জেনেছি। এইভাবে লোকের মনের মধ্যে প্রথম হতেই বিশ্বাস উৎপাদন করে ধর্ম্মের নামে তাদের আমরা ঠকিয়ে থাকি।'

এই সব ব্যক্তিগত অপরাধ ছাড়া ধর্ম্মের নামে দলগত অপরাধও দেখা যায়। এদেশে এমন অনেক মঠ ও আশ্রম আছে যে সকল আশ্রমে বা মঠে কার্য্যক্ষম সুস্থ দেহ যুবকদের আটকে রেখে, দেশের পুং শক্তি (Man power)কে খর্ব্ব করা হয়। এই সকল শক্তিমান যুবক সকল সেইখানে অলসভাবে পরগাছার ন্যায় জীবনযাপন করে। এই সকল মঠ ও আশ্রমে দুই শ্রেণীর যুবক দেখা যায়, যথা—(১) ব্রহ্মচারী এবং (২) অধিকারী। যে সকল যুবক অবিবাহিত তাহাদের বলা

হয় ব্রহ্মচারী, এদের বিবাহ করতে দেওয়া হয় না, এবং যে সকল যুবক বিবাহিত, কিন্তু আপন স্ত্রীকে চির জন্মের মত ত্যাগ করে এসেছে তাদের বলা হয় অধিকারী। যে দেশের মেয়েদের পক্ষে পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ সেই দেশে এই 'অধিকারী' প্রথা কিরূপ ক্ষতিকর তা সহজেই অনুমেয়। আমার মতে এই অধিকারী প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ করা উচিত। এইরূপ আইন প্রণয়ন দ্বারা আইনকারগণ অনেক সতী-লক্ষ্মীর শুভেচ্ছাই লাভ করবেন। পূর্ব্বকালে মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসী প্রথাও প্রবর্ত্তিত ছিল, সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানকালে এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছে। বাক্-প্রয়োগ দ্বারা দেশের যুব শক্তিকে, ধর্ম্মের নামে ঘরছাড়া করে, যারা তাদের ভিক্ষালব্ধ অর্থে অলস জীবন যাপন করেন তাদের অপরাধী ছাড়া কি'ই বা আর বলা যেতে পারে। সহস্র সহস্র যুবককে মঠে ও মন্দিরে এইভাবে আটকে রেখে অকেজো করে দিলে কি জাতিকে দুর্ব্বল করা হয় না? এ সম্বন্ধে দেশবাসীর অবহিত হ'য়ে চিন্তা করা উচিত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজশক্তির ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন আছে কি'না?

পর-প্রবঞ্চনা অপেক্ষা আত্ম-প্রবঞ্চনা অধিকতর ক্ষতিকর। আত্ম-প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে 'সাধারণ-প্রবঞ্চনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। আমরা ধর্ম্মের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনাই ক'রে থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও এক সাধক মহাপুরুষের প্রাসাদতুল্য ভবনে তাঁকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে আমি গমন করি। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আমি মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাইসাহেবকে তাঁর জনৈক শিষ্যের বয়স্থা কন্যাদের নিয়ে হৈ হল্লা করতে দেখি। বিষয়টি পরিলক্ষ্য করে আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়, সাধুপুরুষকে দর্শন না ক'রেই

আমি প্রত্যাগমন করি। ঘটনাটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাধুপুরুষের কোনও এক শিষ্য আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আরে, ঐ দেখেই আপনি চলে এলেন। ঐ তো সেই কাল-ভৈরব, ওখানে বসে রয়েছে, আপনাকে বাধা দেবার জন্যে। এই সব মিথ্যা মায়া আপনার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দেবে, যাতে ক'রে আপনি আর এগুতে না পারেন। কিন্তু এই সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রেই তো আপনাকে সাধুসন্দর্শনে যেতে হবে। সাধুসন্দর্শন কি আর সকলের ভাগ্যে হয় মশাই? সকলের ভাগ্যে তা হয় না, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকা চাই।"

জানি না এর চেয়েও আত্ম-প্রবঞ্চনার ভাল দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে আর আছে কি'না? ধর্ম্ম-প্রবণতা অনেক সময় মানুষকে মিথ্যা রোগাক্রান্তও (palthlogical lies) করে তুলে। এই অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ, সজ্ঞানে তার আরাধ্য গুরু বা দেবতাদির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বহু মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে বেড়ায়। সব সময় সে ইচ্ছা করে মিথ্যা বলে তা নয়। মিথ্যা বলতে তাদের ইচ্ছা হয়। ইহা একরকম মানসিক রোগ। কথনও কথনও এরা পুনঃ পুনঃ চিন্তার দ্বারা মনের এইরূপ একটি অবস্থায় উপনীত হয় যখন কিনা তারা পূর্ব্বেকার প্রকৃত তথ্য (সময়ের ব্যবধানে) ভুলে গিয়ে বিশ্বাস করে যে কতকগুলি ঘটনা বোধ হয় তাদের চক্ষের সামনেই ঘটেছে—যদিও কি'না সেই সকল ঘটনা কথনও ঘটে নি বা ঘটতে পারে না। ইহাও একরকম মানসিক রোগ। অনেকে আবার এই ধরণের মিথ্যা বলে আত্মতৃপ্তিও লাভ করেন, এবং এইরূপ মিথ্যা না বলে তাঁরা শান্তিও পান না। এ ছাড়া মানুষের স্বাধীন চিন্তার অভাব ঘটলে যে তার সাধারণ বুদ্ধিরও বিলোপ ঘটে, তা নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে

ভালরূপেই বুঝা যায়। বলা বাহুল্য, ইহাও একপ্রকার সাময়িক মনোবিকার। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"বন্ধু বীরুবাবুর মুখে অমুক পল্লীতে এক পাহাড়ী বাবার আবির্ভাবের কথা শুনে তাঁকে দর্শন করতে এলাম। একটা গোটা দ্বিতল বাটী ভাড়া ক'রে শিষ্যাদিসহ তিনি সেথায় জাঁকিয়ে বসেছেন। সঙ্গে আছে একটা ছোট গুল বাঘ (জ্যান্ত), এবং গোটাকতক গোখুরা সাপ, একজন মেমসাহেব টাইপিষ্টও সঙ্গে আছেন। রীতিমত এত্তালা পাঠিয়ে তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায়। এও শুনলাম তাঁর কামরায় দুই তিনটা রেডিও ফিট্ করা হয়েছে, এই রেডিও একটির মারফৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এবং অপরটির মারফৎ শয়তানের সঙ্গে না'কি তাঁর কথাবার্ত্তা চলে, ইত্যাদি। বহু ব্যারিষ্টার, উকিল, জমিদার- প্রভৃতি জ্ঞানী ভদ্রলোকরাও সেখানে আনাগোনা সুরু করেছেন।

গোপনে শুনতে পেলাম, ইতিমধ্যে পাহাড়ী যোগী অর্থের বিনিময়ে শয়তানি বুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তদের বেছে নিয়ে তাদের একপ্রকার অদ্ভুত মন্ত্রও বিতরণ সুরু করেছেন। এই মন্ত্রের দুইটি গুণ, নেগেটিভ্ ও পজেটিভ্, নর্থ পোল, সাউথ পোলের সঙ্গেও এর তুলনা করা চলে। এ মন্ত্র নিজের স্ত্রীর কানে কানে বললে না'কি সে পরের হয়ে যাবে, এবং পরের স্ত্রীর (পরস্ত্রীর) কানে কানে বললে, তাকে আর কেউই ধরে রাখতে পারবে না, সে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রের অধিকারীর অঙ্কশায়িনী হবে। আমি এরপর ছদ্মবেশে সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আচ্ছা, নিজের স্ত্রীর কানে কানে মন্ত্রটি বললে তো সে তৎক্ষণাৎ অপরের হয়ে যাবে, ও অবস্থায় তাঁকে কি আর ফিরানোর কোনও উপায়ই থাকবে না?' পাহাড়ী যোগী একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হাঁ, পারা যাবে কিন্তু অনেক পরে অর্থাৎ কি'না পরস্ত্রী

হবার পর তবে তাকে ফিরানো যাবে।' এই সময় পরস্ত্রী বিধায় তার কানে কানে মন্ত্রটি পুনরায় উচ্চারণ করলে সে আপনার (পূর্ব্ব স্বামীর) কাছে ফিরে আসবে। ব্যর্থ প্রেমিকদেরই সাধুবাবা অত্যন্ত রূপ আয়ত্তে এনে ফেলেছিলেন। এঁদের তিনি কন্যা বিশেষকে বশ করবার জন্যে বহুশত টাকার মাদুলী ও ঔষধাদিও বিতরণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে সাধুবাবার এক স্যাকরেদ (স্থায়ী বা permanent শিষ্য) সাধুর এক নবাগত ভক্তের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হলেন এবং ভক্তটি নিরুপায় হয়ে পুলিশে নালিশ জানালেন। প্রায় দুই মাস পরে ভক্ত মহিলাটি কলিকাতায় ফিরে এসে জানালেন যে, তিনি ইচ্ছা করে গৃহত্যাগ করেন নি, তাঁকে মন্ত্রশক্তি দ্বারা গৃহত্যাগ করান হয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, আত্মরক্ষার কারণেই তিনি এইরূপ মিথ্যার অবতারণা করেছিলেন। এর পর একদিন প্রতারণার অভিযোগে তাঁকে ট্যাক্সি ক'রে কর্তৃপক্ষের কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়, ট্যাক্সি ভাড়াটা অবশ্য সাধুবাবাই দিয়েছিলেন। জামীনে মুক্ত হয়ে বাড়ী ফিরে সাধুবাবা ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে, ডেপুটি সাহেবের স্ত্রীর দুরারোগ্য অসুখের চিকিৎসার জন্যেই না'কি তিনি ইনেস্‌পেকটারকে পাঠিয়ে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। এর কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন সাধুবাবা শিষ্য সমভিব্যাহারে স্থান ত্যাগ করেন, কারণ তিনি জানতেন যে, এক জায়গায় বেশী দিন প্রতারণার ব্যবসা চালান সম্ভব নয়, উচিতও নয়। ইহার পূর্ব্বে কিন্তু মন্ত্রটি আমি সাধুবাবার নিকট হতে জেনে নিয়েছিলাম, পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে উহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করলাম, বিশেষ সময় ও ক্ষণে নাকি উহা উচ্চারণ করা উচিত, 'হুঁ ক্রীং হুঁ ক্রীং হ্বং ক্রীঙ হুম্ হাম্ হুম্ হ্রীঙ, হুম্ হাম্ হুম্ হিম্, ইত্যাদি।" এর চেয়ে আজগুবী ও লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে?

এইসকল সাধকগণ লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। তাঁরা কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা আগন্তুকগণ তাঁর কাছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তা প্রথমে অবগত হয়ে তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

'অমুক আশ্রমে এসে দেখি সেখানে উৎসব সুরু হয়েছে। রূপার সিংহাসনে মূল্যবান সিল্কের পরিচ্ছেদে ভূষিত হয়ে গুরুদেব বসে আছেন। তাঁর দুই বুক পকেটে দুইটি স্বর্ণ ঘড়ি ঝুলায়মান। তাঁর দুই হাতেও দুইটি হীরক ও মুক্তা খচিত স্বর্ণ ঘড়ি। এ ছাড়া তাঁর ভেলভেট আবৃত দুইটি জুতার উপরও দুইটি ছোট ঘড়ি আঁটা রয়েছে। ডান হাতে তাঁর একটি হস্তী দন্তের ছড়ি ও বাম হাতে তাঁর চন্দন কাষ্ঠের মালা। এই সময় এক ভক্ত এসে তাকে একটি রৌপ্য ঘড়ি উপহার দিলেন। রূপার ঘড়িটি নিয়ে শিশুসুলভ সরলতা সহ উৎফুল্ল হয়ে গুরুদেব বললেন, 'আরে বেটা এত ঘড়ি হামি কি করবে? আচ্ছা, হামারটা, তুই লিবি আর তোরটা হামি লিব।' এই কথা বলে গুরুদেব তাঁর ডান হাতের মুক্তা ও হীরক খচিত স্বর্ণ ঘড়িটি খুলে ভক্তকে তা পরিয়ে দিতে চাইলেন। ভক্ত কিন্তু এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হলেন না, বহু বাদানুবাদের পর ভক্তেরই জয় হ'ল এবং গুরুদেব রূপার ঘড়িটাও বিনাসর্ত্তে গ্রহণ করতে রাজী হলেন। গুরুদেবের নির্লোভ নিস্পৃহতা পরিদর্শন করে সমাগত ভক্তবৃন্দের মস্তক ভক্তিতে নুইয়ে পড়ল। বিষয়টি ধীর ভাবে পরিলক্ষ্য করে আমি একটি মতলব মনে মনে এঁটে নিলাম। আমি সম্প্রতি উড়িষ্যা প্রদেশ হতে একটি মোষের সিঙ দিয়ে তৈরী ছড়ি কিনে এনেছিলাম। বলাবাহুল্য ছড়িটি আমার খুব সখেরই ছিল। পরদিন ঐ ছড়ি সমেত ঐ আশ্রমে এসে গুরুদেবের পদতলে ঐ ছড়িটি রেখে ভক্তি গদ গদ স্বরে তাঁকে

উহা গ্রহণ করতে অনুরোধ করলাম। আমি নিশ্চিন্তরূপে ধারণা করেছিলাম যে, এর পর গুরুদেব আমার ছড়িটি গ্রহণ করে পরিবর্তে তাঁর হাতীর দাঁতের ছড়িটি আমাকে দান করিবেন। কিন্তু আমাকে হতবাক করে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, আরে আমি দুইটি ছড়ি কি করবে? আচ্ছা এক কাজ করবে, এই হাতে একটি লিবে আর এই হাতে একটা লিবে,কেমন? এই ভাবে আমি যে আমার ছড়িটা হারাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। ,সভ্যকার ভক্তরা অবশ্য আমার এই সৌভাগ্যে বরং ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল।

এই সকল সাধুগণ প্রায়ই গরীব শিষ্যদের নিকট দুই তিনটি মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করে উহা লাখপতি শিষ্যদের দান করেন। ইহা কিন্তু এক প্রকার চার ফেলা ; কারণ তাঁরা জানেন ঐ বড় লোকেরা এরপর অধিকতর মূল্যবান দ্রব্য তাদের দান করবে। এই জন্য তারা সব সময় বড় লোকদের দান করে নির্লোভী দাতা সাজেন। স্বার্থ না থাকলে গরীবদের এঁরা কম ক্ষেত্রেই দান করেছেন। আবার এমন গুরুপ্রবরও আছেন যাঁকে অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যারা গুরুরূপে পূজা করলেও তাদের মধ্যে একজন নারী তাঁকে পতিরূপে সেবা করে থাকেন। এই শ্রেষ্ঠা ভক্ত নারীদের মধ্যে বিধবা, সধবা ও কুমারীও দেখা গিয়াছে। স্ত্রী-রূপে পূজা এরা গুরু-পূজা করেন বলে এঁরা সর্ব্বদা গুরুর পার্শ্বের আসন প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। এঁছাড়া এমন বহু বামাচারী সাধু আছেন যাদের একাধিক পত্নী গ্রহণ বা রামা রক্ষণেও আপত্তি নাই। এতদ্ব্যতীত গৃহী-গুরুর ভণ্ডামীও পুরুষানুক্রমে এদেশের লোকেদের সহ্য করতে হয়েছে। এই সকল গুরু পরিবারে ভাই-ভাইয়ে ভিন্ন হওয়ার পর জমি-জমার ন্যায় শিষ্যদেরও তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে নিয়ে থাকেন। অপর দিকে এমন বহু মঠ ও মন্দিরের অধিকারী আছেন যারা হাতী

ঘোড়া প্রাসাদ জমিদারী ও বহু ধন-রত্নের মালিক। এদের ভোগ-বিলাসের সীমা নাই। তবে এদের অনেকের বিষয়-সম্পত্তি পুত্রগণ ভোগ না করে তা তাঁর গদির উত্তরাধিকারী রূপে তাঁর একজন প্রধান চেলা ভোগ করে থাকে।

এছাড়া এই সকল ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ আধ-পাগলা সাধকের বেশে দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি পিঠস্থানে ইতস্ততঃ ঘুরাফিরা করে থাকেন। হঠাৎ কোনও অনুরূপ ভক্ত ব্যক্তিকে ওখানে আসতে দেখলে তাকে তাঁরা জড়িয়ে ধরে বলে উঠেন, 'ওরে তুই এসেছিস। আজ বিশ বৎসর ধরে তোকে যে আমি খুঁজছি।'

বাক্-প্রয়োগ লোভী সবল প্রকৃতির ব্যক্তিদের কতদূর পর্য্যন্ত নির্ব্বোধ ক'রে তুলতে পারে তা উপরের কাহিনীসমূহ হতে বুঝা যাবে। অধুনা যুগে ধর্ম্মকে একটি বিরাট অসংস্কৃত পুরানো দীর্ঘিকার সহিত তুলনা করা চলে। নূতন অবস্থায় যে দীর্ঘিকা গ্রামবাসীদের প্রাণস্বরূপ ছিল, সেই দীর্ঘিকাই শত বৎসর পরে, সংস্কারের অভাবে মজে গিয়ে সেই গ্রামবাসীদের ধ্বংসের কারণ হয়। মনে হয় দীর্ঘিকাটি না থাকলে হয়তো গ্রামে আধিব্যাধির প্রকোপ এতটা বেশী হ'ত না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে, এই কারণে যুগে যুগে পৃথিবীতে এক একজন মহাপুরুষ এসেছেন পুরাণো ধর্ম্মকে সংস্কার দ্বারা যুগোপযোগী করে, মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ, অবতারের যুগ নয়। বর্ত্তমান যুগ, বৈজ্ঞানিক যুগ, এই যুগে অবতারের আবির্ভাবের কোনও সম্ভাবনা নেই। আজিকার এই গণ-তান্ত্রিক যুগে, অবতারের স্থান নেই, বর্ত্তমান যুগে কোনও কাজ একার দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। পূর্ব্বেও তা কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। আধুনিক ধর্ম্মমতগুলির যদি কেহ সত্যকার রূপ দিয়ে থাকেন তো ত

দিয়েছেন এই সব অবতারের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ; তাঁদেরই সমবেত চেষ্টায় অধুনা দৃষ্ট ধর্ম্মমতগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আমার মতে ঋকবেদীয় ঋষিদের ন্যায় ভারতের মনীষিগণেরও উচিত যথা সত্বর একত্রে সমবেত হয়ে স্থানীয় ধর্ম্ম-মতগুলির সংস্কার সাধন করা, যুগপোযোগী করে *।

ভগবান বুদ্ধদেব পরিলক্ষ্য করেছিলেন, "মানুষ কেবলমাত্র ঈশ্বর আছেন কি'না এবং কি উপায়ে তাঁর দেখা পাওয়া যায়"—এই অলীক চিন্তাতে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় কোনও কাজ সে করে না, এই কারণে তথাগত নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, "অযথা ঈশ্বর ঈশ্বর করে সময় নষ্ট করো না, পৃথিবীতে যখন এসেছ তখন তোমার একমাত্র ধর্ম্ম হওয়া উচিত জীবের কল্যাণকর কার্য্য করা।" ভগবান বুদ্ধদেব এই কারণে তাঁর ধর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেন নি, ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভক্তগণ ভুল বুঝে তাঁকেই (বুদ্ধদেবকে) কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই ঈশ্বর বানিয়ে দিয়েছেন। জগতের অপর আর এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরু মূর্ত্তি পূজার অসারতা উপলব্ধি করে তাঁর কোনও মূর্ত্তি না গড়বার জন্যে ভক্তদের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, পাছে কেহ দেব-দেবীর পরিবর্ত্তে তাঁরই মূর্ত্তি পূজা করতে সুরু করে। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যায় তাঁর কোনও ভক্ত পীর প্রভৃতির মূর্ত্তি পূজা না করলেও তাঁদের কবরে পূজা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, সর্ব্বজাতির মধ্যে সমন্বয় আনবার জন্যে, কিন্তু বৈষ্ণবগণ পরবর্ত্তী যুগে তাঁর উদার প্রেমধর্ম্মকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। শিক্ষা ও সংস্কারের অভাবে ধর্ম্ম বিকৃত হয় ; বিকৃত ধর্ম্মমতগুলি মানুষের উপকার

বুদ্ধ ধর্ম্ম কাউন্সিলের অনুকরণে।

না ক'রে অপকারই করে থাকে। কোনও কোনও মন্দিরে স্নানযাত্রার পর বিগ্রহের গাত্র-বর্ণ বারি স্পর্শে বিবর্ণ হয়ে যায়, এই সময় পূজারিগণ রটিয়ে দেন দেবতার ব্যাধি হয়েছে। বিগ্রহকে পুনরায় রঞ্জিত করার জন্য কালক্ষয় করার কারণেই পূজারীরা এইরূপ রটিয়ে থাকেন। কিন্তু দেবতার নামে এইরূপ মিথ্যা ভাষণের কি কোনও প্রয়োজন আছে? সকলে জানেন হিন্দুরা মূর্ত্তি পূজা করে না, মূর্ত্তিটিকে, সাময়িকভাবে তার ঈশ্বরের আসন বা প্রতীক মনে করে মাত্র। "প্রাণম্ বিমুচ্যতে", মন্ত্রটি উচ্চারণের পর উহার সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ আর থাকে না, উহাকে তখন কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ডই মনে করা হয়, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর উহাকে পুনরায় আমরা দেবতার আসন বা প্রতীক মনে করি। ইহাই যদি হিন্দুদের প্রকৃত ধর্ম্মমত হয় তাহলে পূজারীদের এইরূপ মিথ্যা প্রচার কি প্রতারণা নয়? বিকৃত ধর্ম্মমত সমাজেরও প্রভূত ক্ষতি করে থাকে। বিষয়টি নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"গত বৎসর বসন্তকালে আমি অমুক গ্রামে কিছুদিনের জন্যে স্থান পরিবর্ত্তন করি। একদিন সান্ধ্যভ্রমণের সময় নদীর ঘাটে একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমি অবলোকন করি। ঘাটের চত্তরের উপর একটি ছোট চৌকির উপর বসে জনৈক কথক ঠাকুর 'কথা' বলছিলেন,—আলোচ্য বিষয়টি ছিল শ্রীকৃষ্ণের উদরের মধ্যে অর্জ্জুনের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দর্শন। কথক ঠাকুর সুর ক'রে ক'রে বলে যাচ্ছিলেন, 'অ-আঁ-আ, সেই শিশুর পেটের ভি-তর। দেখ-লা-ম, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, কীট-পতঙ্গ, তক্তপোষ, তাকিয়া, খাটি-য়া-য়া, ইত্যাদি।' অবাক হয়ে পরিলক্ষ্য করলাম ঠাকুর মশাই-এর এই সব 'কথা' শুনে মহিলা শ্রোতাদের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এই সকল দুর্ব্বল চিত্ত জননীদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের কথা চিন্তা করে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা করার পর কথক

ঠাকুর বলে চললেন তাঁর নিজের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা। একদিন নদীর ওপারে এসে তিনি না'কি দেখলেন ভীষণ ঝড়—ঝড়ের সঙ্গে আছে ঝঞ্ঝা, বাত্যা। কি ক'রে পার হবেন তাই তিনি ভাবছিলেন, এমন সময় এক ধীবর-বালক নৌকা বেয়ে এসে তাঁকে জানালে, জমিদারের আজ্ঞায় কথক ঠাকুরকে সে আনতে এসেছে। ওপারে নেমে পিছন ফিরে কথক ঠাকুর দেখলেন সেখানে না আছে সেই বালক, না আছে তার সেই নৌকা। জমিদার সব কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন, কারণ তিনি এই দুর্য্যোগে কাউকেই পাঠাতে পারেন নি ইত্যাদি।' এই পর্য্যন্ত বলে কথক ঠাকুর কাঁদতে থাকলেন, 'প্রভো, তুমি দেখা দিয়েও দেখা দিলে না।' এবং এই সঙ্গে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। নির্লজ্জ মিথ্যা ভাষণের কি কোনও সীমা নেই? ধর্ম্মের নামে এইরূপ প্রতারণা আর কতদিন এদেশে চলবে?"

উপরি উল্লিখিত বিবৃতিদাতার সহিত আমরাও একমত; ধর্ম্মের নামে এই সকল প্রতারণা বন্ধ করার সময় এসেছে। মূর্ত্তি পূজা করার জন্যে আমরা নিন্দনীয় নই। মূর্ত্তি পূজার মধ্যেও যুক্তি আছে, সার্থকতা আছে। আমরা নিন্দনীয় এই সব প্রতারকদের সহ্য করার জন্যে। যারা গাছ পাথর ও সাপ পূজা করে তাদের আমরা অসভ্য বলি, অপর-দিকে একেশ্বরবাদীরা মূর্ত্তি পূজা করার জন্যে বাহির হ'তে আমাদের মধ্যযুগীয় মানুষ ভাবে। অপরদিকে যারা নাস্তিক বা শূন্যবাদী তারা একেশ্বরবাদীদের পাগলামীর কথা চিন্তা ক'রে অবাক হয়। মানুষ অদ্যাবধি বহু দেবতার ন্যায় এক ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রমাণ করতে পারে নি। একটি ঈশ্বর যদি থেকে থাকে, তা হলে বহু ঈশ্বরই বা থাকবে না কেন? প্রমাণ তো কোনওটিরও নেই। এই সব চিন্তা ক'রে আমাদের পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে লজ্জিত হবার কারণ নেই, বরং শূন্যবাদী, একেশ্বরবাদী

হ'তে আরম্ভ ক'রে, সাধারণ মূর্ত্তি পূজার পদ্ধতি পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মে স্থান পেয়েছে—এই জন্যে এই ধর্ম্মকে পৃথিবীর একমাত্র গণতন্ত্রী ধর্ম্ম মনে ক'রে আমরা গর্ব্ব অনুভব করতে পারি। এ কথা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু জেনে শুনে ধর্ম্মের পোষাক পরিহিত শত শত প্রতারকদের প্রতিদিন বরদাস্ত করার জন্যে আমাদের কি লজ্জিত হওয়া উচিত নয়? কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও এক বালিকার অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ রূপে কোনও এক মহিলা আশ্রমের পুরুষ সেক্রেটারী বালিকাটিকে দুষ্টা নামে অভিহিত করলে প্রত্যুত্তরে বালিকাটি বলেছিল, 'হাঁ, আমি স্বীকার করি আমি দুষ্টা। কিন্তু আমি দুষ্টামী করি সাদা কাপড় পরে, আপনার মতন রঙিন কাপড় পরে আমি দুষ্টামী করি না। আপনি গেরুয়া কাপড় ছেড়ে, সাদা কাপড় পরে আসুন, আমিও আপনার সঙ্গে দুষ্টামী করব, আপত্তি করব না। আপনিও দুষ্টামী করতে পারেন, সে অধিকার আপনার আছে, কিন্তু রঙিন কাপড় পরে তা আপনি পারেন না।' সহায় সম্বলহীনা দরিদ্র অশিক্ষিত বালিকাটির এই অভিমত সম্বন্ধেও আমি এদেশের সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্রবিদ্ পণ্ডিতদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

আমরা যখন কাউকে গোপাল দেবতাকে (বিগ্রহ) নিজের শিশু মনে করে তাকে কোলে শুইয়ে দোলাতে দেখি, তার সেই বাৎসল্য ভক্তির রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। ঈশ্বরকে যদি পিতা বা বন্ধুরূপে পূজা করে যায়, তাহলে তাঁকে সন্তান রূপেও আরাধনা করা সম্ভব। কিন্তু আমরা যখন বিগ্রহ সেবার অধিকারী হবার জন্যে দুই ভাইয়ে বিরোধ করতে দেখি তখন সত্য সত্যই অবাক্ হই। আত্ম-প্রবঞ্চনার ইহা একটি বড় দৃষ্টান্ত। দেব-বিগ্রহের নামে প্রদত্ত সম্পত্তির লোভে এদেশে নরহত্যার নজীরও আছে। কেউ কেউ দেবতার সম্পত্তির অছিরূপে সেই সম্পত্তি নানা অছিলায় আত্মসাৎও করে থাকেন। বড় বড় মন্দিরে ও মঠের নামে

ধনসম্পদ প্রদত্ত হয়েছিল জনসেবার উদ্দেশ্যে। মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পুস্তকাগার, অনাথ আশ্রম ও পান্থশালা। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি মন্দিরে প্রদত্ত অর্থ হ'তে সুপরিচালিত হবে, সেকালের রাজন্যবর্গ ও ধনী দাতাদের ইহাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সকল লোভী ভণ্ড গৃহী বা সন্ন্যাসীদের কবল হতে এই সকল সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে রাষ্ট্রের পক্ষে উহাদের ভার স্বহস্তে নেবার কি সময় আসে নি? পূর্ব্বেকার রাজন্যবর্গ ও ধনী দাতাগণ যদি আজ পর্য্যন্ত জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁরা দেবসেবায় প্রদত্ত তাঁদের কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি সকলের এবম্বিধ দুর্দ্দশা পরিলক্ষ্য ক'রে নিশ্চয়ই এই সব দেবালয়ের বর্ত্তমান অধিকারীদের বিপক্ষে আদালতে মামলা রুজু করতেন। এছাড়া আমরা যখন দেব-বিগ্রহের নামে আদালতে মামলা রুজু হতে দেখি কিংবা যখন দেবতাকে স্বয়ং আদালতে প্রতিনিধি (Representation) দ্বারা মামলা দায়ের করতে দেখি, তখন সত্যই আমরা লজ্জিত হ'য়ে উঠি। তথাকথিত দেব-বিগ্রহ যেন একজন জন্মগত নাবালক মাত্র (Perpitual Minor)। নির্লজ্জ আত্মপ্রবঞ্চনার কি শেষ নেই? আমার মতে এই দেবসেবা প্রথা যদি বহাল রাখারই প্রয়োজন হয় তাহলে দেবতার নামে প্রদত্ত এই সব সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার (বা উদ্দেশ্য প্রতিপালনের) ভার, ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত। ধর্ম্ম যখন এদেশের রাষ্ট্রের মধ্যে স্থান পেয়েছে তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি বিভাগ রক্ষা করা অতীব প্রয়োজন, রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই মঙ্গলের জন্যে। এ সম্বন্ধে আমি দেশবাসীদের চিন্তা করতে অনুরোধ করি।

[ধর্ম্মের নামে নরহত্যা, গৃহদাহ ও নারীনির্য্যাতনের দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নয়। এক ধর্ম্মাবলম্বীদের অপর ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষের কথাও শুনা যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।]

সাধারণ প্রবঞ্চনা

প্রবঞ্চনা মূলতঃ দুই প্রকারের হয়, যথা—সাধারণ এবং অসাধারণ। অসাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে কেবল মাত্র সাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে বলা হবে। (প্রথম পরিচ্ছেদে সাধারণ প্রবঞ্চনার সংজ্ঞা দেখুন।) এই সাধারণ প্রবঞ্চনাকেও আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা—আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনা। একমাত্র পরপ্রবঞ্চনাকেই আমরা আইনানুসারে অপরাধ বলি। মানুষ যখন নিজে নিজেকে ঠকায় তখন তাকে আমরা বলি আত্মপ্রবঞ্চনা। আমার মতে আত্মপ্রবঞ্চনা আত্মহত্যারই সামিল। আত্মপ্রবঞ্চনার উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"—ও কথা আর বলেন কেন মশাই, আমি এবং আমার স্ত্রী, উভয়েই আমিষ আহার ছেড়ে দিয়েছি। জানেন তো, বিবাহের দেড় বৎসর পরই জ্যেষ্ঠ কন্যাটি বিধবা হয়ে ঘরে এসেছে, বিধবা পুত্রবধূটিও ঘরে। বালিকা-দ্বয়ের দুঃখ মনে হলে বুক ভেঙে যায়। ওরা যখন মাছ মাংস খায় না, তখন আমরাই বা তা খাই কি করে! তাই এই গব্যঘৃতটুকু কিনে নিয়ে যাচ্ছি, আর খোকার ডানলার জন্যে এইগুলাও। যা হোক ক'রে মুখে দুটো অন্ন তো দিতে হবে।"

উপরের দুঃখের কাহিনীটুকু যিনি আমাকে শুনাচ্ছিলেন, তিনি আমারই এক পুরাতন বন্ধু। তাঁর ঘরের সব খবরই আমরা জানতাম। তাঁর স্ত্রী এ বৎসর আর একটি কন্যা প্রসব করেছেন, গত বৎসর একটি পুত্রও, যদিও কি'না ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে উঠেছে।

এদেশের সামাজিক প্রথানুযায়ী বিধবা অবস্থায় তাঁর পুত্রবধূ ও কন্যাটি সামান্য থান কাপড় পরে নিরামিষ খেয়ে দিন কাটালেও, ভদ্রলোকটির এবং তাঁর স্ত্রীর বেশভূষার কোনও অভাব আমি কদাচিৎ দেখেছি। আসলে ভদ্রলোক এই সুযোগে বাড়ীতে আমিষ ভোজন বন্ধ করে কিঞ্চিৎ খরচ বাঁচাচ্ছেন। ভদ্রলোকটির কাতরোক্তির প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে সেইদিন এইরূপ বলেছিলাম, 'মশাই, আপনি কি মনে করেন, মানুষের উদরের ক্ষুধা ছাড়া আর কোনও ক্ষুধা নেই। জীবনটা তো আপনি এবং আপনার স্ত্রী দৌঁড়েমুসেই উপভোগ করে নিয়েছেন, তা বুড়া বয়সে একটু নিরামিষ খেলে স্বাস্থ্য আপনাদের ভালই থাকবে। এজন্য আপনাদের দুঃখ করবার কোনও প্রয়োজন আছে, এরূপ আমি মনে করি না।'

উপরের এই উত্তর ও প্রত্যুত্তর হতে পাঠকগণের আত্মপ্রবঞ্চনার স্বরূপ সম্বন্ধে বোধগম্য হবে। এই আত্মপ্রবঞ্চকদের সহিত দুঃখবিলাসীদের প্রভেদ আছে। দুঃখ পাওয়াই যাদের বিলাস বা আনন্দ তাদের বলা হয় দুঃখবিলাসী। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চকদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। আত্মপ্রবঞ্চকরা মনের দুর্ব্বলতাজনিত নানারূপ অসুবিধা ভোগ ক'রে দুঃখ পায়। এ সম্বন্ধে নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম।

"আমার দৈহিক ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা এখনও আমি হারাই নি। অন্তরে অন্তরে প্রতিটি মুহূর্ত্তে আমি আমার পুনর্বিবাহ কামনা করি, কিন্তু দুইটি পুত্র বর্ত্তমানে বিবাহ করলে লোকে কি-ই বলবে, এই ভেবে আমি বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিই না, যদিও কি'না আমার বর্ত্তমান বয়স মাত্র আটাশ। মুখে আমি সকলকে জানিয়ে দিই—'পাগল! প্রিয়তমার স্মৃতি এত সহজে কি আমি ভুলতে পারি? ছিঃ, এ ছাড়া বাচ্ছা

দুটোর কি হবে ? ওদের যে কষ্ট হবে এতে ইত্যাদি।' এদিকে কিন্তু আমি গোপনে অন্য নারীর সঙ্গ কামনাও করেছি। ওদিকে আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী, বড় জায়ের অবর্ত্তমানে বাড়ীর কর্ত্রী হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর নবলব্ধ কর্তৃত্বের অবসান-আশঙ্কায়, এ বয়সে (?) আমাকে বিবাহ করতে দিতেও নারাজ, এতে না-কি তাঁর পুত্রবৎ প্রতুল (অর্থাৎ আমার পুত্র) কষ্ট পেতে পারে। আমার ইচ্ছা করে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিই ; কিন্তু মুখে বলি, 'না থাক্, ওরাই আমার সব, ওরাই আমাকে দেখবে ইত্যাদি।' আসলে আমি, আমার ভ্রাতা এবং আমার ভ্রাতৃবধূ—তিনজনেই আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করে আসছিলাম।"

এই আত্মপ্রবঞ্চনা একটি সামাজিক অপরাধ। "সামাজিক অপরাধ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব। এক্ষণে আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয় "পরপ্রবঞ্চনা"। এই আত্মপ্রবঞ্চনা এবং পরপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে "ধর্ম্মের পোষাকে প্রবঞ্চনা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। পরপ্রবঞ্চনা যৌনজ এবং অযৌনজ, এই উভয় উপায়েই সংঘটিত হয়। প্রথমে পরপ্রবঞ্চনার অযৌনজ পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

পরপ্রবঞ্চনা

পরপ্রবঞ্চনাকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি, যথা—(১) একক প্রবঞ্চনা ও (২) ব্যাপক প্রবঞ্চনা। একক পদ্ধতিতে মাত্র একজন বা দুইজন বা ততোধিক ঠগী প্রত্যক্ষরূপে সংশ্লিষ্ট থাকে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে অপর কোনও ব্যক্তি এই অপকর্ম্মে জড়িত

হয় না। কেহ যদি কাহাকেও সোনা বলে পিতল গছিয়ে দেয় তাহলে সে প্রত্যক্ষভাবে মাত্র একজনকেই ঠকিয়ে থাকে। কিন্তু এমন অনেক প্রবঞ্চনা আছে যা কিনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রবঞ্চনার এই ব্যাপক পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। নিম্নের দৃষ্টান্তটুকু প্রণিধান করুন।

"'ক' বাবু একজন তৈল ব্যবসায়ী। তিনি খাঁটি তিল তৈলের নামে অধিক মূল্যে বাদাম তৈল মিশ্রিত তিল তৈল গছিয়ে দিলেন। এর পর 'ক' বাবু অপর আর এক ছোট ব্যাপারী 'খ' বাবুকে উচিত মূল্যে এই খাঁটি তিল তৈল (বাদাম তৈল মিশ্রিত) বিক্রয় করলেন। এই ছোট ব্যাপারী 'খ' বাবু, তথাকথিত এই খাঁটি তৈল বিক্রয় করলেন এক সুগন্ধি তৈল ব্যবসায়ী 'গ' বাবুকে। এর পর এই সুগন্ধি তৈল ব্যবসায়ী 'গ' বাবু খাঁটি তৈলের নামে মিশ্রিত তিল তৈল জনসাধারণের নিকট বোতলে পুরে বিক্রয় সুরু করলেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'ক', 'খ' এবং 'গ' বাবু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে এই প্রতারণারূপ অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন। এই কারণে উপরি উক্ত ঠগী ব্যাপারীর পরপ্রবঞ্চনাকে আমরা ব্যাপক প্রবঞ্চনা বলে থাকি। এই ক্ষেত্রে একের অপরাধে বহু লোককে অপরাধীর পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হতে হয়।"

এই সকল বহুদূরস্পর্শী অপরাধ সকলকে আমরা ব্যাপক অপকার্য্য বলে থাকি। 'প্রবঞ্চনার' ন্যায় অন্যান্য বহু অপরাধের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। এমন অপরাধও আছে, যে সকল অপরাধ কোনও এক পুরুষ, তাঁর (বা তাঁদের) জীবিত অবস্থায় করে, কিন্তু পরবর্ত্তী পুরুষগণকে, তাদের ঐ স্বার্থান্ধ আত্মসর্ব্বস্ব পূর্ব্বপুরুষের অপকর্ম্মের জন্যে পরম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। ভাবীকালের কথা বাদ দিলেও বর্ত্তমান কালেও আমরা এই শ্রেণীর নানারূপ ব্যাপক অপরাধ দেখতে

পাই। পিতামাতার ভুলের জন্য সন্তানদের শাস্তিভোগের দৃষ্টান্তও এদেশে দেখা গিয়াছে। রাজা বা ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অপরাধের কারণে দেশশুদ্ধ লোকের অধোগতির দৃষ্টান্তও এ দেশে বিরল নয়। এই সকল বিবিধ ব্যাপক অপরাধ সম্বন্ধে "ব্যাপক অপরাধ" শীর্ষক একটি পৃথক পরিচ্ছেদে আমি আলোচনা করব।

যে কোনও দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন, উহার পিছনে থাকে কোনও একটি বিশেষ কারণ—বৈজ্ঞানিক ভাষায় উহাকে কার্য্যকরণ বলা হয়। হঠাৎ একটি বৈদ্যুতিক পাখা ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে একজনের মৃত্যুর কারণ হ'ল। আপাতদৃষ্টিতে উহা দুর্ঘটনা মনে হলেও উহা কোনও না কোনও ব্যক্তির অবহেলা বা অসাবধানতার কারণে ঘটে থাকে। এমন কি যে ব্যক্তি বা কোম্পানি ঐ পাখা তৈরী করেছে, কিংবা যে মিস্ত্রি ঐ পাখা ছাদের সহিত সংযুক্ত করেছে, সেও এজন্য দায়ী হতে পারে। এই ধরণের অপরাধকেও ব্যাপক অপরাধ বলা চলে।

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে মাত্র পরপ্রবঞ্চনার একক অযৌনজ পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই বিশেষ পরপ্রবঞ্চনার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে এইবার একে একে আলোচনা করা যাক। ভারতবর্ষে তথা জগতে পরপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন "হিতোপদেশ" ও "পঞ্চতন্ত্র" প্রণেতা মহাপণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা। শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা কথিত পরপ্রবঞ্চনার একটি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। এই পদ্ধতিটি হতে পরপ্রবঞ্চনার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বুঝা যাবে।

"কোনও এক ব্রাহ্মণ একটি ছাগশিশু ক্রয় করে গৃহে ফিরছিলেন। কয়েকজন ঠগী-চোর এই ছাগশিশুটি প্রবঞ্চনার দ্বারা অপহরণ করতে মনস্থ করল। তারা তখন সেই ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনের পথের এক এক জায়গায় এক একজন পৃথক পৃথক ভাবে অপেক্ষা করতে থাকে, এমন

ভাবে যেন কেউ কাউকেও চিনে না। এর পর প্রথম ঠগী ব্রাহ্মণের পথ অবরোধ করে জিজ্ঞেস করল, 'একি ঠাকুরমশাই, কুকুর ছানাটা নিয়ে চলেছেন কোথায়?' ছাগশিশুটিকে এই ভাবে কুকুর ছানারূপে অভিহিত করায়, ব্রাহ্মণ প্রথম ব্যক্তিকে তার এবম্বিধ ব্যবহারের জন্যে গাল দিয়ে পুনরায় পথ চলতে থাকেন। কিছুদূর চলে এসে তিনি দ্বিতীয় ঠগীটিকে দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণকে দেখে দ্বিতীয় ঠগীটি অবাক হওয়ার ভাণ করে জিজ্ঞেস করে উঠে, 'কুকুর ছানাটা কত দিয়ে কিনলেন? এ ভাল জাতেরই কুকুর হবে। আমার যে কুকুরের ব্যবসা ছিল, ইত্যাদি।' দ্বিতীয় ঠগী ব্যক্তির কথায় ব্রাহ্মণের যেন একটু সন্দেহ জাগে, ছাগলটিকে ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে, পুনরায় তিনি পথ চলতে থাকেন। এর পর তৃতীয় ঠগীটির সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তৃতীয় ঠগীটি ব্রাহ্মণকে শুনিয়ে শুনিয়ে অপর আর ব্যক্তিকে বলছিল, 'দেখ দেখ, ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখ, কুকুর নিয়ে চলেছেন। কলির ব্রাহ্মণ—' তৃতীয় ঠগীর এবম্বিধ বাক্যে ব্রাহ্মণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন, তিনি ছাগলটিকে কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তায় নামান এবং তারপর তাকে তুলে নিয়ে পুনরায় পথ চলতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর দেখা হয় চতুর্থ ঠগীটির সহিত। চতুর্থ ঠগীটির ঐরূপ কথা ব্রাহ্মণ আর পুরাপুরি অবিশ্বাস করতে পারেন না। তাঁর মনে হয় কি জানি হয়ত কোথায় একটু গোলমাল আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছাগশিশুটিকে ছাগ শিশুরূপে বুঝেও কুকুর ছানা বিধায় পরিত্যাগ করে স্নান সমাপনে গৃহে ফিরেন, ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে।"

উপরি উক্ত কাহিনীটি গল্পচ্ছলে বর্ণিত হলেও উহা হ'তে বাক্-প্রয়োগের (Suggestion) অত্যদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। অধিক ক্ষেত্রে বাক্-প্রয়োগের সাহায্যে প্রবঞ্চকগণ অপকর্ম্ম করে থাকে, কিন্তু

বাক্‌প্রয়োগের সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রবঞ্চনা অপরাধ সংঘটিত হতে পারে এবং তা হামেসাই হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী উদ্ধৃত করা যাক্।

"আমার কাছে পাড়ার একটি ছেলে এসে ধরে পড়ল, সরস্বতী পূজার জন্য চাঁদা দিতে হবে। এদিকে টাকাকড়ি যা কিছু আমার ব্যবসার ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়—এই বিশেষ তথ্যটি ছেলেটির ভালরূপেই জানা ছিল। ছেলেটির পীড়াপীড়িতে বিব্রত হয়ে, আমি দোকানের ম্যানেজারের নামে নিম্নোক্তরূপ একটি পত্র লিখে ছেলেটির হাতে তা দিই

প্রিয়, অমুকবাবু, ম্যানেজার ইত্যাদি—

* * * *

আপনার কাছে এই লোকটিকে পাঠাচ্ছি। এর হাতে পাড়ার পূজার চাঁদা স্বরূপ ৫৲ টাকা দিয়ে দেবেন। ইতি— 'স্বাক্ষর'

এদিকে ঠগী ছেলেটি পত্রের শিরোনামটুকু ফুট্‌কী চিহ্নিত অংশ বরাবর সুঠামভাবে বিচ্ছিন্ন করে, নিম্নের অংশটি একটি পৃথক খামে ভরে খামের উপর আমার এক কুটুম্ব আত্মীয়ের নাম লিখে, সেই আত্মীয়ের নিকট পত্রটি দেখিয়ে পাঁচ টাকা আদায় করেন। এর পর প্রবঞ্চকটি আমার সেই আত্মীয়ের হাতে একটি পেন্সিল দিয়ে পত্রের পিছনে (Paid Rs. 5/-) 'পাঁচ টাকা দিলাম' এইরূপ লিখিয়ে নিয়ে কায়দা মাফিক পত্রটি ফিরিয়ে নিতেও সক্ষম হয়। এর পর রবারের সাহায্যে পত্রের পিছনের "পাঁচ টাকা দিলাম" লেখাটি মুছে ফেলে, চিঠিটি অপর আর একটি খামে ভরে, আমার অপর আর এক আত্মীয়ের কাছে তিনি উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, প্রবঞ্চকটির আমার বহু আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের

নাম ও ঠিকানা জানা ছিল"। কথার মারপ্যাচ দ্বারা প্রবঞ্চকটি অনায়াসে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হতে টাকা আদায়ের পর পত্রটি এই ভাবে ফেরত নিতে সক্ষম হয়েছিল। সর্ব্বশেষে এই প্রতারক যুবকটি আমার দোকানে যায় এবং তার প্রাপ্য টাকা কয়টা আদায় করে ঘরে ফিরে ; প্রায় ছয় মাস পরে কথোপকথনের মধ্যে দৈবক্রমে আমার এক আত্মীয়ের নিকট বিষয়টি জেনে আমরা উভয়েই অবাক হয়ে যাই। এর পর অনুসন্ধান দ্বারা অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুদের নিকটও ঐ একই কথা শুনে আমি অবাক হই, কিন্তু প্রতারক যুবকটির আর কোনও সন্ধান পাই না।"

সাধারণ প্রবঞ্চনার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে অপর আর একটি প্রবঞ্চনার পদ্ধতি উদ্ধৃত করলাম। কলিকাতা শহরে এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ প্রায়ই গৃহস্থদের দ্রব্যাদি অপহরণ করে থাকে।

"দশটা পনের মিনিটের সময় আমার স্বামী অফিস রওনা হয়েছেন। এর ঠিক দুই মিনিট পরেই লোকটা এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে, —'দেখুন, অমুকবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। এই ওঁর সঙ্গে দেখা হল, মোড়ের মাথায় ; উনি অফিস যাচ্ছিলেন। উনি বললেন, তাঁর শালখানা আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে, রিপু করার জন্যে। আমার শাল রিপু করার দোকান আছে, মা ! বাবুর অফিসের দপ্তরী বদ্রুদ্দীন আমার বড় ভাই। বাবু বলে দিলেন, মা হোক, মিতু দিদি হোক, যার কাছে হোক চাইলেই হবে।' আমার ছোট মেয়ের নাম 'মিতু'। মিতু নামটা শুনে লোকটার কথা আমি বিশ্বাস করি। এ ছাড়া বদ্রুদ্দীন নামটাও আমার শুনা ছিল। লোকটা যে কদিন ধরে ওৎ পেতে শুলুক সন্ধান করেছে এবং আগে-ভাগেই খুকীর নামটা জেনে নিয়েছে, তা কি আর আমি জানি ? হাঁ মশাই, সে কথা ঠিক, আমরা প্রায়

খুকীর নাম ধরে ডেকে থাকি, বাইরে থেকে কারও পক্ষে তা শুনা অসম্ভব নয়। যাই হোক, লোকটাকে বিশ্বাস করে দামী শালটা তাকে আমি দিয়ে দিই। সন্ধ্যার সময় উনি বাড়ী ফিরে সব কথা শুনে অবাক হয়ে যান এবং আমাকে ভর্ৎসনা করেন। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারি, লোকটা একটা প্রবঞ্চক, মিথ্যা ছলনা দ্বারা আমাকে ভুলিয়ে দামী শালটা সে হস্তগত করেছে।"

এইরূপ অপরাধ সম্পর্কীয় অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমার পুত্র সান্ধ্যভ্রমণে বার হবার কয়েক মিনিট পরই তার সমবয়স্ক এক বালক আমার নিকট এসে বললে মা, রাজেন্ আমার সহপাঠী। সে একদিনের জন্য আমার ইতিহাসের নোট বইটা চেয়ে এনেছিল। বাবা এক্ষুণি সেটা চাচ্চেন, না পেলে বড্ড বকাবকি করবেন। বালকটির এই কাতরোক্তিতে আমি মনে করলাম, তা সত্যই হয় ত তাই হবে। দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে বললাম, তা বাবা! আমি তো লেখাপড়া জানি না। তুমি বরং ওর টেবিলের উপরকার বইগুলার ভিতর হতে ও বইটা বেছে নিয়ে যাও। আমার পদধূলি গ্রহণ করে তখন সে আমার পুত্রের টেবিল থেকে বইখানি উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। এরপর আমার পুত্র ফিরে এলে তার কাছে অবাক হয়ে শুনি যে ঐ অজ্ঞাতনামা বালকের সব কথাই মিথ্যা ছিল।"

উপরের প্রবঞ্চনা পদ্ধতি ব্যতীত আরও একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ শহরের লোকেদের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে লোক ঠকানোর এই পদ্ধতিটিকে "টেলিফোন সুইণ্ডলিঙ" এই নামে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ প্রথমে টেলিফোন দ্বারা দোকানদারদের সহিত তাদের কোনও এক পরিচিত ব্যক্তির নামে কথোপকথন করে, অনেক সময় সেই পরিচিত বা নামজাদা

ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বরও তারা অনুকরণ করে থাকে। এই সময় প্রবঞ্চকটি জানিয়ে দেয় যে, তার ম্যানেজার বা কোনও কর্ম্মচারীকে পত্রসহ সে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছে, দোকানদার যেন তার সেই লোক মারফৎ দ্রব্যাদি পরিদর্শনের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। এর পরক্ষণেই একজন লোক পত্রসহ দোকানে এসে হাজির হয়, পদব্রজে বা মোটরে। লোকটি দোকানের রসিদ বইয়ে যথারীতি সই করে দ্রব্যাদিসহ প্রস্থান করে। এর পর আরও কয়দিন অপেক্ষা করে দোকানদার তার সেই ধনী খদ্দেরের বাটীতে বিল পাঠিয়ে জানতে পারে যে তারা প্রতারিত হয়েছে। দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কথিত ভদ্রলোক একেবারেই ওয়াকিবহাল নহেন। এ সম্বন্ধে কোনও একটি প্রবঞ্চকের একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"আমি কোনও এক পাবলিক টেলিফোনে এক আনা জমা দিয়ে অমুক জুয়েলারী দোকানে ফোন করি, 'দেখুন, আমি অমুক থানার বড়বাবু, চিনতে পারছেন তো? দোকানদার বড়বাবুকে ভাল রূপেই চিনতেন, ভদ্রলোকের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমিও অবহিত ছিলাম, এই জন্যে এত লোক থাকতে আমি এঁর নামেই ফোন করি। উত্তরে দোকানদার, 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ' বলে উঠে অভিবাদন জানায়। আমি তখন তাঁকে জানাই, 'দেখুন একজন সিপাইকে পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছি, দু'ছড়া ভাল নেকলেস্ পাঠাবেন তো, পছন্দ হলে একটা রেখে দেব, হাঁ, দামটাও লিখে পাঠাবেন।' দোকানদার আমাকেই বড়বাবু ভেবে এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয়। এদিকে আমি কয়েকখানা পুলিশের ফর্ম্মও পূর্ব্বাহ্ণে জোগাড় করে রেখেছি। পুলিশের সেই ছাপানো ফর্ম্মে বড়বাবুর জবানিতে একটি পত্র লিখে আমি আমার এক হিন্দুস্থানী সহকারীকে পত্রসহ সেই দোকানে পাঠিয়ে দিই। আমার হিন্দুস্থানী

সহকারীটি সিপাহীদের কায়দানুসারে সেলাম করে দোকানদারকে পত্রটি দিলে দোকানদারটি দুই জোড়া জড়োয়া নেকলেস্ নিঃসন্দেহে তার হাতে তুলে দেয়।"

নামকরা নাগরিক এবং পদস্থ কর্ম্মচারীদের নামে শহরে এই ধরণের প্রবঞ্চনা হামেসাই হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে কোনও এক পদস্থ কর্ম্মচারীর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"একদিন অফিসে বসে আছি, হঠাৎ শহরের এক নামজাদা খাবারের দোকানের সরকার এসে হাজির। ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে ৫৫্ টাকার একটা বিল আমার দিকে এগিযে দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার। অনেক দিন বিলটা পড়ে আছে, আপনি বোধ হয় ভুলে গিছলেন, হে হে হে।' আমি অবাক হয়ে বিলটা পড়ে দেখি, আমি নাকি তাদের দোকান থেকে কয়েক হাঁড়ি দধি ও সন্দেশ কিনেছি, তিন মাস পূর্ব্বে। বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে শুধোই—'এ্যাঁ আমি কিনেছি, চেনেন আপনি আমাকে?' ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'না, আপনি তো অমুক বাবু নন।' আমি তখন তাঁকে জানাই, আমিই অমুক বাবু এবং দোকানের বিক্রেতাকে ডেকে পাঠাই। বিক্রেতা এসে আমাকে অমুক বাবুরূপে জেনে অবাক হয়ে যায়, এবং নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি দেয়—

"তিনমাস পূর্ব্বে একজন মোটা গোছের প্রৌঢ় ভদ্রলোক দোকানে এসে 'আমি অমুক বাবু' ওই নামে পরিচয় দিয়ে কিছু খাবার বন্ধুসহ খেতে চান। আমরা তাঁকে খাবার খাওয়াই এবং তাঁকে মালিকের বন্ধুরূপে জেনে দাম নিতে অস্বীকৃত হই। কিন্তু তিনি জোর করে দাম দেন, এবং ৫৫্ টাকার মূল্যের দধি ও সন্দেশ তাঁর গাড়ীতে তুলে দিতে বলেন। আমরা তাঁর উপদেশমত কাজ করি এবং দ্রব্যাদির মূল্য বাবদ

একটা বিলও তাঁর হাতে দিই। তিনি বিল অনুযায়ী টাকা পাঠিয়ে দেবেন বলে মিষ্টান্নাদিসহ প্রস্থান করেন। আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে কখনও দেখিনি, তাই সেই লোকটিকেই আমি, 'আপনি' মনে করেছিলাম। হাঁ স্যার, আপনার নাম আমি ইতিপূর্ব্বে বাবুদের মুখে বহুবার শুনেছি, তাই—"

আমি উপরি উক্ত পদস্থ ব্যক্তিটির মুখে শুনেছি যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে কার্য্যব্যপদেশে বহুবার উক্ত দোকানে গিয়েছেন, কিন্তু দোকানের কেহ তাঁহাকে মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়িত করা তো দূরে থাক, অভ্যর্থনা পর্য্যন্তও তাঁহাকে কেহ করেনি। আসল 'অমুক বাবু' যে খাতির পায় নি, নকল 'অমুক বাবু' সেই খাতির পেল। কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই লোকের মনে আসবে। বিষয়টি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করলে, এই সব প্রবঞ্চনার মধ্যে দোকানের কর্ম্মচারীদের যে যোগাযোগ থাকে, এইরূপ মনে করা চলে।

এই প্রবঞ্চনা অপরাধের নিদর্শন স্বরূপ অপর আর এক রত্ন ব্যবসায়ীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমার কি দোষ মশাই। আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু দেখিনি, এবং এও শুনেছি, আপনি একজন দেবতুল্য লোক। সকাল নয়টায় একজন লোক ফোনে জানাল আপনি কথা বলবেন। এর পর আপনার নাম নিয়ে আর একজন ফোন করে জানালেন, তিনি পত্রসহ দারোয়ান পাঠাচ্ছেন। দারোয়ান এসে আংটি কটা নিয়ে গেল, এবং কিছু পরেই আবার সেগুলা ফিরিয়ে এনে জানাল, 'তার সাহেব মেমসাহেব সমভিব্যাহারে খোদ আসবেন বেলা তিনটায় নিজেরা জিনিস পছন্দ করতে। এর পর বেলা তিনটায় টকটকে বর্ণের লম্বা চেহারার একটা লোক একজন পরমা সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে দোকানে এলেন।

আমরা তাঁদেরই 'আপনারা' মনে করে আনন্দে গলে পড়ে খাতির-যত্ন করলাম। সাহেব কম দ্রব্য নিতে চান, মেমসাহেব নিতে চান বেশী জিনিস। সাহেব যেটা পছন্দ করেন, মেমসাহেব সেটা বাতিল করে দেন। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর মেমসাহেব প্রায় সতের হাজার টাকার মূল্যের দ্রব্যাদি নিয়ে মোটরে উঠলেন। বিব্রত হয়ে সাহেব পাঁচ শত টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে বিমর্ষমুখে বিলটা তাঁর বাড়ীতে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে মেমসাহেবের পাশে এসে বসলেন। আমরাও যথা-রীতিতে তাঁদের মোটর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দোকানে ফিরলাম, আমাদের একবারও মনে হয় নি যে তাঁরা 'আপনারা' নন।"

এই বিশেষ পদ্ধতি সকল ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতি দ্বারা প্রায়ই ঠগীরা সরল প্রকৃতির ভদ্র দোকানদারদের কলিকাতা শহরে ঠকিয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ঠগী প্রায়শঃ একজন বালক সঙ্গে করে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে আসে। এর পর বালকটিকে দোকানে বসিয়ে রেখে ঠগী লোকটা দশ বারোটি ভাল ভাল দামী শাড়ী বেছে নিয়ে বাড়ীর মেয়েদের দেখাবার জন্যে দোকান ত্যাগ করে। বালকটি অছিস্বরূপ বসে থাকায় দোকানদার এই প্রস্তাবে প্রায়ই অরাজি হয় না। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শিক্ষানুযায়ী ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কখনও কখনও সে কান্না সুরু করে দেয়, মা বা কাকীমার নাম নিয়ে। এই অবস্থায় কোনও কোনও দোকানদার এই সকল ছেলেদের কান্নায় বিব্রত হয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে তাদের মিঠাই কিনে দিয়েছে, এইরূপও শুনা গেছে। এরপর দোকানদার অপরাপর খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ছেলেটিও ইত্যবসরে আনমনা হয়ে' রাস্তায় নামে। এরপর রাস্তার উপর কিছুক্ষণ ঘুরাফিরা ক'রে সুযোগমত সরে পড়ে ছেলেটি ঠগী লোকটির সহিত এসে মিলিত হয়।

এই সকল বালকগণ যে সকল সময়ই দোকানদারদের নজর এড়িয়ে সরে পড়তে সক্ষম হয়, তা নয়। ঠগী লোকটির অবর্ত্তমানে প্রায়ই দোকানদাররা এদেরই থানায় ধরে' নিয়ে আসে। থানায় এসে এরা কাঁদতে স্বরু করে এবং জানায়, "লোকটা রাস্তা থেকে তাকে ধরে নিয়ে এসেছিল, এবং সে না'কি তাকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেনি। লোকটা নাকি তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে দোকানে সে না ফিরা পর্য্যন্ত বসে থাকতে বলেছিল, ইত্যাদি।" ছেলেটি তার মুঠার মধ্যে রক্ষিত একটিমাত্র সিকিও প্রমাণস্বরূপ পুলিশকে দেখিয়ে দেয়।

সাধারণ দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হয় ছেলেটি নির্দ্দোষ। দোকানদারকে এও স্বীকার করতে হয়, ছেলেটির সহিত তাদের এ সম্বন্ধে কোনও কথা হয় নি। এ ছাড়া দেখা যায়, ছেলেটির বাড়ীঘর ও পিতামাতাও বর্ত্তমান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল বালকরা স্কুলেরও ছাত্র হয়। এই সকল বালকেরা প্রমাণের অভাবে প্রায়ই মুক্তি পেয়ে থাকে। আসলে কিন্তু এই সকল বালকেরা অত্যন্তরূপ ধূর্ত্ত হয়ে থাকে এবং কিছুতেই সত্য কথা বলতে চায় না। ছোটবেলা হ'তে অপরাধীদের সহিত মিশে এরা এইরূপ হয়ে থাকে। এই ধরণের বালক অপরাধীদের সংখ্যা শহরে অত্যন্তরূপ অধিক। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে শহরের লোভী দরিদ্র বালকদের এই সব ঠগীরা ভুলিয়ে এনে এইভাবে যে কাজ হাসিল না করে তা'ও নয়।

এছাড়া অপর আর এক অভিনব পদ্ধতিতে শহুরে ঠগীরা দোকানদারদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারে দোকানেরই এক কুলিকে দ্রব্যাদিসহ অমুক নং বাটীতে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে ঠগী মহাশয় স্থান ত্যাগ করেন, এই বলে' যে জিনিস পৌছবামাত্র কুলির হাতেই তিনি দাম দিয়ে দেবেন। এদিকে যথা সময়ে ঠগী মহাশয় কথিত

বাটীর দারোজার নিম্নে অপেক্ষা করতে থাকেন। এর পর তিনি কুলির নিকট হতে দ্রব্যাদি বুঝে নিয়ে দ্রব্যাদিসহ বাটীর অপর আর এক দুয়ার দিয়ে বেমালুম সরে পড়েন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কুলি (বা কর্ম্মচারী) বুঝতে পারে যে বাড়ীটি খালি বাড়ী কিংবা বাড়ীটিতে বহু ভাড়াটিয়া বাস করে। তারা দ্রব্য সম্বন্ধে কোনও কিছুই জানাতে অক্ষম হয়। বেশ বুঝা যায় বিষয়টি আগাগোড়া প্রতারণা মাত্র।

অন্তিবাজী

অন্তিবাজী বা অন্তমার পদ্ধতি সাধারণ প্রবঞ্চনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণতঃ ইরাণী নামক ভ্রাম্যমাণ স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত দলের লোকেরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে লোক ঠকায়। কিরূপ পদ্ধতিতে এই দুর্ব্বৃত্তদল লোকের অর্থ অপহরণ করে, তা নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

"আমাদের একজন জনবহুল কোনও এক দোকানে এসে সামান্য কিছু দ্রব্য ক্রয়ের অছিলায় একটা টাকা ভাঙিয়ে নিই। সাধারণতঃ আমরা কোনও দ্রব্য ক্রয় না করেই টাকা ভাঙিয়ে থাকি। এক টাকার রেজগী হাতে তুলে আমরা দোকানদারকে জানাই যে, এর মধ্যে অনেকগুলি জালিমুদ্রা আছে। এর পর আমরা দোকানদারদের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই সিকি দু'আনি বা পয়সা বেছে বা বদলে নিতে থাকি। আমাদের পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে দোকানী এ প্রস্তাবে রাজীও হয়। এই সুযোগে দোকানীর চক্ষের সামনে হাত সাফাইএর (sleight of hand) সাহায্যে, আমরা অনেকগুলি সিকি দু'আনি ইত্যাদি সরিয়ে নিতে সক্ষম হই। এ ছাড়া কোনও দোকানীকে তার পয়সাকড়ি গুণতে

দেখলে আমরা তাকে জানাই, 'ঐ ঐ পয়সাগুলা জালি বা খারাপ।' এর পর ঐগুলি দোকানদারকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দেবার অছিলায় মুদ্রাগুলিতে হাত দিয়ে, হাতসাফাইএর সাহায্যে অনেকগুলি মুদ্রা বেমালুম সরিয়ে ফেলে থাকি।"

এই প্রকার প্রবঞ্চনাকে প্রবঞ্চনা না বলে চুরিই বলা উচিত। কারণ এই পয়সা বা আনিগুলি দুর্ব্বৃত্তরা সরিয়ে ফেলেছিল দোকানদারের অজ্ঞাতসারে, জ্ঞাতসারে নয়। দোকানদার নিজে দুর্ব্বৃত্তদের হাতে ঐ সব তুলেও দেয় নি, দুর্ব্বৃত্তরা দোকানদারের অজ্ঞাতসারে ঐগুলা সরিয়ে নিয়েছে—কিন্তু এই অস্তিবাজীর অধিক সংখ্যক পদ্ধতিই প্রবঞ্চনা অপরাধের পর্য্যায়ে প'ড়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে অপর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম।

"শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একজন লোক কতকগুলা ভাল ভাল শাড়ী সস্তায় বিক্রয় করছে। কয়েকজন ভদ্রলোককে কয়েকখানি শাড়ী সস্তা দামে কিনতেও দেখলাম। অপর সকলের দেখাদেখি আমিও একখানি শাড়ী কিনে ফেলি, আমার এক শ্যালিকাকে উপহার দেবার জন্যে। মূল্য বাবদ উনিশটি টাকা গুণে নিয়ে লোকটা শাড়ীখানা একটা খবরের কাগজে মুড়ে, যত্ন ক'রে সেটা সে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলো। এর পর সোজা শ্বশুরালয়ে এসে শ্যালিকাটিকে কাপড়খানি আমি উপহার দিই। কিছু পরে শ্যালিকাটি কাপড়ের মোড়কটি খুলে দেখতে পায় তার মধ্যে একটা ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া রয়েছে, শাড়ী নেই। বিষয়টি সকলের ঠাট্টার সামিল মনে করে হেসে উঠেন, এদিকে আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকি। উনিশ টাকা খরচ ক'রে আমি শাড়ীই কিনেছিলাম, ন্যাকড়া কিনি নি। এর পর অনুসন্ধান দ্বারা আমি জানতে পারি, লোকটা

একটা ঠগী। হাতসাফাইএর সাহায্যে আসল শাড়ীটা সরিয়ে ফেলে একটা ন্যাকড়া কাগজের মোড়কে পুরে দিয়ে সে আমাকে ঠকিয়েছে। এ ছাড়া, যে সকল ভদ্রসন্তানকে ঐ লোকটার কাছ থেকে আমি কাপড় কিনতে দেখেছিলাম তারাও না'কি ঐ লোকটারই দলের লোক। এরা না'কি ছিলো সব ঝুটা বা জাল ক্রেতার দল। এই সব জাল ক্রেতারা কখনও বা ভীড় ক'রে কখনও বা ঐ ভাবে নিরীহ পথচারীকে প্রলুব্ধ ক'রে বস্ত্রবিক্রেতাকে লোক ঠকানোর কার্য্যে সাহায্য ক'রে থাকে।"

সম্প্রতি কতিপয় নীলামদার এক নূতন পদ্ধতিতে লোক ঠকাচ্ছে। এরা ঘণ্টা বাজিয়ে চার গজের এক পিস কাপড় হাতে তুলে চীৎকার করে, 'চার টাকা, চার টাকা।' কিন্তু প্রলুব্ধ ক্রেতারা চারি টাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া মাত্র তারা পুরা পিস না দিয়ে এক গজ মাত্র কাপড় তা থেকে কেটে বা ছিঁড়ে তা ক্রেতাদের প্রদান করে। প্রতিবাদ করলেও তারা ঐ অর্থ আর কাহাকেও ফেরত দেয় নি।

ইরাণী প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত দলের মেয়েরাও প্রায়ই তাদের পুরুষদের শিক্ষামত গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী এসে টাকার ভাঙানী বা রেজগী সরবরাহ ক'রে থাকে। গৃহস্থ-কন্যাগণ এদের নিকট হ'তে রেজগী (সিকি দু'আনি ইত্যাদি) গুণে গুণে বুঝে নেন, কিন্তু এরা চলে যাবার পরই তাঁরা পুনরায় ঐগুলি গুণে দেখেন, প্রায় কুড়ি টাকার ভাঙানির মধ্যে প্রায় ছয় বা সাত টাকার মত রেজগী কম পড়ছে। সাধারণতঃ হাতসাফাইএর সাহায্যে এই ইরাণী মেয়েরা রেজগীগুলি অপহরণ করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সময় এজন্যে তারা হাতের চেটোয় আঠা মাখিয়ে রাখে। এদের কেহ কেহ হাতের চেটোর মধ্যাংশ সঙ্কোচন ক'রে * রেজগীগুলি

* ভেকুয়ম তৈরী করে।

আকর্ষণ (suction) করতেও সক্ষম—অভ্যাস দ্বারা অনায়াসে এইরূপে দ্রব্যাদি আকর্ষণ করা সম্ভব। এইরূপ অবস্থায় রেজগীগুলি হাতের চেটোর মধ্যে সংলগ্ন হয়ে থাকে। কখনও কখনও এরা বচন-বিন্যাস দ্বারা গৃহস্থকন্যাদের অন্যমনস্ক ক'রে বা তাদের মন অন্যদিকে আকৃষ্ট ক'রে কাজ হাসিল ক'রে থাকে।

এইরূপ পদ্ধতি দ্বারা অর্থ অপহরণ করাকে চুরি কিংবা জুচ্চুরী বলা হবে তা বিবেচ্য। এঁদের কেহ কেহ পিত্তলের কতকগুলি দানা সোনার দানা বলে' গৃহস্থকন্যাদের নিকট সোনার দরে বিক্রয়ও ক'রে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা কয়েকটি আসল সোনার দানা পরীক্ষার্থে গৃহস্থকন্যাদের নিকট রেখে যায়। স্বর্ণকারের সাহায্যে ঐগুলি সত্যই সোনার দানা কি'না তা যাচাই ক'রে নিয়ে গৃহস্থ-কন্যাগণ ঐ দানাগুলি কিনতে মনস্থ করেন, এই ক্রয়-বিক্রয়ের সময় দরে বনিবনা হচ্ছে না, এইরূপ ভাণ ক'রে এরা গৃহস্থ-কন্যাদের নিকট হ'তে দানাগুলো চেয়ে নিয়ে তাদের চক্ষের সামনেই হাতসাফাইএর সাহায্যে সোনার দানাগুলি বেমালুম ভাবে সরিয়ে ফেলে তারা সেইস্থলে মুঠির মধ্যে কতকগুলা পিত্তলের দানা এনে—সেই পিত্তলের দানাগুলা গৃহস্থ-কন্যাগণকে পুনরায় ফেরৎ দেয়। গৃহস্থ-কন্যাগণ ঐ গুলাকেই পূর্ব্বেকার সোনার দানা মনে ক'রে পুনরায় তাদের সহিত দর কষাকষি সুরু করেন। দুর্ব্বৃত্ত স্ত্রীলোকেরা এই সুযোগে গৃহস্থ-কন্যাদের প্রস্তাবিত বা ঈপ্সিত মূল্যেই দানাগুলি (Beads) বিক্রয় করতে রাজী হ'য়ে সোনার বদলে কতকগুলি পিত্তল গৃহস্থ-কন্যাদের গছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। মাড়োয়ার বাউরি এবং বগরি মাঘেরা নামক স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত দলের মেয়েরা এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে প্রায়ই গৃহস্থ-কন্যাদের ঠকিয়ে থাকে। প্রবঞ্চনায় এই বিশেষ পদ্ধতিকে কেহ কেহ দানা-কুল পদ্ধতি বা বিড্ সুইগুলিঙ বলে থাকেন।

এদেশে প্রচলিত ভিক্ষা ও দানপ্রথা এই সাধারণ প্রবঞ্চনার প্রধান সহায়ক। দান করাকে আমরা পরলোকের জন্য পাথেয় সংগ্রহের সামিল মনে করি—দানের সব কয়টি মুদ্রাই পরলোকের কোনও ব্যাঙ্কে যেন জমা পড়ছে। দানের সাহায্যে পুণ্যসঞ্চয় বা পাপক্ষয়ের মনোবৃত্তির সুযোগ প্রবঞ্চকরা এদেশে হামেসাই নিয়ে থাকে। এদের কেহ কেহ সাধু বা ফকিরের বেশে জনসাধারণের নিকট প্রচার করে, তারা কোনও এক পুরান মন্দির বা মসজিদ সংস্কারের জন্যে অর্থভিক্ষা করছে, এদের কেহ কেহ অবলা আশ্রম, গোশালা নির্ম্মাণ বা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যেও অর্থসংগ্রহ করে থাকে। আসলে কিন্তু এরা উদরসেবা বা উদরপূজা করে মাত্র, এইরূপ ভাবে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা। প্রদেশের কোনও এক দূর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা মহামারীর সংবাদ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হলে, এদের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়, এবং এই সুযোগে তারা অত্যন্তরূপ কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠে। এদের কেহ কেহ কোনও এক নামকরা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জাল এজেণ্ট সেজেও অর্থ ভিক্ষা ক'রে থাকে। এঁদের প্রায়ই প্রতিষ্ঠান বিশেষের নামাঙ্কিত মোহর দেওয়া বাক্স নিয়ে রাজপথে ঘুরাফিরা করতে দেখা গেছে। এদেশের ভাত্রা, কালান্দার প্রভৃতি স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত দলেরাও এইরূপ প্রবঞ্চনার দ্বারা অর্থাপহরণ ক'রে থাকে।

এ ছাড়া এমন অনেক ঠগী দুর্ব্বৃত্ত দল আছে, যারা জনসেবক বা দেশভক্ত সেজে গ্রামে গ্রামে মানুষের দুঃখ লাঘব করবার অছিলায় ঘুরে বেড়ান। এঁদের অনেকে প্রায়ই শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত হয়ে থাকেন। এঁরা গ্রামে গ্রামে সভা ক'রে দরিদ্রগণকে তাদের ঋণভার লাঘব ক'রে মহাজনদের কবল হ'তে তাদের রক্ষা করবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাঁদা আদায় ক'রতে থাকেন। এঁরা গ্রামবাসীদের বুঝান, কর্ত্তৃপক্ষের

নিকট আবেদন পেশ ক'রে দুঃখ জানাতে হলে এই অর্থের প্রয়োজন আছে। এঁরা মহাজনদের সহিত দেখা ক'রে সমিতির পক্ষ থেকে ভয় দেখিয়ে খাতকদের নিকট হ'তে ক্ষেপে ক্ষেপে তাঁদের অর্থ আদায় করতে বলেন, অপরদিকে এঁরা খাতকদের নিকট হ'তে 'ফি' স্বরূপ আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে তাদের ইনসলভ্যান্সি ফাইল করবার জন্যেও পরামর্শ দেন। এইভাবে মহাজনদের নিকট হ'তে ঘুস্ (উৎকোচ) স্বরূপ এবং খাতকদের নিকট হ'তে চাঁদা ও 'ফি' স্বরূপ অর্থ আদায় ক'রে হঠাৎ একদিন এঁরা গ্রাম ত্যাগ ক'রে চলে যান—মহাজন ও খাতকদের মধুর সম্পর্ক চিরদিনের জন্য বিনষ্ট ক'রে দিয়ে। এই সব প্রবঞ্চক দুর্বৃত্তদের নাম দেওয়া হয়েছে—"ডেট্ রিলিফ প্রোপোগাণ্ডিষ্ট" বা হিতৈষী প্রবঞ্চক দল।

ঠগী ভিখারী

সাধারণ প্রবঞ্চনা অপরাধের মধ্যে ঠগী ভিখারিগণ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। সাধারণতঃ এরা ভিক্ষা দ্বারাই মানুষকে প্রতারিত করে, নগরে নগরে তথাকথিত বহু দরিদ্র ভদ্রলোক বা ভদ্রকন্যাকে আমরা ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। এঁরা প্রায়ই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা না'কি পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। অনেক সময় এঁরা মিথ্যা বলে কোনও এক নামকরা লোকের নিকট আত্মীয়ও সেজে থাকেন। কেহ কেহ নামজাদা ব্যক্তিদের সই করা জাল পরিচয় পত্রও এই জন্যে যোগাড় করেছেন। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতি প্রণিধানযোগ্য।

"একদিন অফিস থেকে বাড়ী ফিরে দেখি, একজন প্রৌঢ়া মহিলা আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাকে দেখে মহিলাটি মাথার

কাপড়টা আরও একটু নামিয়ে দিলেন, সলজ্জভাবে; কিন্তু পরে নিজেই তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। কথায় কথায় আমার পরিচয়টা জেনে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'হা আমার কপাল, তুমি তা হলে মধুবাবুর নাতি। উনি যে আমার মেসো হতেন।' এর পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি অনেক কথাই বলে' চললেন। যথা—'আর বাবা, সেদিন কি আর আছে? না বাবা, বড় মানুষ আত্মীয়দের কাছে আর যাব না। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম দেখো, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, রক্তের টান যাবে কোথা?' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য নগদ দশ টাকা সাহায্য নিয়ে সেদিন তিনি আমায় রেহাই দেন। এর পরের দিন তাঁর প্রদত্ত ঠিকানায় আমি খোঁজ ক'রে জানতে পারি, সেরূপ কোনও ব্যক্তি ঐ ঠিকানায় কস্মিনকালেও ছিলেন না।"

কলিকাতা শহরে প্রায়ই ভদ্রবেশী মহিলাদের রুগ্ন শিশু ক্রোড়ে ভিক্ষা করতে দেখা গেছে। অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভিখারীদের নিকট হতে ঐ সকল রুগ্ন শিশুকে তাঁরা ভাড়া ক'রে এনেছেন। মাতা এবং শিশুটির স্বাস্থ্যের দিকে দৃক্‌পাত করে তুলনামূলক ভাবে বিচার করলেই প্রকৃত তথ্যটি প্রতীয়মান হবে। শুনা গেছে, যে শিশুটি যত বেশী রুগ্ন তার ভাড়া না'কি তত বেশী হয়ে থাকে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একভাবে নিশ্চল অবস্থায় শুইয়ে রাখবার জন্যে এই সকল শিশুদের কাহাকে কাহাকে অহিফেন মিশ্রিত জলও খাওয়ান হয়।

সাধারণ ভিখারীরাও অনেকে প্রবঞ্চনার দ্বারা ভিক্ষা বৃত্তি ক'রে থাকে। আমি এমন এক ভিখারীকে জানতাম, যাকে কি'না পায়ে পুরু ন্যাকড়া জড়িয়ে ছিন্নবাসে সারাদিন ভিখারীদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা

যেতো, কিন্তু সন্ধ্যার পরই সে তার রক্ষিতার গৃহে ফিরে দামী সাবানের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে, সিল্কের পাঞ্জাবী পরে বিজলী পাখার তলায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে রাত্রি যাপন করতো, এমন কি তার সিনেমা দেখারও সখ ছিল। 'ভিখারী সমাজ' সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এক্ষণে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শহরের ভদ্র দুর্বৃত্ত দালালেরা ভদ্র গৃহস্থদের ঠকাবার জন্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব ভিখারীদের সহায়তা কামনা করে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"শুনুন বলি, কি ক'রে আমি ভদ্রলোকটির নিকট হ'তে দেড় হাজার টাকা আদায় করি। একদিন রাত্রে একজন ভিখারী নয়া রাস্তার উপর শুয়েছিল, কম্বল মুড়ী দিয়ে। ভদ্রলোক সাবধানেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝ রাস্তার উপর কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকায় তিনি মানুষটাকে দেখতে পান নি। এ ছাড়া হঠাৎ গাড়ীটাকে তার দিকে আসতে দেখে সে উঠে পড়ে ছুট দেয়। এই ভাবে হঠাৎ সে'ই গাড়ীর সামনে এসে পড়েছিল। তাকে বাঁচাবার জন্যে ভদ্রলোক চেষ্টার কোনওরূপ ত্রুটি করেন নি। পুলিশ তদন্ত দ্বারা ভদ্রলোককে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন। এই সময় আমি শ্যামবাজার থেকে এক ভিখারী কন্যাকে সংগ্রহ ক'রে, তাকে নিহত বৃদ্ধার কন্যা সাজিয়ে, তাকে দিয়ে ভদ্রলোকের নামে আদালতে একটা মামলা রুজু করিয়ে দিই। গৃহহীন আত্মীয়-বিহীন বৃদ্ধা ভিখারীর হঠাৎ একজন ওয়ারিশ এসে জোটায় ভদ্রলোক এবং তদন্তকারী পুলিশ উভয়েই অবাক হয়ে যায়। এর পর আমি সুযোগ মত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'রে, তাকে উক্ত সাজানো কন্যাকে তিন হাজার টাকা দান করে মামলাটি মিটিয়ে নিতে বলি। ভদ্রলোকটিও ছিলেন ভদ্রলোক মাত্র, আদালতের ঝঞ্চাটে তিনি লিপ্ত হতে চাচ্ছিলেন না—

কে-ই বা আর তা চায়। ভদ্রলোক আমার মারফৎ ভিখারী মেয়েটিকে তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দান করেন। এই অর্থ হ'তে আমি মাত্র দুই শত টাকা ঐ মেয়েটিকে, এই অপকার্য্যে আমাকে সাহায্য করার জন্যে পারিশ্রমিক স্বরূপ দিই এবং পূবা অর্থ বাবদ একটা সাদা কাগজে মেয়েটির টিপসহি নিয়ে বাকি টাকাটা আমি নিজেই আত্মসাৎ করি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সাজানো কন্যার কান্না দেখে অভিভূত হয়েও এই সব ধনী মোটরবিহারী ভদ্রলোকেরা অর্থ প্রদান করেছেন। অনেক সময় সাজানো কন্যাগণ দ্বারা ওয়ারিশবিহীন মানুষদের দাহ কার্য্যও সমাধান করানো হয়েছে। এর দ্বারা সহজেই এদের মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সাজানো সম্ভব হয়।"

[এই সব ভিখারীরা নানারূপে ভদ্র গৃহস্থদের ঠকিয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিলাতী গল্পের অবতারণ করা যাক। ওদেশে মিউনিসিপালিটি বা করপোরেশনের লাইসেন্স ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তি দণ্ডনীয়। ওদেশের কোনও এক শহরে এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। লোকটির বুকের উপর করপোরেশনের মোহর অঙ্কিত একটি বোর্ড ঝুলানো ছিল। বোর্ডটিতে লেখা ছিল—"অন্ধ।" কোনও এক পথচারী দয়াপরবশ হয়ে লোকটিকে একটি মুদ্রা দান করেন। মুদ্রাটি হাতে পেয়ে খুশী মনে অন্ধটিকে উহা নিরীক্ষণ করতে দেখা যায়। ভদ্রলোকটি এইরূপ ভাবে অন্ধকে চেয়ে থাকতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেন, "তবে না বেটা, তুই অন্ধ।" ঠগী ভিখারিটি এতে বিব্রত হয়ে না'কি বলে উঠেছিল, "আজ্ঞে না, আসলে আমি কালা (বধির) অন্ধ নই, করপোরেশন লিখতে ভুল করেছে।" এর পর পথচারী ভদ্রলোকটি অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে ধমকে উঠেন, কি বল্লি ? ফের মিথ্যে কথা !" ভিখারী লোকটা কেঁদে ফেলে না'কি উত্তর দিয়েছিল,

"আজ্ঞে না, আমি কালা নই, আমি স্যার, একজন বোবা (মূক)।"

কলিকাতা সহরের ন্যায় বড় বড় সহরে বংশ তালিকা তো দূরের কথা, কাহারও প্রকৃত নাম ও পিতার নাম সংগ্রহ করাও দুষ্কর। দুই পুরুষ গৃহহীন পরিচয়হীন ভাবে বাস করছে, এমন লোকেরও এখানে অভাব নেই। এই কারণে এইরূপ কোনও এক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সেজে লোক ঠকানো এখানে সহজসাধ্য। এইরূপ প্রবঞ্চনার কার্য্যে, দুর্ব্বৃত্তদের সহরের কোনও কোনও অসৎ উকিল ও মুহুরীরা প্রায়ই সাহায্য ক'রে থাকেন, অধিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। কোনও এক মোটর দুর্ঘটনার পর দুর্ব্বৃত্তরা মোটর চালকদের প্রায়ই ব্ল্যাক-মেইল ক'রে থাকে। এই ভিখারীদের কথা বাদ দিলে গরীব বস্তীবাসী গৃহস্থরাও এ বিষয়ে পিছপাও নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, আহত ব্যক্তির পিতামাতাও এই কার্য্যে দুর্ব্বৃত্তদের অর্থ প্রাপ্তির আশায় সাহায্য করেছে। এমন সব পিতাকেও আমি দেখেছি যে কিনা আপন পুত্র এই ভাবে গাড়ী চাপা পড়ায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন, কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির আশায়।

এমন বহু ভিখারী ঠগী আছে যারা তৈল-রঙের দ্বারা তাদের পদদ্বয় চিত্রিত করে নিজেদের কুষ্ঠরোগীরূপে প্রচার করেছে। রঙিন মোমের সাহায্যে তারা চামড়ার উপর ক্ষত তৈরী করে থাকে। এই ভিখারী ঠগীদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাক। নিম্নের কাহিনী দুটি হ'তে এই ভিখারী ঠগীদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাবে।

"মৌলালীর নিকটস্থ কোনও এক স্থানে, ফুটের উপর জনৈক বৃদ্ধ অন্ধকে প্রায়ই ভিক্ষা করতে দেখা যেত। প্রতিদিন একজন বালকের স্কন্ধে ভর ক'রে তিনি অতি কষ্টে অকুস্থলে হাজির হতেন। সন্ধ্যার সময় যথারীতি এই বালকটিই বৃদ্ধকে হাতে ধরে গৃহে নিয়ে যেত। এদিকে

কলিকাতা পুলিশে খবর এল, বৃদ্ধটি একেবারেই অন্ধ নয়, আসলে সে এক পিকপকেট দলের সর্দ্দার, আশ্রয়দাতাও। বহু বালককে সে ভুলিয়ে এনে আশ্রমে ভর্ত্তি করেছে, এবং তার আড্ডায় খোঁজ করলে না'কি 'চুরি ক'রে আনা অনেকগুলি অপরিণত বয়স্ক বালকেরও' সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

সেদিনও সন্ধ্যার পর একটি ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত মলিন ও অনাহারক্লিষ্ট বালকের স্কন্ধে ভর ক'রে, যষ্টি হস্তে নুইয়ে পড়া দেহটাকে অতি কষ্টে উপরে তুলে তাকে ধীরে ধীরে পথ চলতে দেখা গেল। এদিকে পুলিশ যে তাকে অনুসরণ করছে তা সে আদপেই বুঝতে পারে নি। বৃদ্ধের পিছন পিছন পুলিশও একটি নোঙরা বস্তির মধ্যে এসে পৌছল। বাস-গৃহের কাছে এসে বৃদ্ধটি চোখ দুটা দুই হাতে একবার কচলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাট-কোঠার মধ্যে তখন ভাগ বাঁটোয়ারা চলছিল, চোরাই মাল সহ অনেকগুলি ছোকরাকেও সেখানে দেখা গেল। ইতিমধ্যে হঠাৎ বৃদ্ধের নজর পড়ল পিছনের গোয়েন্দা পুলিশের দলের উপর। অকুস্থলে পুলিশ দেখে বৃদ্ধ ছুট দিল। এদিকে পুলিশও ছিল প্রস্তুত, বৃদ্ধের পিছন পিছন ধাওয়া করতে তাদের একটুও দেরী হয় নি। আঁকা বাঁকা বস্তির পথ ধ'রে বৃদ্ধ অবলীলাক্রমেই ছুটে চলছিল, তার অন্ধতা সত্ত্বেও। ধরা পড়ার পর বৃদ্ধের চক্ষুর দিকে তাকিয়ে পুলিশ অবাক হয়ে যায়। এতদিন বৃদ্ধের চক্ষুর মধ্যে স্থূল নিষ্প্রভ শ্বেত মাংস পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নি। এক্ষণে তার চক্ষুর শ্বেত অংশের মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণের চক্ষুমণি দুইটি প্রকট হয়ে উঠেছে, তাকে আর অন্ধ বলা যায় না।

এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে পুলিশ জানতে পারে যে বৃদ্ধ বহুদিন ধ'রে কৃচ্ছ্রসাধনা (অভ্যাস) দ্বারা চক্ষু মণি দুইটি এমন ভাবে উপরে উঠাতে পেরেছিল, যাতে করে কি'না উহা বাহির হ'তে কিছুতেই আর পরিলক্ষ্য

হয় না। বৃদ্ধ চক্ষুর মণি দুইটি একবার উপরে উঠিয়ে এবং একবার নিম্নে নামিয়ে তার এই বিবৃতির সত্যতাও প্রমাণ করে।" এইবার অপর কাহিনীটি সম্বন্ধে বলা যাক্।

"কোনও এক জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর নিকট একটি মূক (বোবা) বালক ভিক্ষার জন্যে আসে। তার মুখ বিবরের মধ্যে জিহ্বার বদলে একখণ্ড স্থূল মাংসপিণ্ড দেখা যায় মাত্র। কোনও এক বিশেষ কারণে সেক্রেটারী ভদ্রলোকের মনে সন্দেহ জাগে এবং তিনি বালকটিকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন। ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় ছেলেটি আদপেই মূক (বোবা) নয়। আসলে সে বহুদিনের অভ্যাস দ্বারা জিহ্বাটি এমন ভাবে ভিতরের দিকে গুটিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, যাতে ক'রে কি'না আপাতঃ দৃষ্টিতে তাকে মূক (বোবা) বলেই মনে হয়।"

এই ভাবে ভিখারী ঠগীরা নগরবাসীদের প্রায়ই প্রতারিত ক'রে থাকে। এমন অনেক ভিখারী আছে যারা তাদের হাতের ও পায়ের ক্ষত আদি কিছুতেই নিরাময় হতে দেয় না। অনেকে আবার ভিক্ষা না দেওয়ার কারণে তার ক্ষতপূর্ণ হস্ত দ্বারা নগরবাসীদের জড়িয়ে ধরে' তাদের ভয় দেখিয়েছে, এমন অনেক কাহিনীও শুনা গেছে। এই সকল ভিখারীদের অপরাধী ছাড়া আর কি'ই বা বলা যেতে পারে।

এই ভিখারীরা মূলতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, 'একক ও সমাজবদ্ধ'। ভিখারী সমাজ ও উহার সংঘটন সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি ভিখারী কর্তৃক প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে মাত্র বলতে চেয়েছি। ভিখারীদের প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে অপর একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হল'।

"একদিন আমি ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন এগারো বৎসর বয়স্ক একটি বালক আমার পথ রোধ ক'রে সাহায্য

ভিক্ষা করল। আমি একে একে তাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম, সে এমন ভাবে সেইগুলির উত্তর দিল যে আমার মন করুণায় ভরে' উঠল। তার কাহিনীটুকু আমি নিম্নে তুলে দিলাম।

—'হাঁ মশাই, দুই বছর পূর্ব্বে, আমি তখন খুবই ছোট। আমার পিতাকে মনে পড়ে বই কি, তিনি আমাদের কত-ও ভালবাসতেন, মাকেও। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর চাকরী যায়, এবং আরও কিছুদিন পরে, হঠাৎ তাঁকে মার সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখি, আমাদেরও তিনি কটু কথা বলেন। এর পর প্রায়ই তাঁকে রাত্রে বাড়ী ফিরতে দেখিনি। গত দুই বছর হ'ল কোথায় তিনি উধাও হয়ে গেছেন। হাঁ, মার খুব অসুখ, ছোট ভাইটারও, সে বোধ হয় বাঁচবে না। সাত মাস বাড়ী ভাড়া বাকী, কাল বোধ হয় আমাদের তাড়িয়ে দেবে। হাঁ, এই পানের খিলিগুলা বিক্রী হ'লে ভাইটার জন্যে একটু দুধ কিনব। মায়ের ঔষধ, না তা আর কেনা হবে না, পয়সা কই ?'

এর পরের দিনই ছেলেটির সহিত আমার পুনরায় দেখা হয়। এদিন সে আর আমাকে চিনতে পারে নি। সে আমার কাছে এগিয়ে আসে, ভিক্ষা চায়; কিন্তু আমি অবাক হয়ে শুনি তার কাছে অপর একটি সম্পূর্ণরূপ নূতন কাহিনী। পূর্ব্বের কাহিনীটির সহিত পরের এই কাহিনীর একটু মাত্রও মিল ছিল না। আমি অবাক হয়ে যাই, এত মিথ্যে কথাও বলতে পারে ঐটুকু একটা ছেলে—"

এই ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে অপর আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

আমি প্রায়ই দেখতাম এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত উপায়ে ভিক্ষা করছে। লোকটি সাষ্টাঙ্গভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে প'ড়ে সম্মুখে একটা দাগ কেটে উঠে পড়ছিলো, এর পর সেই দাগ বরাবর পা রেখে দাঁড়িয়ে আবার সে ভূমি চুম্বন করছিল। এইরূপ ভাবে না'কি সে কোনও এক তীর্থ পর্য্যন্ত

যাবে—ঠাকুরের কাছে মানত করতে। প্রতিবারেই সেই ভিক্ষার রেকাবীটা সম্মুখে রেখে দিচ্ছিল, এবং সেখানে পয়সাও পড়ছিল বিস্তর। নিয়ম মত তাকে না'কি ভিক্ষা করতে করতে এই ভাবে গণ্ডি কাটতে কাটতে তীর্থে যেতে হবে। আমি কিন্তু দেড় মাসের মধ্যেও তাকে সহর ত্যাগ ক'রে তীর্থের দিকে একটুও এগুতে দেখি নি। এইরূপ ভিক্ষাকে প্রতারণা ছাড়া আর কি'ই বা বলা যাবে।

বোগাস্ সার্ভিস বুরো

মিথ্যা প্রলোভন দ্বারা চাকুরী দিবার অছিলায় প্রতারকরা সহরের বেকার যুবকদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। অধুনা কালে বেকার যুবকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়েই বর্দ্ধিত হচ্ছে। এই জন্যে কলিকাতা সহরে চাকুরী দিবার লোভ দেখিয়ে দুর্ব্বৃত্তেরা প্রায়ই বেকার যুবকদের ঠকিয়ে থাকে। এই শ্রেণীর একজন দুর্ব্বৃত্তের একটি বিবৃতি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে।

"আমি এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারাই লোক ঠকিয়ে খাই। প্রথম প্রথম আমি বেকার যুবকদের জানাতাম, অমুক অফিসের হেড্ ক্লার্ক আমার আত্মীয়। তবে ছোট সাহেবকে দেড়শো টাকা ঘুষ দেওয়া চাই, তা না হলে, ইত্যাদি। ঐ টাকাটা পেলেই তিনি সত্তর টাকা মাইনের একটি চাকুরী পেতে পারেন। বেকার যুবকগণ এর পর মায়ের গহনা বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় ক'রে তা আমাকে এনে দিত, এই আশায় যে চাকরী হ'লে মাইনে হ'তে প্রতি মাসে কিছু কিছু বাঁচিয়ে মার টাকা কয়টা তারা শোধ ক'রে দেবে। এই ভাবে বহু বেকার যুবকদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ আমি আত্মসাৎ করেছি। হতভাগা যুবকগণের একবারও মনে আসে নি যে, চাকুরী জোগাড় করে দেবার ক্ষমতা যদি আমার

থাকত, তাহলে আমি নিজে এমনি ভাবে বেকার জীবনযাপন করছি কেন? এই ভাবে আরও কিছুদিন লোক ঠকানোর পর আমি আমার কার্য্য পদ্ধতির কিছুটা অদল বদল করি। এই সময় আমি বেকার যুবকদের জানাতাম, আমি রাইটার্স বিল্ডিংএর একজন অফিসর এবং তাদের আমি ভাল ভাল চাকুরী যোগাড় করে দিতে সক্ষম। আমি সাধারণতঃ এদের এই বড় অফিসের গেটের সামনে নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে বলতাম। ঐ সময় আমি (গোপনে) পিছনের গেট দিয়ে ঢুকে সামনের গেটে এসে এদের সঙ্গে দেখা করতাম, এমন ভাব দেখিয়ে, যেন এই মাত্র আমি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছি। বড় বড় অফিসের চাপরাশী সকল (অর্থের বিনিময়ে) সর্ব্বসমক্ষে আমাকে সেলাম জানিয়ে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্যও করেছে। এই-ভাবে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হয়। এখন আমি নিজেই একটি সাজানো অফিস খুলেছি। "কর্ম্মখালি আছে, এক টাকার টিকিট সমেত দরখাস্ত চাই, জমার জন্যে দেয় মাত্র ২০০৲ টাকা"—ইত্যাদি লিখে কাগজে কাগজে আমি বিজ্ঞাপনও দিয়েছি। এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমি দরখাস্ত পেয়েছি প্রায় ২৭০ খানি, আর সেই সঙ্গে জামিনের টাকাও পেয়েছি অনেক। ভাবছিলাম এইবার আমরা পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ব, আর এই সময়ই কি'না আপনারা এসে হাজির হলেন।"

অধুনাকালে এই অপরাধ এক নূতন পদ্ধতিতে কলিকাতা শহরে সুরু করা হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা এই পদ্ধতিকে বলে থাকি জব-চিটিঙ্ (Job cheating)। এই বিশেষ প্রবঞ্চনার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দূর দূর দেশ থেকে দুস্থ যুবকদের এই শহরে এনে তাদের এক অভিনব পদ্ধতিতে ঠকানো হয়ে থাকে। এই সকল যুবকদের কেহ কেহ বিধবা মাতার শেষ সম্বল গহনা পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়ে বা বিক্রি করে এই

কষ্টলব্ধ অর্থ এই সকল দুর্বৃত্তদের হাতে সরল বিশ্বাসে তুলে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নি। এই অপপদ্ধতি দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমরা একটি ঝুটা ব্যবসা কেন্দ্র খুলে কোনও এক অবসরপ্রাপ্ত খেতাবধারী হাকিম বা সুপারকে মোটা মাইনের সেক্রেটারী বা ডিরেক্টার নিযুক্ত করতাম। তারপর কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ত,— 'মাসিক একশত টাকা বেতনে বহু ক্যানভেসর ও শেয়ার বিক্রেতা চাই; কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণে একশত (বা দুই শত) টাকা সিকিউরিটি মনি জমা দিতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর অমুকের নিকট আবেদন করুন।' রায়সাহেব প্রভৃতি খেতাবধারী সরকারী কর্ম্মচারীর পূর্ব্বতন পদমর্য্যাদার জন্যে নিঃসন্দেহে বহু ব্যক্তি অফিসে এসে অর্থ সহ ধন্না দিত। ঐ সকল রায়সাহেব প্রভৃতিকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আমাদের এই পাপ মতলব সম্বন্ধে কখনও এতটুকুও আমরা জানাই নি। তিনি পর্দ্দা ঘেরা অফিসে বসে কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ নির্দ্দোষ নথীপত্রে সই করে যেতেন। এদিকে আমাদের নিকট কয়েকটি শেয়ার ক্রয় সম্বন্ধে বহু তথ্য সহ ছাপা ফর্ম্ম থাকত। আমরা ঐ সকল ব্যক্তিদের অর্থ গ্রহণ করে চালাকীর সহিত এমন সব কাগজপত্রে তাদের দিয়ে সই করিয়ে নিতাম যাতে প্রমাণ করা যাবে যে তারা আমাদের ফার্ম্মের শেয়ার মাত্র ক্রয় করেছে, চাকুরীর জন্য এখানে তারা কোনও অর্থ সিকিউরিটি রূপে জমা দেয় নি। বলা বাহুল্য যে আমাদের ধাপ্পাবাজীতে তারা না পড়েই প্রতিটি ছাপা ফর্ম্মে একটি করে দস্তখত করে দিত। এর পর আমরা তাকে কয়েকটি বাজে দ্রব্য দিয়ে তা বাজারে চালাতে বলতাম এবং তা তারা স্বভাবতঃই চালাতে পারে নি। ইতিপূর্ব্বে বাজারে জিনিস চালাতে না পারলে, তাকে বিদায় দেওয়া হবে এইরূপ এক ছাপা কাগজেও আমরা

সই করিয়ে নিয়েছি। এই সব কারণে তারা আমাদের নামে মামলা করে তাদের পূর্ব্ব অর্থ কোনও দিনই আদায় করতে পারে নি।"

প্রবঞ্চনা—অন্যান্য

"রেশন্‌ড্ এবং কণ্ট্রোলড্ দ্রব্যাদি, যথা—কাপড়, চিনি, তৈল ইত্যাদির জন্যে পারমিট্ বা ছাড়পত্র কিংবা বাড়ী বা গাড়ী সংগ্রহ করে দিব"—এই অজুহাতেও খাদ্য এবং দ্রব্য রেশনের যুগে দুর্ব্বৃত্তরা দেশবাসীদের অর্থাপহরণ করে থাকে। "অমুককে এত টাকা দিতে হবে বা অমুকের সঙ্গে আমার এইরূপ হৃদ্যতা আছে"—এইরূপ বচন বিন্যাস দ্বারা দুর্ব্বৃত্তরা সরল চিত্ত ব্যবসায়ীদের নিকট হ'তে বহু অর্থই আদায় করেছে। কখনও এই সব দুর্ব্বৃত্তরা সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের জাল অফিসার সেজে পল্লী অঞ্চলে সফরে বাহির হয়। সঙ্গে থাকে গভর্ণমেণ্টের মোহর অঙ্কিত তক্‌মা আঁটা জাল চাপরাশী। এই পিতলের চাপরাশটি তারা বাজার হ'তে তৈরী করিয়ে নিয়ে থাকে। এই ভাবে মফস্বলের দোকানগুলিতে হানা দিয়ে উৎকোচ স্বরূপ তারা প্রায়ই অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দোকানদাররা ভয়ে ভক্তিতে প্রথমতঃ এঁদের জলযোগের যোগাড় করে দেয়, এবং পরে এঁদের নির্দ্দেশমত চাপরাশীকেও খাইয়ে দেয়। এর পর এরা পারমিট্ আদি প্রাপ্তির আশায় অর্থাদি উৎকোচ দিয়ে এঁদের কাছেই "ফি" বাবদ টাকা জমা দেয়। এরা যথারীতি অকুস্থলেই রসিদ পায়, কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা করেও এরা ডাকঘরের মারফৎ কোনও পারমিট্ বা ছাড়পত্র কখনও পান নি।

এ ছাড়া জাল পুলিশ এবং জাল ইন্‌কাম্ ও সেল-ট্যাক্স অফিসার সেজেও দুর্ব্বৃত্তরা প্রতারণা করে থাকে। জাল পুলিশ সেজে খানাতল্লাসী

করে দুর্বৃত্তরা যথারীতি সাক্ষীর সামনে লিষ্ট করে গৃহস্থদের অলঙ্কারাদি (চোরাই মাল, এইরূপ সন্দেহে) অপহরণ করে সরে পড়েছে, এইরূপ কাহিনীর কথাও শুনা গেছে।

কোনও কোনও প্রতারণা অপরাধ এমন সাবধানে পরিকল্পিত হয়, যাতে করে কি'না তারা (প্রতারকরা) সহজেই প্রচলিত দণ্ডবিধিকে এড়িয়ে চলতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"একদিন অফিস ঘরে বসে আছি, এমন সময় একটি দালাল ভদ্রলোক এসে হাজির। কিছুদিন যাবৎ ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা চলছিল। তিনি আমাকে জানান যে, খড়্গাপুরের কোনও এক বড় রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর একটি ফায়ার ইঞ্জিন কিনতে চান, তাঁর কণ্ট্রাক্টের কাজের জন্যে। এ জন্য নাকি তিনি চল্লিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করতে রাজী আছেন। আপাততঃ তিনি এ জন্যে কোলকাতায় এসে অমুক হোটেলে বাসা নিয়েছেন, ইত্যাদি।

এর পর আমি দালাল ভদ্রলোকের পরামর্শ মত কিছু দাঁও মারবার আশায় সারা সহর উক্ত রূপ ইঞ্জিনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু ঐরূপ কোনও পুরানো ইঞ্জিনেরও সন্ধান পাই না। এর পর দালাল ভদ্রলোক আমাকে একটি নামকরা ওয়ার্কসপে এনে হাজির করে। এখানে আমরা কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের একটি ইঞ্জিনের সন্ধান পাই। আর তৎক্ষণাৎ অমুক হোটেলে এসে উক্ত কণ্ট্রাক্টারের সহিত মুলাকাৎ করি, তাঁর আদবকায়দা ও ভদ্রতাও আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরের দিন ব্যবস্থামত কণ্ট্রাক্টার মশাই একজন সাহেব ইঞ্জিনিয়ারসহ আমাদের সমক্ষে ইঞ্জিনটি পর্য্যবেক্ষণ করে মত দেন যে চল্লিশ হাজার টাকায় তিনি উহা কিনতে রাজী আছেন, এবং এও ঠিক

হয় যে আমরা যেন ইঞ্জিনটি ওঁর ওখানে পৌছে দিয়ে প্রাপ্য মূল্য বাবদ চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে আসি। পরের দিন আমি নগদ কুড়ি হাজার টাকা মূল্যে ইঞ্জিনটি ক্রয় করে উহার ডেলিভারী দিতে গিয়ে দেখি উক্ত কণ্ট্রাক্টার মশাই উধাও হয়েছেন। এর পর আমি জানতে পারি যে উক্ত ইঞ্জিনটির আসল মূল্য দুই হাজার টাকারও কম। প্রতারণাটি আসলে কণ্ট্রাক্টার, দালাল এবং জাল ইঞ্জিনিয়ারের যোগসাজসে উক্ত ব্যাপারিটির দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু আইনতঃ এ জন্যে তাঁকে কোনও রূপে দায়ী করা যায় নি।"

এই বিশেষ প্রবঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে অপর আর একটি ফরিয়াদীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমার কাছে একদিন রতনবাবু এসে জানালেন যে, হরি সিং নামক এক বিদেশী ব্যবসায়ী এই নমুনার বহু যন্ত্র সাপ্লাই চায়। কয়েকদিন পরে এই দালাল রতনবাবুই আমাকে নিয়ে বহু দোকানে ঘুরে একটি দোকানে ঐরূপ কয়েকটি যন্ত্র খুঁজে বার করলেন। প্রতিটি যন্ত্রের জন্য ঐ দোকানী মাথুরাম ৫০৲ টাকা চেয়ে বসলেন। ওদিকে কিন্তু দালাল রতনবাবু আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং প্রতিটি যন্ত্র পিছু ১০০৲ টাকা দিতে রাজী। এর পর আমরা ঐ যন্ত্রের নমুনাসহ ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিংএর কাছে উপস্থিত হই। ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং তাঁর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ডিক্সন সাহেব দ্বারা ঐ যন্ত্রের নমুনা পরীক্ষা করিয়ে আমাকে অনুরূপ ৪০০০ পিস্ যন্ত্র তাঁদের সাপ্লাই দেবার জন্য অর্ডার দিয়ে দিলেন। আমি প্রথম লটে ঐরূপ দুই হাজার পিস্ যন্ত্র কিনে আমার গুদামে মজুত করি। কিন্তু তার পরই দেখি ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং তাঁদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছেন। এর পর আমরা বাজারে যাচাই করে

দেখি যে ঐরূপ যন্ত্র বাজারে প্রতি পিসে পাঁচ টাকাও কেউ দিতে চায় না। আমি অচিরে বুঝতে পারি যে, ঐ বাঙালী দালাল, পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ও তার সাহেব ইঞ্জিনিয়ার এবং ঐ মাড়োয়ারী দোকানী প্রভৃতি সকলেই একই দলের দলি। আমি এর পর ঐ মাড়োয়ারী দোকানী নাথুরামের দোকানে এসে তাকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি নির্লজ্জভাবেই উত্তর দিলেন, "আরে আপনি যে বুদ্ধিতে হেরে গেছেন, এই সহজ কথাটাও বুঝছেন না। এখন নিয়ে আসুন আপনার মত আর এক মক্কেলকে ভুলিয়ে আমাদের কাছে। তা'হলে আপনি আপনার হারানো অর্থ তো ফিরে পাবেনই তা ছাড়া আরও পাবেন কিছু হিস্যা বা ভাগ। এর পর আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের নামে কেশ করব জানালে, দোকানী ভদ্রলোক শান্তভাবে উত্তর করলেন, 'আচ্ছা এ সম্বন্ধে আমরা একটা মিটমাট করব, কিন্তু এ সপ্তাহে নয়। আচ্ছা, দিন তো এই কাগজে লিখে আপনার নাম ও ঠিকানাটা, যাতে আপনাকে দুই তিন দিনের মধ্যে খবর দেওয়া যেতে পারে। এই কথা বলে লোকটি একটা ভাঁজ করা কাগজের উপর দিকটা মুঠি করে ধরে তার নীচেটা আমাকে দেখিয়ে দিলে। আমি অর্থনাশের কারণে এমন হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, এবারও আমি তাদের ধাপ্পায় ভুলে সেইখানে আমার নাম ও ঠিকানা স্বহস্তে লিখে দিলাম। এর পর ঐ লোকটি পাশের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ঐ কাগজটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরলে দেখলাম যে, আমার সইয়ের পাশে একটা রেভিনিউ টিকিট এঁটে তাতে ক্রস দেওয়া হয়েছে এবং উহার উপরেই মানানসই রূপে টাইপ করে ইংরাজীতে লেখা রয়েছে, 'আমি অমুকের নিকট হতে এই বাবদ এত টাকা ফিরত পাইলাম।' আমাকে হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে লোকটি অট্টহাসি হেসে বলে উঠল, এই দেখুন দ্বিতীয়বার আপনি ঠকলেন।"

কালীঘাটের কালী মন্দিরের নিকট সম্প্রতি এক অভিনব উপায়ে লোক ঠকানোর পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। এই প্রবঞ্চনার জন্য অজ্ঞ গ্রাম্য তীর্থযাত্রীদেরই বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। এই অপকর্ম্মের জন্য জনৈক দালাল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে একটি সুন্দর ফটো দেখিয়ে বলে যে তার এইরূপ এক ফটো ১৲ টাকা মূল্যে সে তুলে দিতে পারবে। এর পর ঐ দালাল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে একটি ফটোর দোকানে বসিয়ে দিয়ে অলক্ষ্যে সরে পড়ে। তার পর ফটোওয়ালা ক্যামেরায় কোনও প্লেট না দিয়ে মিথ্যা করে ফটো তোলার অভিনয় করে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির নিকট মূল্য চায়। এর পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তি দালালের কথামত তাকে একটি টাকা দেওয়া মাত্র ক্রোধের ভাণ ক'রে ঐ দোকানী বলে উঠে, 'সে কি মশাই, কে বললে এক টাকায় ফটো উঠানো যায়। একখানি ফটো প্লেটের মূল্যই যে ৩৲ টাকা। শীঘ্র নিয়ে আসুন আরও চার টাকা।' প্রবঞ্চিত ব্যক্তি ঐ টাকা না দিতে পারলে তার সেই একটি টাকা তারা ফটো না দিয়েই বাজেয়াপ্ত করে নেয়। তবে যদি বাকি চার টাকা তারা দিতে পারে তাহলে পরে সত্যকার ফটো প্লেট দিয়ে তার একটা মামুলী ফটো তারা তুলে দিয়েছে।

চাকুরী এই বাজারে দুর্লভ হয়ে উঠায় চাকুরী প্রত্যাশী ব্যক্তিদেরই ঠগীরা অধিক সংখ্যায় ঠকাতে সচেষ্ট হচ্ছে। এই সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"ঐ দিন একটা বুইকগাড়ী করে একটি সুবেশ দীর্ঘকায় ভদ্রলোক আমাদের বাটী এসে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক বাবু বাড়ী আছেন। উত্তরে সসম্ভ্রমে আমি তাঁকে জানালাম, 'আজ্ঞে' বাবা তো দিল্লী গেছেন। 'তাই না'কি' একটু চিন্তিত ভাবে ভদ্রলোক বলেন, 'তবে তো মুস্কিল হ'ল। তিনি কার একটি চাকুরীর জন্য বলেছিলেন।

একটা ৪০০৲ টাকা মাহিনার সাব-ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরী। আজই যে ছেলেটিকে দরকার ছিল। আচ্ছা, তিনি ফিরলে এই কার্ডখানা তাঁকে দিও।' ঐ কার্ড খানাটিতে লেখা ছিল, মিঃ এস বোস, B. E. A. N. C. I. E. (cuperhill) Supdt. Eng. আমি বিব্রত হয়ে বললাম, আজ্ঞে আমি একজন B. E., আমার জন্য তিনি বলেছিলেন। এখুনি কি যেতে হবে, তা চলুন যাব। 'তাই না'কি! আরে গুড্ গুড্', তবে এস শীঘ্রি, বলে ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে বসল। আমি আর দ্বিরুক্তি না করে একটা স্যুট পরে তাঁর পাশে এসে বসেছি, এমন সময় আমতা আমতা করে তিনি বললেন, 'কিছু মনে করো না, একটা ভুল হয়ে গেল। আমার কাছে অবশ্য একশ' টাকা আছে, কিন্তু আরও দু'শো টাকা চাই। একটা কিছু কিনে ডাইরেক্টার সাহেবকে প্রেজেণ্ট দেওয়া দরকার। দেখতো মার কাছে শ' দুই টাকা হবে কি'না। অগত্যা আমি বাড়ী ফিরে মার কাছ হতে দু'খানা একশ' টাকার নোট এনে ভদ্রলোকের হাতে তা তুলে দিলে, ভদ্রলোকটি বলেন, তা হলে চল মিউনিসিপ্যাল মার্কেটটা ঘুরে যাই। এর পর ধর্ম্মতলায় এসে আমার চুলের দিকে চেয়ে তিনি বলে উঠলেন, আরে এ কি করেছ তুমি। এই রকম একটা ফার্ষ্ট ইম্প্রেশন সাহেবকে তুমি দেবে। ছিঃ যাও চুলটা সেলুন থেকে তাড়াতাড়ি ছেঁটে নাও। আমি তার কথা মত একটা সেলুনে ঢুকে চুল ছেঁটে বেরিয়ে এসে দেখি ভদ্রলোক টাকাসহ ঐ গাড়ী করেই অন্তর্দ্ধান হয়েছেন।"

প্রবঞ্চনার পদ্ধতি সকল বিবিধ রূপের হয়ে থাকে। নিম্নে অপর আর এক প্রকার প্রবঞ্চনা সম্পর্কীয় বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"আমাদের এক বন্ধু সকাল আটটার সময় অমুক বিখ্যাত জহুরীর দোকানে একশ' টাকা ভাঙ্গিয়ে মাত্র দশ টাকা মূল্যের একটা গহনা

কিনে নিয়ে এল। দোকানটি খরিদ্দারবহুল হওয়ায় ঐরূপ বহু একশ' টাকার নোট সেখানে জমা পড়ে। আমরা কিন্তু ঐ একশ' টাকার নোটটির নম্বর পূর্ব্বাহ্নেই টুকে রেখেছিলাম। এর পর বিকাল তিনটায় আমি ঐ দোকানে এসে একটি দশ টাকার নোট দিয়ে পাঁচ টাকা মূল্যের একটি রূপার কৌটা কিনি। ঐ কাউণ্টারের বিক্রেতা আমাকে পাঁচ টাকা ফেরত দিলে আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'এ'কি মশাই আমি যে একশ' টাকার নোট দিয়েছি। ততক্ষণে ঐ দোকানী ঐ দশ টাকার নোটটি বহু একশ টাকা নোটের সঙ্গে মিশিয়ে একই বাক্সে রেখে দিয়েছে। দোকানী এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে আমি আমার নোট বুকে লিখা একশ' টাকার নোটের নম্বরটি তাকে দেখিয়ে বললাম, দেখুন দেখি এই নম্বরের নোটটি আপনাদের ঐ বাক্সে আছে কি'না? দোকানী খুঁজে তার বাক্স হতে ঐ নম্বরের একশ' টাকার নোটটি বার করে অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠলেন, 'ওহো তা'হলে আমারই ভুল হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু ঐ দোকানী যদি তার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকত তা'হলে আমি থানায় এসে নালিশ জানিয়ে পুলিশের সহযোগে ঐ নোট দোকান হতে বার করে প্রমাণ করতাম যে ঐ নোট আমারই।"

মিথ্যা বিজ্ঞাপন

মিথ্যা বা অলীক বিজ্ঞাপন (বোগাস এডভারটাইজমেণ্ট) পত্রিকাদিতে দিয়েও দুর্ব্বৃত্তরা সরল চিত্ত ভদ্রলোকদের ঠকিয়ে থাকে। বিজ্ঞাপন দ্বারা মানুষের মন ভুলিয়ে দুর্ব্বৃত্তরা মন্দ দ্রব্য ভাল বলে প্রায়ই দেশবাসীকে অধিক মূল্যে গছিয়ে দিয়েছে। এই বিজ্ঞাপন বাক-প্রয়োগের কাজ করে। এই কারণেই ইহা সম্ভব হয়। এদের অনেকে

ভি. পি. করে মফস্বলে মাল পাঠায়, কিন্তু আসল মাল না পাঠিয়ে পাঠান নকল মাল, এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। বহুদিন পূর্ব্বে কোনও এক সহরে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় "ছারপোকার অব্যর্থ ঔষধ ; দুই টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠান চাই, এ ছাড়া পত্রের সঙ্গে এক আনা মূল্যের একটা ডাক টিকিটও।" যে সকল ভদ্রলোক এই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী টাকা পাঠিয়েছিলেন, তারা কয়েকদিন পরে "ছারপোকার ঔষধের" বদলে এক পত্র পান। পত্রটিতে এইরূপ লেখা ছিল—"ধরো আর মারো।"

যৌন ব্যাধি ও যৌন-শক্তিহীনতার ঔষধ সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন দ্বারা অধিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের ঠকান হ'য়ে থাকে। এই অপরাধ নিবারণের জন্য বিশেষ একটি আইনও সম্প্রতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ ছাড়া অপর আর একটি অপরাধও এই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে দুর্ব্বৃত্তরা করে থাকে। এই বিশেষ প্রবঞ্চনাকে ইংরাজিতে বলা হয় সাইকেল চেন (cycle chain)। বিজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করা হয়: "পাঁচ টাকা পাঠালে, পঞ্চাশ টাকা পাঠানো হবে।" দুর্ব্বৃত্তরা এজন্য রীতিমত অফিসও খুলে থাকে। এরা মানুষকে বুঝায় যে, এই চেন্ কখনও ছিন্ন হবে না। অনন্ত কাল ধরে এক দল টাকা দেবে, এবং অপর আর এক দল টাকা পাবে, উক্ত হারে। এঁরা বলেন, "পৃথিবীতে মানুষের বংশ বৃদ্ধির হার এমনিই বেশী, পৃথিবীর মানুষ নিঃশেষিত না হলে এই চেন্ কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না ইত্যাদি। কিন্তু ইহা অতীব মিথ্যা। পৃথিবীর সব মানুষ এই ভাবে (ঐ অফিসেই) টাকা পাঠালেও প্রত্যেক অর্থ-প্রেরক প্রেরিত টাকার অতগুণ বেশী টাকা পেতে পারে না। আসলে এই সব দুর্ব্বৃত্তরা মাত্র কয়েকজনকে প্রতিশ্রুতি মত টাকা পাঠায়—এতদ্দ্বারা মানুষের লোভ বেড়ে যায়, শেষে এদের

কয়েকজন পাঁচ টাকার বদলে এক সঙ্গে পাঁচশ', হাজার বা ততোধিক টাকা পাঠায়, ইহার দশ গুণ বেশী টাকা ফিরে পাবার আশায়, এবং এই সময়ই দুর্ব্বৃত্তরা অর্থাদি সহ অফিস বন্ধ করে সরে পড়ে। পুলিশের চেষ্টায় এই সব দুর্ব্বৃত্তরা নিঃশেষিত হয়েছে। কোনও কোনও দুর্ব্বৃত্ত-(এই ব্যাপারে) আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে থাকে যে, তাদের এই টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে উহা বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনাও ছিল এবং এই জন্য পাঁচ টাকায় পঞ্চাশ টাকা পাঠান তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে নি, ইত্যাদি। কিন্তু তদন্ত দ্বারা দেখা গেছে যে ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

অধুনা কালে এই পদ্ধতির একটু আধটু অদল বদলও হয়েছে। এই নূতন পদ্ধতিতে প্রথমে এক টাকা মূল্যের একটা ফর্ম্ম বিতরণ করা হয়—গ্রাহক এই ফর্ম্মে পাঁচজনের নাম লিখে, উহা ঐ অফিসে পাঠিয়ে দেয়। অফিস তখন ঐ পাঁচজনের নামে এক একটা ফর্ম্ম পাঠায়, এক এক টাকা প্রতি ফর্ম্মের জন্য মূল্য বাবদ আদায় করে। এই ভাবে তারা বহু গ্রাহককে যোগাড় করতে সক্ষম হয়, তাদের কাজ হাসিল করবার জন্যে। এই সকল পদ্ধতিকে নিঃসন্দেহে অপপদ্ধতি বলা যেতে পারে; অন্ততঃ অনেকেই এইরূপ মনে করেন।

[এ ছাড়া ভেজাল খাদ্যকে খাঁটি বলে ও নকল ঔষধকে আসল বলে চালিয়ে মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে তো বটেই, এমন কি তাদের প্রাণ-হানিরও কারণ ঘটাচ্ছে। আধুনিক বাঙালীর মেধা ও স্বাস্থ্যহানির কারণ এই ভেজাল খাদ্যের অতি প্রসার। এ'ছাড়া প্রসাধন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জাল করেও প্রবঞ্চনা কার্য্য করা হয়ে থাকে।]

তেতাস ও ফিতা খেলা

কার্ড ট্রীক্স্ বা তেতাস এবং ফিতা খেলা রূপ প্রবঞ্চনা এ দেশে নিম্ন শ্রেণীর অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। ফিতা খেলাকে ইংরাজীতে বলা হয়, "টেপ্ গ্যাম্বলিঙ্"। প্রথমে এই টেপ্ গ্যাম্বলিঙ্ সম্বন্ধে বলা যাক্। বিড্ গ্যাম্বলিঙ্এর ন্যায় এই টেপ্ গ্যাম্বলিঙ্ও আসল জুয়া নয়, উহা প্রতারণা মাত্র। এই সব প্রতারকরা প্রায়ই দিবা ভাগে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং এই জুয়া দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের ঠকিয়ে থাকে।* ফিতা খেলায় প্রতারকরা একটি সূতার লেত্তিকে একটি পেন্সিলের চারি পাশে জড়িয়ে নেয়। এর পর পেন্সিলটি বার করে নিয়ে উহা শিকার (Victim)দের হাতে তুলে দিয়ে, তারা তাকে পেন্সিলটিকে পুনরায় এই জড়ানো সূতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলে। এর পর সূতার একটি মুখ ধরে টান দিলে যদি উহা ফেঁসে যায় অর্থাৎ কি'না পেন্সিলটি যদি সূতার ফাঁকে আটক না পড়ে, তাহলে শিকার বা Victimএর হার হবে। এইরূপে ফেঁসে যাওয়া বা না যাওয়ার উপর বাজী ধরা হয়। এই সূতা জড়ানো এমন কায়দার সহিত সমাধিত হয় যাতে করে কি'না প্রবঞ্চিত ব্যক্তি হেরে যেতে বাধ্য। নিম্নের চিত্র দুইটি লক্ষ্য করলে বিষয়টি বুঝা যাবে। প্রথমঃচিত্রে সূতাটি স্বাভাবিক ভাবে জড়ানো হয়েছে। কিন্তু, দ্বিতীয় চিত্রে এই সূতা জড়ানোর মধ্যে একটি বিশেষ কায়দা বা ফাঁকি পরিলক্ষিত হবে।

* কেহ কেহ মনে করেন, পুলিশের সিপাই জমাদারদের সহিত এদের যোগসাজস্ আছে, কিন্তু ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ভারতীয় পুলিশ সম্বন্ধে ইহা একেবারেই সত্য নয়।

প্রথম চিত্রের (ক এবং খ) দড়ির প্রান্ত দুইটি ধরে টান দিলে পেন্সিলটি আটকে যাবে কিন্তু পর পৃষ্ঠায় (গ ও ঘ) চিত্রে প্রদর্শিত দড়ির
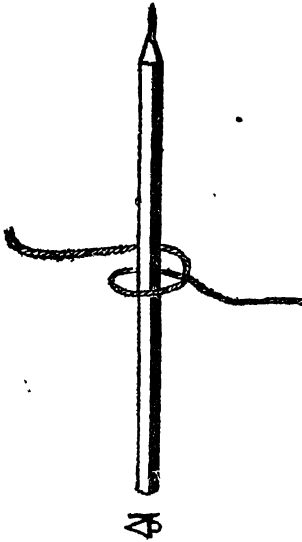
প্রান্ত ধরে টান দিলে পেন্সিলটি কিছুতেই আটকা পড়বে না। ফিতা খেলা সম্বন্ধে বলা হ'ল, এইবার তেতাস খেলা সম্বন্ধে বলব। তেতাস খেলার মধ্যেও এইরূপ অনেক ফাঁকি থাকে। তাস সাজাবার কায়দার গুণেই এইরূপ সম্ভব হয়। অনেক সময় হাত সাফাইয়ের দ্বারা বিবি বা গোলামখানা সরিয়েও ফেলা হয়, কারণ এই বিবি বা গোলামের উপরই হার-জিত নির্ভর করে। এই তেতাস খেলোয়াড়দের ইংরাজীতে বলা হয় "কার্ড সারপার"। সাধারণতঃ একখানি গোলাম বা বিবি এবং

দুইখানি অন্য তাস নিয়ে এই খেলার সূচনা করা হয় এবং পরে বিবি বা গোলামখানি সরিয়ে অন্য একটি সাধারণ তাস তৎস্থলে নীত হয়ে থাকে, মূর্খ মানুষদের ঠকাবার জন্যে।
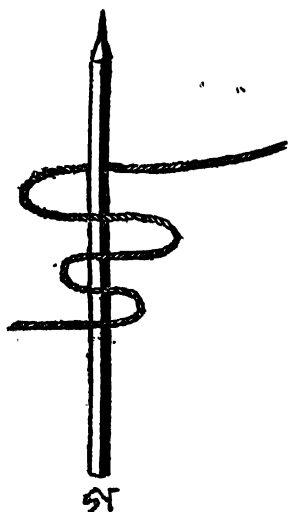
এই সব অপরাধীরা প্রথমে নিজেদের লোকদের দ্বারাই এই খেলা সুরু করে দেয়। সাধারণ পথিকরা এদের জিততে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে এই খেলায় যোগ দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়। এই অপরাধীরা গিল্টি করা সোনার হার গলায় দিয়ে ঘুরাফিরা করে; দরিদ্র মূর্খ শ্রমিকেরা এই হার দেখে এদের ধনী লোকই মনে করে—এতে তাদের ধারণা হয় এরা প্রচুর অর্থ দান করতে সক্ষম। কথনও কথনও এরা অর্থ পরিত্যাগে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অর্থাদি কেড়ে-কুড়েও নিয়েছে কারণেই এইরূপ ঘটে থাকে।

যৌনজ প্রবঞ্চনা

এই সাধারণ প্রবঞ্চনার অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতিও দৃষ্ট হয়। এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা অপরাধীরা বহু অবলা বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন করেছে। এই সব ক্ষেত্রে দুর্ব্বৃত্তরা বালিকাদের (সময় সময় এই সব বালিকাদের অভিভাবকদেরও) বুঝায় যে তারা তাদের বিবাহ করবে। অভিভাবকরা এদের অবাধ মেলামেশায় বাধা তো দেনই না, বরং আশাপ্রদ বুঝে সরে থাকেন—বড়লোক জামাই কে' না চায়, বিশেষ ক'রে এই দুর্ম্মূল্যের যুগে। এ ছাড়া মেয়েরাও গরীব পিতামাতার স্কন্ধ হ'তে নামতে পারলেই বাঁচে।

এরা প্রায়ই নানা অজুহাতে বিবাহের দিন পিছিয়ে দেয়। এই সময় বালিকারা এদের নিশ্চিত রূপে ভবিষ্যৎ স্বামী জ্ঞান করে প্রায়ই দেহ দান করে থাকে, কিন্তু পরে কোনও না কোনও এক অছিলায় এই দুর্ব্বৃত্তরা তাদের পূর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করে নির্ব্বিঘ্নে সরে পড়ে। লজ্জার খাতিরে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই সব বালিকারা এবং তাদের অভিভাবকগণ প্রায়ই এদের উপর আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অক্ষম হন। এই সব সামাজিক দুর্ব্বলতার সুযোগ দুর্ব্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। বিবাহ "করবো" এইরূপ প্রতিশ্রুতি না পেলে এই সব বালিকারা দেহদানরূপ কার্য্য হতে বিরত থাকত, এই কারণে প্রবঞ্চনা-অপরাধের সংজ্ঞানুযায়ী এই দুর্ব্বৃত্তরা প্রবঞ্চক মাত্র।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"যদি কেহ প্রতারণার দ্বারা অসদুদ্দেশ্যে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, (১) যার দ্বারা কি'না প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন দ্রব্য

অপর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, কিম্বা (২) কেহ যদি কাহারও উক্তরূপ কার্য্য দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার দ্রব্যাদি অপর কোনও এক ব্যক্তির দখলীভূত হতে সম্মতি জানায়, কিম্বা (৩) কেহ যদি উক্তরূপে প্রতারিত হয়ে এমন কোনও এক কার্য্য করে বসে বা উহা না করে, যে কার্য্য করা বা না করার জন্যে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৈহিক, আর্থিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা হতে পারে—যাহা কি'না প্রতারিত ব্যক্তি ঐরূপ ভাবে প্রতারিত না হলে, কখনই করত না বা করতে বিরত হ'ত; প্রবঞ্চকদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কার্য্যকে শঠতা, প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা বলা হবে।"

শঠতার উপরি উক্ত সংজ্ঞা হইতে প্রতীত হবে যে, কেবল মাত্র দ্রব্যাপহরণ দ্বারাই মানুষ মানুষকে ঠকায় না, অন্যান্য ভাবেও মানুষ মানুষকে ঠকাতে পারে। "দ্রব্যপ্রদানের" বদলে কোনও "কার্য্য করান বা না করানর" উপরও প্রবঞ্চনা অপরাধ সংঘটিত হয়। কোনও যৌন রোগগ্রস্ত নারী যদি কোনও যৌন রোগ-ভীত সাবধানী ভদ্রলোককে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিশ্বাস করায় যে তার কোনও যৌন রোগ নেই এবং ঐরূপ ভাবে তাকে বিশ্বাস করিয়ে তার সহিত যৌন মিলনে তাকে সম্মত করায় তা'হলে ঐ নারীর উক্তরূপ কার্য্যকে আইনানুসারে প্রবঞ্চনা বলা হবে, কারণ এতদ্দ্বারা ঐ ভদ্রলোকের দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা হ'তে পারে। অনুরূপ ভাবে কোনও ভদ্রলোক যদি কোনও বালিকাকে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিশ্বাস করায় যে, সে তাকে বিবাহ করবে (মনে মনে এইরূপ কোনও ইচ্ছা পোষণ না করে) এবং ঐরূপ ভাবে প্রবঞ্চনা দ্বারা যদি সে সেই মেয়েটিকে তার সহিত যৌন সম্মিলনে সম্মত করায়—যাতে কি'না সেই মেয়েটি কখনই সম্মত হ'ত না যদি না সে উক্তরূপে প্রবঞ্চিত হ'ত, তা হ'লে ভদ্রলোকের উক্ত কার্য্যটিকে আমরা প্রবঞ্চনা বলব। আইনানুসারে ইহা দণ্ডনীয়।

কোনও এক বালিকাকে এই সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞা নয়, এ দেশের "আচ্ছা খুকি, বলতে পার তোমরা এত সস্তা আমি এমন একটি প্রবঞ্চিতা বালিকাটি এইরূপ উত্তর দেয়— ন আমরা থাকব,

"কি করব বলুন, সত্যি কথা বলতে গেলে আমি একটা নৌকা রাজী হই নি। সে হঠাৎ ভিখারীর মত আবেগপূর্ণ স্বরে কথা বলে 'না রাণী এ কিছুতেই হবে না, আজকের এই জ্যোৎস্না করছিল।" গেলে, তা কি আর ফিরবে? তোমার ভবিষ্যৎ-স্বামীকে তুমি এতা নয়, বিশ্বাস করতে পারছ না, যাকে তুমি দু'দিন পরে মাল্যদান করবে তাকে কি তুমি এমনিই হীন মনে কর?' এর পর আমারও মনে কিছুটা দুর্ব্বলতা আসে। আমার ভবিষ্যৎ-স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করা আমি সেদিন সমুচিত মনে করি নি। এর কিছুক্ষণ পরে আমি কেঁদে ফেলে তার গলা জড়িয়ে বলে উঠি, 'এ কি করলে তুমি? সত্যি আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো?' আমি কি তখন জানতাম, যে সে আমাকে বিয়ে না করে, এমনি ভাবে পালাবে, এই কাজের পরও।"

এই সম্বন্ধে আদালতে নালিশ জানালে, আত্মপক্ষ সমর্থনে অপরাধীরা প্রায়ই বলে থাকে, "হাঁ, যখন আমি তাকে উপভোগ করেছিলাম তখন আমি (প্রতিজ্ঞামত) বিবাহ করব বলেই আমি তা করেছিলাম, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে কোনও এক বিশেষ কারণে আমি আমার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।" এ বিষয়ে প্রায়ই প্রবঞ্চিত বালিকাটির পরবর্ত্তীকালীন চরিত্র দোষের কথাও বলা হয়। এই অপরাধ, অপরাধী পূর্ব্বকল্পিত রূপে করেছে, অর্থাৎ কি'না সুরু হ'তেই তার মনে অসদুদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ প্রমাণ করতে না পারলে কেস্ প্রায়ই টিকে না। এই ধরণের একটি কেস্ কিছুদিন পূর্ব্বে আমার গোচরে এসেছিল। এই স্থলে দুর্ব্বৃত্তটি যথাক্রমে দুইটি মেয়েকেই একই

অপর এক ব্যক্তিদেয় যে সে মাত্র তাকেই বিবাহ করবে। বলা বাহুল্য, কার্য্য দ্বারা প্রতারিত সে পৃথক পৃথক ভাবে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। স্থলীভূত হতে সম্মতি পরস্পরের মধ্যে কোনও রূপ জানা-শুনা না থাকায় হয়ে এমন কোনও প্রতারিত হয়। এই দুইটি মেয়েই স্বাবলম্বিনী এবং করা বা না করার ছিলেন। দুর্ব্বৃত্তটি যথাক্রমে কিছুদিন করে উভয় কন্যার ক্ষতি হয় বা সহবাস করেন, স্বামী-স্ত্রী রূপেই। এই মেয়ে দুইটি স্বগৃহে প্রতারিত ন কালীন তাদের ভবিষ্যৎ-স্বামীর জন্যে নানাভাবে প্রচুর অর্থ এই স ব্যয়ও করেছে। কিছুদিন পরে দৈবক্রমে বিষয়টি উভয় কন্যারই কর্ণগোচর হ'লে, উভয় কন্যাই সেই লোকটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে লোকটির এই অপরাধ যে পূর্ব্বকল্পিত ছিল, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়; কারণ সে একই সময় দুইটি কন্যাকেই বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দৈহিক সুবিধা গ্রহণ করেছিল। এই সকল বিবাহেচ্ছু ধনী আধুনিক ভদ্র সন্তানদের সহিত মেয়েদের সাবধানে মেলামেশা করা উচিত—কারণ (বিশেষ ক্ষেত্রে) সামান্য খোরপোষের মামলা ছাড়া এই সব প্রতারকদের অন্য কোনও রূপে শায়েস্তা করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

সাধারণ প্রবঞ্চনার যৌনজ পদ্ধতির অপর একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হল। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একটি বিশেষ চালাকীর সহিত ইংরাজ দুহিতাটিকে প্রলুব্ধ ক'রে আমাকে বিবাহ করতে সম্মত করাই। আমার বাস ছিল "অতো" নম্বর গোয়ালটুলি লেনে। বিলাতে এসে মেয়েটির সহিত আমি আলাপ জমায় এবং তাকে আমি 'প্রিন্স অব্ গোয়ালটুলি', এই বলে পরিচয় দিই। এর পর আমি বেঙ্গলের ম্যাপ্ খুলে চিটাগাঙ্গের কোল হতে মেদিনীপুরের কোল পর্য্যন্ত রেখা টেনে গোয়ালটুলি ষ্টেটের (State) অবস্থিতি সম্বন্ধে তাকে পরিজ্ঞাত করাই।"

এইভাবে যে মাত্র ওদেশের মেয়েরাই ঠকে থাকে তা নয়, এ দেশের মেয়েদের আরও সহজে দুর্ব্বৃত্তরা ঠকিয়ে থাকে। "আমি এমন একটি কন্যার কথা শুনেছি যাকে, "চল আমরা চলে যাই, কেমন আমরা থাকব, লেকের ধারে হলদে রঙের বাড়ী করে। সবুজ রঙের একটা নৌকা থাকবে। চাঁদ উঠবে, মোটরও একটা রাখব, ইত্যাদি কথা বলে জনৈক অতি নিঃস্ব দুর্ব্বৃত্ত তাকে সহজেই বার করে আনতে পেরেছিল।"

এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা যে ছেলেরাই মেয়েদের ঠকিয়ে থাকে তা নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরাও এই পদ্ধতিতে সরলচিত্ত ছেলেদের ঠকিয়ে থাকে। সাধারণতঃ "বাহানার" সাহায্যেই মেয়েরা এই সম্বন্ধে ছেলেদের ঠকিয়ে থাকে। "বাহানা" অপরাধ-বিজ্ঞানের একটি পরিভাষা। এই বাহানা রূপ পরিভাষাটি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক। নিম্নের বিবৃতিটি পাঠ করলে এই "বাহানা" শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝা যাবে। রূপজীবিনীরা বিশেষ করে এই বাহানার অভ্যাস করে থাকে।

"কিছু দিন পূর্ব্বে আমি কোনও এক রূপজীবিনীর সংস্পর্শে এসেছিলাম। এই জাতীয় মেয়েদের সহিত সেই ছিল আমার প্রথম ও শেষ সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, আমি মেয়েটিকে ভাল বেসেছিলাম, এমন কি তাকে আমি বিবাহও হয় তো করতাম। মেয়েটি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে, এই ধারণাটা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে এসেছে; এই সময় একদিন অসময়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমি তাদের বাড়ী এসে হাজির হই। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে শুনতে পাই, প্রিয়ার মায়ের গলা। তিনি টেলিফোন করছিলেন—'হ্যালো, কে? বল বাবা, নাম বল। আমার কাছে লজ্জা কি, আমি চামেলির মা, কে? রতিশবাবু!'

জানালার কাছে এসে দেখি প্রিয়া আমার ছুটে গিয়ে রিসিভারটা

মার হাত থেকে কেড়ে নিল, সোৎসাহে এবং আবেগের সঙ্গে। এর পর প্রিয়তমাকে বলতে শুনলাম, 'এই দুষ্টু, পাজী কোথাকার! খুব কথার ঠিক থাকে তোমার, বাঃ; আজ কিন্তু ঠিক আসা চাই, হাঁ—'

এইক্ষণে আমি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ আমাকে সেখানে দেখে চামেলী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ঝোঁকটা কোনও রকমে সামলে নিয়ে চামেলী বললে, 'আরে, তুমি? আরে? এস এস, ও মা!' একটু বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে ফোন করছিলে?' দ্বিধাহীনভাবে চামেলী উত্তর করল, 'দাদাকে, দা-দা'!' হঠাৎ চামেলীর মা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে, ও চামী, বিনু এসেছে।'

বিনুর আগমনের বার্ত্তা কানে যাওয়া মাত্র চামেলীর মুখটা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বেশ বোঝা গেল, সে শুধু বিব্রত নয়, সন্ত্রস্তও হয়ে উঠেছে। কোনও রূপে তার সেই বিব্রত ভাব দমন করে চামেলী আমার দিকে একবার চাইল, তারপর উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে বিনুদা, এই বিনুদা?'

চামেলী বিনুদার নামে ঝড়ের মত বার হয়ে গেল, আমাকে আর কোনও কৈফিয়ৎ না দিয়েই। এত দাদার উৎপাত আমি পূর্ব্বে সেখানে কখনও দেখি নি। দশ মিনিট পরে চামেলী ফিরে এল। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে চামেলী বলল, 'একলাটি অনেকক্ষণ বসে রয়েছ, না?' গম্ভীর-ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি কে এলেন? মুখে চোখে একটা সারল্যের ভাব ফুটিয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ মিটি মিটি করে সে চেয়ে রইল, এবং তারপর হেসে ফেলে বলল, 'হিংসে হচ্ছে বুঝি, ভয় নেই, ও দাদা, পিস্‌তুতো ভাই।' সন্দিগ্ধভাবে আমি উত্তর করলাম, 'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?' উত্তরে চামেলী,

বললে, 'বাঃ রে, লজ্জা করে না বুঝি ?' এর পর, 'আসছি প্রথম পচ্যমান
মধ্যে, বলে চামেলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝতে রবর্ত্তীকালে
পাশের ঘরে অপর একজন অতিথিকে আপ্যায়িত করবার সকলের
ষড়যন্ত্র। বোধ হয় তাকেও, 'পাশের ঘরে কাকাবাবু এসে কলে
আসছি', বা ঐ রকম একটা কিছু বুলি বলে, কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে সে সামলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোককে একটু খুসী করে বিদেয় দিয়ে, হয় তো সে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হত। কিন্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করি নি। পেপার ওয়েটের তলায় তিনখানা দশ টাকার নোট চাপা দিয়ে রেখে আমি চলে আসি, এর পর আর কখনও আমি সেখানে যাই নি।"

উপরি উক্ত রূপ বাঁধা বুলিগুলিকে বেশ্যা সমাজের লোকেরা "বাহানা" বলে থাকে। নিম্নে এ সম্বন্ধে আরও একটি বিবৃতি দেওয়া যাক্।

"উপরে উঠে গদীর উপর বসে পড়তেই রাধার মা এসে পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বললে, 'আহা, বাবার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে, ওরে ও রাধু, ও মুখপুড়ী, আয় না, বাবা যে বসে রয়েছেন।' কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ করে রাধু এসে হাজির হ'ল, বেশ একটু সোহাগ ভরে অভিমানের সুরে সে বলে উঠল, 'বারে, এতদিন পরে আসা হ'ল। আমার মন কেমন করে না, বুঝি!' এর কয়েক মিনিট পর বাইরে থেকে রাধুর মা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও রাধু পাঁচটা টাকা দিয়ে যা, দুধওয়ালা বড্ড গোলমাল করছে।' প্রত্যুত্তরে রাধু চেঁচিয়ে উঠল, 'বারে, টাকা পাব কোথায় আমি, বললাম তো তখন, দুধ আমায় খাইও না।' বলা বাহুল্য, এরপর টাকা পাঁচটা বাধ্য হয়ে আমাকেই পকেট থেকে বার করে দিতে হয়; ঐরূপ পরিস্থিতিতে এইরূপ করা ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না। পরে শুনেছি, এগুলি টাকা আদায়ের এদের বাঁধা বুলি বা বাহানা।"

মার হাত থেকে ... র কোনও কোনও কুলটা নারীও এইরূপ বাহানার দ্বারা পর প্রি... র বন্ধুদের সাহায্যে ঠকিয়ে থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও কথায় ... নারী ত্রিতলের কক্ষে উপপতির (স্বামীর বন্ধু) সহিত ... পের পর নীচে নেমে স্বামীকে অনুযোগ করে, "যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না।" এতক্ষণ ধরে একলা থাকতে আমার ভাল লাগে, না'কি। কি নিষ্ঠুর তুমি? উপপতিটিও (স্বামীর বন্ধু) বন্ধুপত্নীর সহিত নেমে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনিও তার বৌদির উক্তিটি সমর্থন করে বন্ধুকে ভৎ'সনা করে বললেন, "সত্যি এ তোমার ভারি অন্যায়, এতক্ষণ ধরে বৌদি এই সব দুঃখহ করছিলেন, কাল থেকে একটু সকাল সকাল বাড়ী এস, বুঝলে?"

ইহা অবশ্য আমার শোনা কথা, তবে অভিজ্ঞতা থেকে আমি এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এই ধরণের "বাহানার" সাহায্যে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে।

চৌর্য্য অপরাধ

"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ি ধরা।" ইহাকে মহাবিদ্যাও বলা হয়। অনেকের মতে চুরিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্যা। দ্রব্যাদির স্বত্বাধিকারীত্বের সৃষ্টির সহিতই ইহার উৎপত্তি। পৃথিবীতে এমন এক দিন ছিল, যখন মানুষ বনের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত, তখনকার অরণ্যাদিতে ফলমূলও ছিল অপর্য্যাপ্ত। এই কারণে সঞ্চয়ের মনোবৃত্তিও তখন কাহারও মনে স্থান পায় নি। প্রত্যেককেই স্ব স্ব খাদ্যাদি আহরণ করতে বাধ্য হ'তে হ'ত পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা। এর পর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে স্থান ও খাদ্যের অভাব ঘটে। মানুষ তখন

ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সঞ্চয় করতে সুরু করে। প্রথম প্রথম পচ্যমান বিধায় অধিক শস্য সঞ্চয় করা সম্ভব হ'ত না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে মুদ্রানীতি প্রচলনের পর তাদের এই অসুবিধা দূরীভূত হয়। সকলের পক্ষে সমান ভাবে খাদ্যবস্তু এবং অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। ফলে পৃথিবীতে ধনী ও নির্ধনীর এবং নিরলস ও অলস লোকের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে যে সকল লোক কর্ম্মালস ছিল, তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ চুরির অভ্যাস করে। পরবর্ত্তীকালে মানুষ এই চুরির বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠলে এদের মধ্যে যারা অতি ধূর্ত্ত তারা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। তবে চুরিই যে পৃথিবীর প্রথম অপবিদ্যা তাতে সন্দেহ নেই। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা শক্তিমান হতেন, তাঁরা অপরের সঞ্চিত দ্রব্য কেড়েও নিতেন এবং যাঁরা দুর্ব্বল ছিল তাঁরাই করতেন চুরি। এই চুরি ও ডাকাতির বিরুদ্ধে সম্পত্তি রক্ষার কারণেই মানুষ প্রথমে সমাজ, এবং পরে রাষ্ট্র গঠন করে। এই চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধের প্রাদুর্ভাবই যে মানুষকে সভ্য করেছে, এ কথা স্বীকার্য্য।

কেহ কেহ বলে থাকেন, মানুষ চুরি বিদ্যাটি পশুপক্ষীদের নিকটেই প্রথম শিক্ষা করে। বস্তুতঃ, এক পশুর সংগৃহীত খাদ্য অপর পশু প্রায়ই চুরি করে থাকে। পশুদের সংগৃহীত খাদ্যাদি মানুষও যে চুরি করে নি তা'ও নয়। আজও পর্য্যন্ত মানুষ মৌমাছিদের সংগৃহীত মধু, পক্ষীকুলায় হতে পক্ষীশাবক ইত্যাদি চুরি করে থাকে। এমন কি ব্যাঘ্রকুল সংগৃহীত মৎস্যও মানুষ চুরি করে থাকে। সুন্দরবনের মধ্যে এমন অনেক নদী আছে যার জল না'কি ভাঁটার সময় অতি সত্বর সরে যায়। এক শ্রেণীর ব্যাঘ্রগণ না'কি এই সময় ভাঁটার কারণে অপসারিত স্রোতের সহিত ছুটে চলে, এবং মৎস্য পেলেই উহা বালির তলে পুঁতে রাখে ; এই ভাবে মাছ পুঁততে পুঁততে সে মোহানার মুখ পর্য্যন্ত চলে যায়। এরপর সে ফিরে এসে

মাছগুলা একে একে না'কি উঠিয়ে নিয়ে ভক্ষণ করে। এদিকে শিকারী মানুষরা ঐ ব্যাঘ্রের পিছু পিছু ধাওয়া করে ব্যাঘ্রের কষ্টলব্ধ মৎস্যগুলিকে তার অগোচরে উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। ঘটনাটি অবশ্য আমার শোনা কথা —যে মানুষ ব্যাঘ্রের দ্রব্যাদি চুরি করতে সমর্থ, সে সুবিধে পেলে মানুষের দ্রব্য যে চুরি করবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? যাই হোক, মানুষ মানুষের দ্রব্য চুরি করলে মনুষ্য সমাজে উহাকে অপরাধ বলা হয়। এই সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে, এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইবার এই চৌর্য্য অপরাধের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ১৭- ধারায় চৌর্য্য অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ—

কেহ যদি অপরের দখলীভূত কোনও অস্থির বা অস্থাবর দ্রব্য দখলীভূত ব্যক্তির বিনানুমতিতে আত্মসাতের বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অপসারণ করে তো তার এই কার্য্যকে (অপকার্য্যকে) চৌর্য্য কার্য্য বলা হবে।

সাধারণভাবে আমরা এই চৌর্য্য অপরাধকে দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকি, যথা—বহির্চৌর্য্য এবং গৃহচৌর্য্য। এই গৃহচৌর্য্য তিন প্রকারে সমাধিত হয়, উহাকে আমরা যথাক্রমে সরলচৌর্য্য, সবলচৌর্য্য এবং ভৃত্যচৌর্য্য বলে থাকি। সাধারণ ভাষায় আমরা সরলচৌর্য্যকে বলি বাড়ীর চুরি বা House Theft, সবলচৌর্য্যকে বলি সিঁদেল চুরি বা Burglery, এবং ভৃত্যচৌর্য্যকে বলি চাকর হিসাবে চুরি বা Theft as a Servant. এই বিভাগ কয়টির যথার্থ সংজ্ঞা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, ৪৫৪ ও ৪৫৭ এবং ৩৮১ ধারায় দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে বহির্চৌর্য্যকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে থাকি। যথা—(১) জেবকাট (গাঁটকাটা), পিকপকেট বা পকেটমার। (২) ছিঁচকা বা ছিন্নক চোর,

ছিনান্দার বা Snatcher, যারা শিশু এবং মেয়েদের হার ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়, তাদেরই বলা হয় ছিঁচকা চোর। (৩) উত্তোলক চোর বা চোরোত্তোলক। এই উত্তোলক চোর বা Lifterরা তিন প্রকারের হয়; যথা—শকট-উত্তোলক বা cart lifter, বিপণি-উত্তোলক বা shop lifter এবং পাশব-উত্তোলক বা cattle thief।

এই ছিন্নক চোর বা Snatcher, জেবকাট চোর (Pick-Pocket), এবং উত্তোলক চোরদের একত্রে বলা হয়, সহজচৌর্য্য। এই সকল অপরাধীরা কোনও অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ করে না। আঘাত হানা এদের স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার। ব্যক্তির দেহ বা সন্নিকট হ'তে চুরিকে সহজচৌর্য্য বলা হয়। * কোনও ব্যক্তির পকেট, গাত্র বা হস্ত হ'তে বা তার সন্নিকট হ'তে দ্রব্যাদি অপহরণ করার বৈজ্ঞানিক নাম সহজচৌর্য্য। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় এই অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পিকপকেট বা পকেটমার এই সহজচৌর্য্যের অন্তর্গত একটি অপরাধ। পুরাকালে মানুষ যখন কোর্ত্তা পরত না এবং টাকা কড়ি প্রায়শঃই ট্যাঁকে রাখত তখন তাদের ট্যাঁক থেকে টাকা অপহরণ করা হ'ত। এই জন্যে তখনকার যুগের অপরাধীদের বলা হ'ত, গাঁট-কাটা, এক্ষণে জেব বা পকেটের সমধিক প্রচলনের ফলে এই গাঁট-কাটাদের নূতন নাম হয়েছে, জেবকাট বা পকেটমার। এক্ষণে বড়বাজার অঞ্চলে মাত্র কয়েক-জন গাঁটকাটা আছে। এরা মাড়বারীদের কাপড়ের গিঁট কেটে অর্থাপহরণ করে। গাঁটরূপ খাদ্যের অভাবে এরা আজ বিলুপ্তির পথে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চৌর্য্য অপরাধকে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি শ্রেণী ও

* অসাধারণ চৌর্য্যও এই সহজচৌর্য্যের একটি উপশ্রেণী। এই সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব।

উপশ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। কারণ অপরাধীদের শিক্ষা-দীক্ষা, দৈহিক গঠন, প্রকৃতি ও স্বভাবের সহিত এই সকল শ্রেণী ও উপশ্রেণীর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ দেখা যায়।
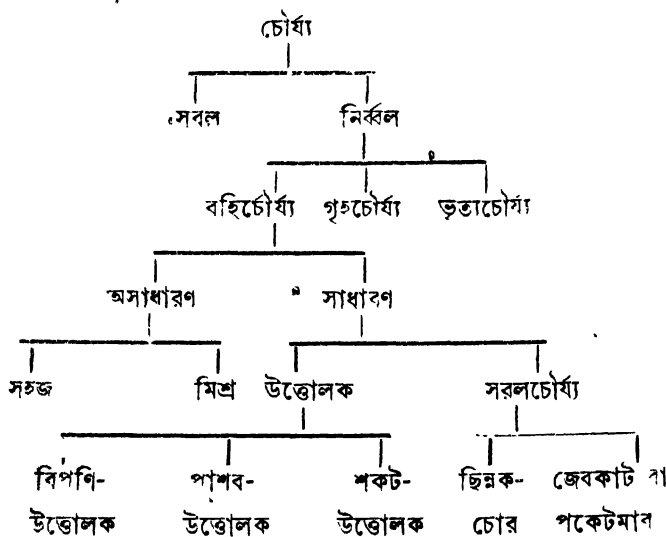
পকেটমার

পকেটমারগণ নির্ব্বল-চৌর্য্যের একটি উপশ্রেণী। এরা প্রায়ই দল বেঁধে কাজ করে। সাধারণতঃ এরা পঙ্কিল বস্তীগ্রামে বাস করে। এদের অধিকাংশই মোসলেম ধর্ম্মী হিন্দীভাষী। কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী ও পশ্চিমী হিন্দুও এদের মধ্যে আছে। এরা প্রায়ই সর্দ্দারদের অধীনে কাজ করে। এদের এক একটি দলে ১০—১২ জনেরও অধিক ব্যক্তি যুক্ত আছে। কথনও

কখনও ওরা এককভাবে, কখনও কখনও বা এরা দল বেধে অপকর্মে বাহির হয়। পূর্বে এদের দলগুলি অত্যন্তরূপ সুগঠিত হ'ত। পূর্বে এদের নিজস্ব অফিসও ছিল। এই অফিসগুলি ছিল চলন্ত বা Moving। পুলিশের ভয়ে এরা প্রতিদিনই এক বস্তি হতে অপর এক বস্তিতে এদের অফিস বা আড্ডাঘর স্থানান্তরিত করেছে। দলের লোকেরা দিনান্তে স্ব স্ব উপার্জ্জিত বস্তু বা অর্থাদি এই সব অফিস বা আড্ডা ঘরে এনে সর্দ্দারের নিকট জমা দিত। সর্দ্দারজী এই সব অপহৃত অর্থ সমান ভাবে সাকরেদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এতে সকলেরই সুবিধে হ'ত। কোনও দিন যদি কোনও ব্যক্তি কোনও অর্থ সংগ্রহ করতে না'ও পারে, তাতেও তার কোনও অসুবিধা নেই। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সেও সেদিন কিছু হিস্যা নিয়ে ডেরায় ফিরতে পারবে। বড় হিস্যাটি অবশ্য সর্দ্দারজীই নিতেন।

এই অফিস বা আড্ডাঘর সম্বন্ধে আমি একজন পুরানো অফিসারের মুখে অনেক কিছু শুনেছিলাম। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে এই আড্ডাঘর সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে।

"বহু কষ্টে তাদের আড্ডাঘরটি সম্বন্ধে আমি খবর পাই—একজন ইনফরমারের সাহায্যে। মাত্র দিন দুই পূর্ব্বে এরা অমুক বস্তি থেকে এখানে উঠে এসেছে, দুই দিন পরে এখান থেকেও তারা সরে পড়বে—এইরূপ বন্দোবস্তও ছিল। আমি যথাসত্বর সদলে রাত্রি দশটায় এদের আড্ডাঘরে এসে হানা দিই, কারণ রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই সকলে এসে এখানে জমা হবে। আড্ডাঘরের কাছে এসে লক্ষ্য করি দুইজন লোক উপরে উঠছে। একজনের পরণে ছিল সার্জ্জের কোট ও মিহি ধুতি, অপর জনের পরণে ছিল ছেঁড়া গেঞ্জি ও লুঙ্গি। বিভিন্ন বেশী এই দুই ব্যক্তিকে গলা জড়াজড়ি করে উপরে উঠতে দেখে, আমার বুঝতে আর

বাকী থাকে নি, এঁরা কারা। এর পর হঠাৎ দেখতে পায় একটা ছেলে দৌড়ে সিঁড়ির দিকে চলেছে। এই ছেলেটিকে কিছুক্ষণ পূর্বে আমি মোড়ের মাথায় আনচান ভাবে ঘুরতে দেখেছিলাম। আসলে এই ছেলেটি ছিল এদের পাহারাদার। আমি তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে ধরে ফেলে একজন সিপাই-এর হেপাজতে তাকে দূরে সরিয়ে দিই, যাতে ক'রে ওরা আমাদের আগমন সম্বন্ধে কোনও খবর না পায়।

আড্ডাঘরটা ছিল একটা মাটকোঠার দ্বিতলের ঘরে। নীচে কোনও জানালা বা দরজা নেই, উপরের ঘরগুলা ঘিরে একটা কাঠের বারান্দা, বারান্দার কোণ থেকে একটা কাঠের নড়নড়ে সিঁড়ি নেমে এসেছে। আমরা অতি সন্তর্পণে উপরের বারান্দায় উঠে পড়ি। শেষের দিককার একটা ঘর থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো। এর পর পিছনের বারান্দা দিয়ে ঐ ঘরটার পিছনে এসে দাঁড়াই. পিছনের দেওয়ালে ছোট ছোট কতকগুলি ফুটা ছিল। এর একটি ফুটার মধ্যে চোখ রেখে আমরা আড্ডাঘরটি পরিলক্ষ্য করি। আড্ডা তখন পুবাদমেই বসে গিয়েছে। মেঝের উপর সারি সারি বাইশ তেইশটা ছেঁড়া মাদুর। ঘরে দুই একটা পুরানো ট্রাঙ্কও দেখা গেল। দেওয়ালের ব্র্যাকেটগুলাতে গোটা পাঁচ ছয় গরম কোট, শাল, ফ্লানেলের সার্ট এমন কি বিলাতী সুটও ঝুলানো রয়েছে। বুঝলাম, প্রয়োজন মত সর্দ্দারের নির্দ্দেশে এরা এই সব পোষাক ব্যবহার করে অপকার্য্যের সুবিধার জন্যে। মাদুর-গুলার উপর প্রায় জন পঁচিশ বিভিন্ন প্রদেশের লোক, তাদের বিভিন্ন প্রকার বেশভূষার মধ্যে আত্মগোপন করে বসে আছে। এদের কেউ কেউ বড় বড় নলে মুখ রেখে চণ্ডু খাচ্ছিলো। কোণের দিকে একটা ছেঁড়া গদির উপর বসে সর্দ্দারজী তখন টাকা গুণছিলেন, দু কুড়ি সাত, তিন কুড়ি বারো, ইত্যাদি শব্দে। টাকা ও নোটের আলাদা আলাদা থাক

দিতে দিতে সর্দ্দারকে বলতে শুনলাম, 'এই ঢোলিরাম, কেত্তো টাকা পেলি সেই সোনাকো ঘড়ি বেচে।' উত্তরে ঢোলিরাম বলল, 'উতো দেড়শো রূপেয়াকা হোবে, লেকেন ছটুলাল পঞ্চাশের বেশী একদম দিলে না।' উত্তরে সর্দ্দার বলল, 'কুছু কামকো নেহি আছে, আচ্ছা, যো মিলা উহি-লে আও।' এর পর টাকার আরও কয়েকটা থাক দিয়ে সর্দ্দারজী বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, আভি এক এক আদমি আ যাও।' সর্দ্দারের কথায় প্রায় দশ বারোজন হুড়মুড় করে সামনে এগিয়ে এল। সর্দ্দারের পাশে গোল টুপীপরা একজন হিন্দুস্থানী হিসেব লিখছিল, সে সকলকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'এক সাথমে নেহি, পয়লা আও বংশীলাল, উসকো পাছু হোসেনি।' ইতিমধ্যে একজন মুসলমান রুক্ষ মেজাজে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে সর্দ্দারজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়া খবর? ওকিল-বাবুসে উসকো কুছ পাত্তা মিলা? উ লোক কাঁহা পাকড় গিয়া?' নবাগত লোকটি ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দিল, 'কোহি নেহি পাকড় গিয়া, উকিল-বাবু সে কোটসে খবর লিয়ে বলিয়ে দিলেন। উ লোক রূপেয়া লেকে সেরেফ ভাগা। হামরা গোয়েন্দাকো ভি খবর এহি আছে।' সব কথা শুনে দলের একজন আস্তিনার তলা থেকে একটা ছুরি বার করে সর্দ্দারকে শুধাল, 'মে তৈয়ার সর্দ্দার, হুকুম ফরমাইএ। বেইমান লোককো মে—' পরে আমি জেনেছিলাম, এই ছুরি-হাতে লোকটি নিজে পিকপকেট ছিল না, সে মাঝে মাঝে আড্ডায় এসে চণ্ডু খেত, সর্দ্দারের ফাইফরমাজও খাটত। এর পর আর আমরা দেরি না ক'রে হুড়মুড় করে আড্ডাঘরের সামনে এসে দাঁড়াই, এদিকে ভিতর থেকে হঠাৎ একজন বলে উঠে, খবরদার ভাই পুলিশ আ গিয়া। বোধ হয় আমাদের জুতার শব্দ শুনে এরা বুঝেছিল, পুলিশ এসেছে। সকল কথা শুনে দলের একজন বলে উঠল, 'কেয়া সর্দ্দার, লড় যায়?' উত্তরে সর্দ্দার

বললে, 'কেয়া লড়েগা, দু'ঘণ্টাকো আস্তে।' পাশেই একটা জানালা ছিল; এই জানালা দিয়ে এরা তখন ছুরি, কাঁচি ও খালি মনিব্যাগগুলি ছুড়ে ছুড়ে বাইরে ফেলতে থাকে। এদিকে ঘরের ভিতর ঢুকে আমরা দেখি, সর্দ্দার একটা গজল গান সুরু করেছে, এবং তাকে ঘিরে সকলে মিলে হাত তালির সাহায্যে তাল দিয়ে চলেছে। আমাদের দেখে সর্দ্দারজী সেলাম জানিয়ে বলে উঠল, 'সেলাম হুজুর, এ পঞ্চায়েতি হোতা, কুছ বেকানুন নেহি হ্যায়। এই, বড়বাবু আ গিয়া, জবান ঠিক রাখো, এই—"

এ ছাড়া মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং হাজার টাকার নোট সর্দ্দারজীর সাহায্য ব্যতীত ভাঙানোও অসম্ভব। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সহিত ব্যবসা-সূত্রে আবদ্ধ থাকায় সর্দ্দারজীরা এই সব দ্রব্য পাচার করতে সহজেই সক্ষম হন। দলের কোনও ব্যক্তি ধরা পড়লে এই সব সর্দ্দাররা তাদের জামীনের ব্যবস্থা ও মামলার তদ্বিরও অলক্ষ্যে থেকে করে থাকেন। এই দলপতির সহিত অনেক নামজাদা ব্যবসায়ীরও সবিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা শুনা গেছে। এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"কোনও এক নামজাদা ব্যবসায়ীর গদিতে কার্য্য ব্যপদেশে আমাকে যেতে হয়েছিল। গদির মালিক ক্যাস ঘরের টাকার ঝন ঝন আওয়াজে মসগুল হয়ে কাজকর্ম্ম দেখছিলেন, পাশের চার চারটা টেলিফোন পর পর সাজানো রয়েছে, লাখ লাখ টাকার তার কারবার। এমন সময় একজন কোট-প্যাণ্ট-পরা চোয়াড়ে চেহারার লোক সম শ্রেণীর দুইজন লুঙ্গীপরা যুবককে নিয়ে ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন, 'রাম রাম, ছেলাম বাবু সাব।' দোকানের মালিক খুসী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে, বহুৎ দিন বাদ আসেছে, পান সিগারেট মাঙায়ে?' এই সময় গদির মালিকের উপরি-উক্ত যুবকদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য পড়ল। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ওই লোকটার

কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'উ লোক কোউন আছে ? সব বিশ্বাসী তো ? সে দেখবেন মুস্কিল উস্কিল—' প্যাণ্ট-পরা লোকটা অভয় দিয়ে বললে, 'সব শেয়ানা আছে সাব। হামিলোককো বাদ উনলোকই মালিক হোবে। হামিলোক কেতো দিন বাঁচবে বোলেন, ইনলোককোভি একটু... দেখবেন।' এর পর চুপি চুপি তাদের মধ্যে কি কথা হ'ল, তারাই জানে। হঠাৎ আমার কানে এল ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বলছেন, 'লেকেন হাজারমে হাম দেড়শো রুপেয়াকো বাত্তি নেহি দেবে।' উত্তরে আগন্তুক জানাল, 'ঠিক হ্যায়, নম্বরী নোটকো বাস্তে যো দস্তুর আছে উহিই দিবেন।' এর পর আমার বুঝতে বাকি থাকেনি, এরা কারা, এবং কি জন্যেই বা এরা গদিতে এসেছে।"

এই সকল পকেটমারদের এক একটি দল পরস্পরের মধ্যে বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্ব স্ব এলাকাও ভাগ করে নিত।* এক একটি দল এক একটি স্থানে শিকারের সন্ধানে ঘুরা-ফিরা করে। একজন অপর দলের নির্দ্ধারিত স্থানে হানা দিলে মারপিট হয়, এজন্যে কেউ বা অপরের এলাকায় কদাচিৎ এসে থাকে। এই সব ঝগড়া-ঝাটির সুযোগে পুলিশ একদলের নিকট হতে অপর দলের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আইনানুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি দেওয়া হ'ল, বিবৃতিটি হতে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি একজন পুলিশের পুরানো ইনফরমার। সেইদিন হুবহু যা

---

* একদল কোনও মোড়ে এসে দাঁড়ালে সেখানে পশ্চাদগামী দল আর দাঁড়ায় না। কারণ দুই দলের এক জায়গায় অপকর্ম্ম করা সম্ভব নয়, তখন ওরা অপর এক স্থানের সন্ধানে অগ্রসর হয়। এই ভাবে দল বিশেষের স্থান সম্বন্ধে অধিকার দাঁড়িয়ে যায়। ভিখারীদের ভিক্ষা করার এবং ফেরিওয়ালাদের ফেরি করার মধ্যেও এইরূপ স্থানাধিকার দেখা গেছে।

যা দেখেছিলাম তা বলে যাচ্ছি শুনুন। হ্যারিসন রোডের মোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়ল একদল লোকের প্রতি। তাদের বেশভূষা বা ভাষার মধ্যে থেকে তাদের জাত নির্ণয় করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। দলের মধ্য থেকে একটা গাট্টাগোট্টা লোক, বোধ হয় তাদের সর্দ্দার-টর্দ্দার হবে, হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'এই শালা লালু, ঠিকসে ফেল, এখনও একটা লোকও পড়ল না।' উত্তরে লালু বলল, 'আরে, সে ঠিক মানুষ আছে, তবে তো' 'শিকারই লেই?' লালু একটা ফলের দোকান হতে নির্ব্বিচারে একটা করে আম তুলে খোসা ছাড়াচ্ছিলো, এবং ছাড়ানো খোসাগুলা সে তাগসই মাফিক ফুটপাতের উপরই ফেলছিল। একজন বাঙালী ভদ্রলোক সেই পথে আসছিলেন। হঠাৎ খোসার উপর পা পড়ায়, সড় সড় করে পিছলে তিনি পড়ে গেলেন। ভদ্রলোকটি নির্ব্বিকার চিত্তে ফুটপাতের উপর শুয়ে পড়লেও হাতের ব্যাগটি ছাড়লেন না। ব্যাগটি আঁকড়ে ধ'রে তিনি উঠবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় সন্দেহজনক লোকগুলা ছুটে এসে তাঁকে ধরে ফেলল। ভদ্রলোকটির প্রতি তাদের যত্ন দেখানোর একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কেউ দেয় ভদ্রলোকের কাঁধ ঝেড়ে, কেউ তাঁর জামাটা টেনে দেয়। এদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের পকেটটা একটু নেড়ে দিতে দিতে বলল, 'দেখেন তো বাবু, আউর একটু হলে আপনি নেঙড়া বেনে গেছলেন। আপনার খুব চোট লাগে নি তো?' ভদ্রলোকটি ছিলেন কলিকাতার পুরানো বাসিন্দা, এদের চিন্‌তে তাঁর বাকি থাকে নি। ব্যাগটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি উত্তর করলেন, 'আমের খোসা ফেলতা যব, তব জান্‌তা নেহি যে চোট লাগতা, হামসে চালাকি মাৎ করো।' ভদ্রলোকটির এই বিদ্রূপ বাণীর প্রত্যুত্তরে দলের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'আপনি তো মশাই

খুব ভদ্রলোক আছেন, ব্যাগে তো আছে সে দুইখান কাপড়, পকেটে তো একটা পয়সাও নেই।' ভদ্রলোকটি চলে গেলে, লোকগুলা আবার তাদের পূর্ব্ব স্থানে ফিরে এল। আমি কৌতূহলী হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে এদের হালচাল পরিলক্ষ্য করছিলাম। এদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'শালা হুঁসিয়ার আছে।' উত্তরে আর একজন ব'লে উঠল, 'তো শালার চোখই লেই, শালা সব মাটি করে দিলি। মাদু শালা তোকে এত শেখালে—' এর পর এদের একজন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'এই শালারা পালা, ওদের সে দল এসে গেছে। কিন্তু পালান আর এদের হ'ল না, অপর দল ততক্ষণে তাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। আগন্তকদের দল থেকে একজন লম্বা গোছের লোক এগিয়ে এসে প্রথম দলের একটা লোকের গলাটা বাম হাতে টেনে ধরে শুধাল, 'তু শালা, নিজের এলাকা ছেড়ে হেনে এসেছিস্, যা শালা তোর মির্জ্জাপুরের মোড়ে।' লোকটি কিন্তু সহজেই অপমানটা হজম ক'রে নিল, বেশ বুঝা গেল তারা লুকিয়ে অপর দলের এলাকায় কাম করতে এসেছে। একটু আমতা আমতা করে সে উত্তর করল, 'মাইরি মামু, আম খাচ্ছিলাম, শুন মাইরি।' মামু কিন্তু তার কোনও কথাই শুনল না, সজোরে তার গালে একটা চড় কসিয়ে উত্তর করল, 'ভাগ্ শালা, কাম করতে আইয়েছিস্, ফিন্ মিথ্যাভি বলছিস্।' অপর দলের দলপতি এর পর গুমরতে গুমরতে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করল। দলবল নিয়ে চলে যেতে যেতে সে বলে গেল, 'দাঁড়া শালে, বড়িবাজারে (থানায়) সটিনবাবু আইয়েছে, হামিভি খবর ভেজিয়ে দিচ্ছি।' প্রত্যুত্তরে মামু জানাল, 'আরে আরে, কেতো থানেদার হামিভি দেখিয়েছি। তোর জান তো হামি আগে লিবে।'

এর পর নূতন দলের কার্য্যকলাপ নির্ব্বিরোধে সুরু হ'ল, আমিও

যথাস্থানে দাঁড়িয়ে এদের কার্য্যকলাপ দেখতে থাকলাম। এই নূতন দলের একজন লোক হঠাৎ তার সাথীর কাঁধে একটা গাঁট্টা কসিয়ে বলে উঠল, 'চুপ কর্, শালা।' পাশের একজন পথিকের পকেট থেকে বেমালুম একটা ফাউনটেন পেন উঠিয়ে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করল, 'কেন রে?' উত্তরে প্রথম ব্যক্তিটি বলে উঠল, 'চুপ, শিকার। পকেটে সে মাল আছে মনে হয়, আগে পরখ করে দেখ্।' এর পর এদের একজন জনৈক পথচারীর গা ঘেঁসে চলতে চলতে সকলের অলক্ষ্যে তার পকেটে একটা আঙ্গুলের টোকা মেরে আবার পিছিয়ে পড়ল। তাকে পিছিয়ে পড়তে দেখে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'কি মাল তো, না সব বাজে কাগজ?' অপর লোকটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তর দিলে, 'সব লোট্ মাইরি, তুই জলদি ওদের ডাক্।'

ফুটপাতের অপর পারে জন-দুই লম্বা চুল বাঙ্গালী, কয়েকজন ঘাড় ছাটা দেশোবালী ও জন-চার পাঁচ লুঙ্গিপরা মুসলমান দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়ি ফুঁকছিল। তাদের দিকে একটা ইসারা করে, প্রথম ব্যক্তি এক ছুটে ভদ্রলোকের পাশ ঘেঁসে অনেক দূর এগিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তার পিছন পিছন চলতে সুরু করে দিল কি মতলবে তা সেই জানে। এত বড় একটা ষড়যন্ত্র যে তাকে লক্ষ্য করে হয়ে গেল, তা সেই ভদ্রলোকটি মোটেই জানতে পারলেন না। আপন মনেই তিনি পথ চলছিলেন। হঠাৎ উপর থেকে কাগজে মোড়া কি একটা তার মাথার উপর এসে পড়ল। গোবর কি বিষ্ঠা—তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে তা তাঁর গাল বেয়ে নেমে এসে তাঁর জামার অনেকখানি নষ্ট করে দিলে। ভদ্রলোকটি চমকে উঠে উপরের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'দেখতো, দেখতো, যত বেল্লিক সব।' কানে বিড়ি গোঁজা মুসলমান কয়জন ভদ্রলোকটির পিছন পিছন আসছিল। হঠাৎ

তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। এদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের অবস্থা পরিলক্ষ্য করে বলে উঠল, 'এ কেয়া তাজ্জব, ছো ছো ছো। এ কোউন কিয়া রে?' সামনের ফলের দোকান থেকে একজন আধা ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী লাফিয়ে পড়ে বলে উঠল, আপনাকে তো বড় মুস্কিলে ফেলিয়েছে পানি লিবেন তো আসেন এখানে। দেখতে দেখতে সেখানে বড় রকমের একটা ভীড় জমে গেল। কোথা থেকে আবার আর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এক বালতি জল এনে তাঁর জামা কাপড় কতক কতক ধুয়ে দিয়ে বললে, 'বাবুজী, মাথা সে একটু নীচু করেন, হামি সে বেশ করে ধুইয়ে দিই। হাপনি ভদ্দর লোক আছেন মশয়।' দলের প্রথম ব্যক্তিটি ভদ্রলোকের পিছনেই দাঁড়িয়েছিল, সেই সঙ্গে আমিও। জল ঢালতে ঢালতে সেই শুভাকাঙ্ক্ষী লোকটি ঐ প্রথম ব্যক্তিটিকে চোখ টিপে ইসারা করে ভদ্রলোকটিকে শুধাল, 'হাপনি সে আউর একটু নীচু হবেন, হামি সে বেশ করে—'

ভদ্রলোকটি দ্বিরুক্তি না করে মাথাটা আরও একটু নীচু করল। নীচু হবামাত্র, প্রথম ব্যক্তিটি ছুটে এসে, একটা রেজার ব্লেড বার করে ভদ্রলোকের বুক পকেটের তলায় খানিকটা বেমালুম কেটে দিল। তারপর ব্লেডটা ফুটপাতের উপর ফেলে দিয়ে দুটা মাত্র আঙুলের সাহায্যে নোটের বাণ্ডিলটা পকেট থেকে বার করে নিয়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

এ ধারে কিন্তু জল ঢালার পালা সমানে চলছিল। মাথাটা ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ভদ্রলোক কোঁচার খুঁট দিয়ে চুলগুলা মুছে ফেলছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর পকেটের দিকে নজর পড়ায় তিনি চমকে উঠলেন। মুখ দিয়ে তাঁর আর কথা বার হ'ল না, অস্ফুট আর্ত্তনাদে তিনি ফুটের উপর বসে পড়লেন।

যে লোকটা এতক্ষণ তাঁর মাথায় জল ঢালছিল, সে একটু ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, 'কি মশাই, আউর জল ঢালবে না'কি? হাপনি ওমন করছেন কেন?' ভদ্রলোকটি এইবার চীৎকার করে উঠলেন, 'হামরা সর্ব্বনাশ হুয়া গিয়া, পুলিশ বোলাও, পুলিশ বোলাও।' এতক্ষণে একজন বাঙ্গালী যুবক এগিয়ে এসে বললেন, 'কি, পকেট মেরেছে বুঝি? তা তো মারবেই, অমন জায়গায় রাখে?' সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন এগিয়ে এলেন, তাঁকেও বাঙ্গালী বলে মনে হ'ল। তিনি বেশ বিশেষজ্ঞের মতই বলে গেলেন, 'ও মশাই ওঁর নিজের টাকা নয়, নিজের টাকা হলে ওরকম জায়গায় রাখে? পুলিশ শুনলে এ কেস লেবেই না।' অপর আর একজন বলে উঠল, 'আর পুলিশ ডেকে কি হবে। ও আর পেয়েছেন, বাড়ী যান মশায়, বাড়ী যান।' শেষ কথা বলে গেল একজন মাড়োয়ারী। ভিড়ের ভিতর থেকে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে ভাঙা বাঙলায় তিনি বললেন, 'হাপনি মশয় বোকা লোক আছেন। এ কলকাত্তা শহর। বড় বড় কারবার হেনে হয়। হেনে বোকা লোকের থাকা কামই লয়। বুঝলেন মশয়?'

একজন বাঙালী ছোকরা, বোধ হয় কোন কলেজের পড়ুয়া হবে। বই হাতে করে সেই পথ দিয়ে আসছিল। ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে মশাই?' ভিড়ের ভেতর থেকে দলের একজন ছোকরাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, 'ও কিছু নয়। সরে পড়েন মশয়, সরে পড়েন।' এর পর সকলে মিলে ছোকরাটিকে ধাক্কা দিতে দিতে একেবারে কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে নিয়ে গিয়ে ফেল্লে। আর ছোকরাটি সামলে নিয়ে ঠিক ভাবে দাঁড়াবার আগেই ভিড়ের লোকগুলা এক একজন এক এক দিকে সরে পড়ল, তাদের কাউকে আর সেখানে দেখা গেল না।"

উপরের কাহিনী কয়টি হ'তে এই পকেটমার বা গাঁটকাটাদের আভ্যন্তরিক সংগঠন ও কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণা করা যায়। এই অপকর্ম্মের অব্যবহিত পরে যে সকল সন্দেহজনক ব্যক্তি দরদ বা সহানুভূতি দেখায় তাদের তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করলে, অনেক সময় এই সব চুরির কিনারা হয়ে যায়। এইবার এই পকেটমারদের অপর আর একটি পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাক। নিম্নের বিবৃতিটি পড়ে দেখুন। এই পিকপকেটদের এক এক দলের কার্য্যপদ্ধতি এক এক রকমের হয়ে থাকে। এই পৃথক পৃথক কার্য্যপদ্ধতি হ'তে এদের কোন দলটি কোন অপকর্ম্মটি করেছে তা বলে দেওয়া যায়।

"আমি একজন পুরানো পিকপকেট হুজুর। সেদিন এক ছোকরা সাকরেদকে নিয়ে পথ চলছিলাম, আমার পরণে ছিল চোস্ত বিলাতী স্যুট, তা ছাড়া দেখছেন তো, আমার রঙটাও একটু কটা, আমার সাকরেদটি হঠাৎ একজন ছোকরা পথিকের পকেট থেকে ব্যাগটা টেনে বার করে নিল। ছোকরাটিকে সে যতটা অসাবধান মনে করেছিল, ততটা অসাবধান সে ছিল না। ছোকরাটি সঙ্গে সঙ্গেই আমার শিষ্যের হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "চোর চোর!" আমার চেলা একটা ঝটকান মেরে ছোকরাটির হাত হতে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। ইতিমধ্যে আমার অপর কয়জন সাকরেদও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। সমবেত জনতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও "চোর চোর" বলে বন্ধুর পিছন পিছন ছুটে চলল, উদ্দেশ্য সুবিধা মত তাকে জনতার হাত হ'তে উদ্ধার করা। কয়েকজন সাইক্লিষ্ট তখন এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, তারা জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে আমার চেলাটিকে ধরে ফেললে, আমিও এতক্ষণে ছুটতে ছুটতে এসে বাম হাতে তার গলাটা টিপে ধরলাম, তার পর ডান হাত দিয়ে তাকে কয়েকটা চড়

কসিয়ে বলে উঠলাম, 'শালে হামরা পকেট তুম্ মারেগা। লে আও হামরা রুপেয়া, ব্ল্যাডি সোয়াইন।' 'সাকরেদটি তখন ব্যাগটি আমার হাতে তুলে দিয়ে সকাতরে বলে উঠল, 'লিজিয়ে সাব, আপকো রুপেয়া। হামকো পুলিশমে মাৎ দিইয়ে। হাম এইসেন কাম আউর নেহি করেগা।' উত্তরে আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'চোপরাও, আলবৎ তুমকো পুলিশমে দেগা। এই, ট্যাক্সি, ট্যাক্সি।' দৈবক্রমে একখানি ট্যাক্সি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। আমি সাকরেদের চুলের মুঠিটি ধরে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে নিয়ে—উভয়েই আমরা সরে পড়লাম, সাহেব দেখে কেউ আর আমার সঙ্গ নিল না! আসল ফরিয়াদী হাঁপাতে হাঁপাতে অকুস্থলে পৌঁছানোর আগেই আমরা বামাল সহ সরে পড়ি।"

এই পিকপকেটদের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাক।

"আরে মশাই, ক্যানিং ষ্ট্রীট্ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই ছেলেটা আমার পায়ে পা বাধিয়ে সটান শুয়ে পড়ে কেঁদে উঠল। আমি মনে করলাম, সত্যিই পড়ে গেল বুঝি। হাত ধরে একে উঠাতে যাচ্ছিলাম। যেমন নীচু হয়েছি, অমনি এক বেটা কোথা থেকে এসে আমার পকেট থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে দে ছুট। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমি বুঝে নিলাম, আর ধরে ফেললাম এই ছেলেটাকে।"

এই পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে অপর আর একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"রাত তখন প্রায় দশটা, রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম, এমন সময় একটি কঠিন বস্তু আমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল। চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম, সেটি কোনও দ্রব্য নয়, মানুষ। লোকটা ততক্ষণে আমার পায়ের উপর পড়ে গোঙরাতে সুরু করেছে। আমার মুখ দিয়ে

বার হয়ে এল, 'কি রে বাবা, মাতাল নাকি ?' লোকটা এইবার দুই হাতে আমার পা দুটা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলল, 'না বাবা, আমি ভদ্রলোক, তবে একটু বেশী খেয়েছি। দয়া করে যদি একটা রিক্সা ডেকে দেন। মাইরি বাবা—'

মানুষটাকে দেখলে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়; শুধু তাই নয় ধনী লোকও বটে। সোনার বোতাম ও রিষ্টওয়াচ্ তো আছেই, তা ছাড়া একটা হীরার আঙটিও তার হাতে দেখলাম। এইরূপ অবস্থায় তাকে ফেলে গেলে তার বিপদ ঘটতেও পারে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাড়ী কোথায় আপনার ? কদ্দূর এখান থেকে ? শান্তভাবে আসেন তো পৌছে দিতে পারি।' ইতিমধ্যে একটা রিক্সাও সেখানে এসে গেল, আমি জোর করে মাতালটিকে রিক্সায় তুলে দিই। কিন্তু মাতালটা আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর বলে, 'তুমি আমার বাপ ভাই, এই কাঁকুড়গাছির মোড়ে, একটু পৌছে দাও' ইত্যাদি। ইতিমধ্যে আরও দুই একজন লোক সেখানে জড় হয়েছে, সকলে মিলে আমায় অনুরোধ জানায়, তাকে বাড়ী পৌছবার জন্যে। এর পর আমি রিক্সায় উঠে মাতালটির পাশে বসে পড়ি একরকম বাধ্য হয়েই। ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি করে রিক্সা ছুটে চলল, মাতালটা কিন্তু কিছুতেই শান্ত হয়ে বসতে চায় না। কখনও সে ঠেলে দাঁড়িয়ে উঠে, কখনও বা নেতিয়ে পড়ে, কখনও বা দুই হাতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে, এমন বিপদে আমি জীবনেও পড়ি নি। কাঁকুড়গাছির মোড়ে এসে, কিন্তু লোকটা শান্ত হয়ে উঠল। ছোট একটা হাই তুলে সে বলে উঠল, 'বাঃ, বেশ হাওয়া বইছে তো! আরে, আপনি কে মশাই, কে আপনি ? এই রিক্সা, এই রোকো।' বেশ বোঝা গেল লোকটার নেশা কেটে গেছে। বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে রিক্সা থেকে নেমে

পড়ে একটি দশ টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিল, বকশিস্ স্বরূপ। বলাবাহুল্য আমি ধন্যবাদের সহিত তার এই দান প্রত্যাখ্যান করি। এর পর লোকটা শীস্ দিতে দিতে সামনের একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে, রিক্সা ভাড়া না চুকিয়েই। এদিকে রাত অনেক হয়েছে, মাতালটার পিছন পিছন আর ধাওয়া করা নিরর্থক। রিক্সা ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিতে মনস্থ করে হাত উঠাতেই লক্ষ্য করলাম, আমার বুক পকেটটা কাটা—এবং আমার ব্যাগ সমেত সমুদয় অর্থ অপহৃত হয়েছে। এর পর আমি দৌড়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ি, কিন্তু ততক্ষণে সে সেখান থেকেও উধাও হয়েছে, আমি আর তাকে ধরতে পারি নি, আমি বুঝতে পারি, আসলে লোকটা মাতাল নয়, সে পিকপকেট মাত্র, এবং এও বুঝতে পারি, যে সকল লোক মাতালটাকে বাড়ী পৌছবার জন্যে আমায় অনুরোধ জানিয়েছিল, তারাও ঐ এক দলেরই দলি।”

কিছুকাল পূর্ব্বে ঝিনঝিনিয়া নামক এক রোগের কথা শুনা গিয়েছিল। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ নাকি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ত, যদিও কিনা এই রোগ সংক্রান্ত সকল কাহিনীই ছিল কল্পিত বা গুজব মাত্র। এই সময় দুর্ব্বৃত্তরা হঠাৎ এক পথিককে বেছে নিয়ে তার মাথায় জল ঢালতে সুরু করেছে, “ঝিনঝিনিয়া হয়েছে” এই কথা বলে এবং তারপর তার পকেট থেকে তারা অর্থ অপহরণ করেছে,—এই-রূপ অনেক কাহিনীও ঐ সময় শুনা গিয়েছে। এই ধরণের আর একটি কাহিনী সম্বন্ধে নিম্নে বলা যাক্।

“রাস্তা দিয়ে সেদিন একটা পকেট ভারী লোক যাচ্ছিলো। হঠাৎ আমরা তার কাছে ছুটে যাই। আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠে—এই পড়ে গেলেন বুঝি। আমাদের অপর আর এক বন্ধু ভদ্রলোককে বলে উঠে—অত কাঁপছেন কেন? ওঃ, চোখ দুটো বড্ড লাল হয়েছে। এর

পর ভদ্রলোককে আর কোনও রূপ উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়ে তার গলার কম্ফর্ট ও গায়ের জামাটা খুলে দেই, শুধু তাই না, তাকে বাতাস করতেও সুরু করি। রাস্তায় ভীড় জমে যায়, কিন্তু কেউই ভিতরের আসল ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। ইত্যবসরে আমাদের একজন ভদ্রলোকের পকেট হ'তে যাবতীয় অর্থ অপহরণ করে সরে পড়ে এবং কিছু পরে আমরাও ঐরূপ ভাবে সরে পড়ি, মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই সকল কার্য্য সমাধা ক'রে—"

সাধারণতঃ দেখা যায়, পিকপকেটদের মধ্যে যে পকেট কাটে, সে কখনও বামাল সঙ্গে রাখে না, সে সঙ্গে সঙ্গে অর্থাদি অপর এক ব্যক্তির সাহায্যে পাচার (Pass) করে দিয়ে থাকে। এই কারণে এই ব্যক্তি অকুস্থলে ধরা পড়লেও তার কাছে অপহৃত দ্রব্য বা অর্থ প্রায়ই পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এরা পকেট বা গাঁট কাটার উদ্দেশ্যে বোতল ভাঙা কাঁচ ঘসে একপ্রকার ক্ষুর-ধার ছুরি তৈরী ক'রত, কিন্তু আজকালকার পিকপকেটরা চাকু ব্যবহারও করে না, এরা সকলেই এখন রেজার ব্লেডের সাহায্যে পকেট কেটে থাকে। এদের একজন দলের লোকের সুবিধার জন্যে এক বাণ্ডিল রেজার ব্লেড সহ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং একটি অপকার্য্য সমাধা হওয়ার পর অপর কার্য্যের জন্যে সে তৎক্ষণাৎ আরেকখানি ব্লেড দলের লোকদের সরবরাহ করে দেয়। এরা দুইটি আঙুলের সাহায্যে পকেট কাটা সমাধান করে; পিকপকেটরা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ব্লেডটিকে নিম্নে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে, ঐ দুইটি আঙুলের সাহায্যেই নোটের বাণ্ডিলাদি পকেট হ'তে বার করে নেয়। এইজন্য এক একটি ব্লেড দ্বারা মাত্র একটিবার পকেট কাটা চলে। কারণ অকুস্থলের রাস্তা হতে নিক্ষিপ্ত ব্লেডটি পরবর্ত্তী অপকর্ম্মের জন্যে উঠিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে ঐ সময় আর সম্ভব হয় না।

এইবার পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যাক। এ সম্বন্ধে জনৈক পিকপকেটের নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। বিবৃতিটি পকেটমারদের মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

"পকেট মারার পূর্ব্বে আমরা মানুষকে জোরে একটা ধাক্কা দিই, এবং এর পরেই তার পকেটটা কেটে ফেলি। ফলে পকেট কাটার জন্যে ছোট ধাক্কাটি সে আর অনুভব করে না। মানুষ তখন বড় ধাক্কার কথাই ভাবে এবং অসাবধানে পথ চলার জন্যে আমাদের গাল পাড়ে। এক কথায় বড় ধাক্কার আওতায় ছোট ধাক্কাটি আর অনুভব হয় না। এ ছাড়া আমাদের কেউ কেউ পকেটে একটা টোকা মেরেই বুঝতে পারে, লোকটার পকেটে নোট আছে, না কাগজ আছে।"

উপরের কাহিনী হতে বুঝা যাবে যে, পিকপকেটদের স্পর্শ বোধ বা touch sensation অত্যধিক। ইহা তারা অভ্যাস ও স্বভাবগতভাবে অর্জ্জন করে। এদের নিয়ে যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা আমি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

উপরে দলবদ্ধ পিকপকেটদের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া একক পিকপকেটও দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ রেল, ষ্টীমার ও পোষ্ট অফিসের ও ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে ভীড়ের মধ্যে এসে পকেট মেরে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিস থেকে এরা ফরিয়াদীদের অনুসরণ করেও তাদের পকেট কেটে থাকে। এদের কেহ কেহ ভীড়ের সময় বাস ও ট্রামে উঠেও পকেট মেরেছে। হাটে ও বাজারেও এদের গতিবিধি দেখা যায়, মেলাতেও। ট্রামে ও বাসের পাদানিতেই এরা অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, অপকর্ম্মের সুবিধার জন্যে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্রামের বা বাসের কোনও কোনও কনডাকটারের সহিত এদের যোগসাজস থাকে এইরূপও কেহ কেহ সন্দেহ করেন, তবে ইহা যে সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এইরূপ মনে করা সমীচীন হবে না।

কোনও কোনও ভদ্রবেশী পিকপকেট শালের জোড়া গায়ে বা গরদের পাঞ্জাবী পরে ট্রামে উঠে কোনও যাত্রীর পাশে এসে বসেন। তার হাতের দামী ঘড়ি ও হীরার আঙটিটা দেখে, যাত্রীটি সসম্ভ্রমে তাঁকে তাঁর পাশে বসতে সাহায্যও করে। এর পর নানা কথায় যাত্রীটিকে অন্যমনস্ক করে পিকপকেটটি বেমালুম তার পকেটটি খালি করে নেমে পড়ে। এ সম্বন্ধে কোনও এক ফরিয়াদীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"ট্রামে বসে আছি, এমন সময় চোস্ত বিলাতি স্যুট পরা এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসলেন। এর পর চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট দি টাইম প্লিজ্। আমি আমার হাতের ঘড়িটি তুলে ধরতেই কখন যে তিনি আমার পকেটের ব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছিলেন তা আমি টেরও পাই নি।"

এই সকল পিকপকেটরা প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি হয়ে থাকে এবং এদের কেহ কেহ কাজের সুবিধার জন্যে দুই একটা ইংরাজী বুকনিও শিক্ষা করে। এরা হিন্দি ভাষা ও বাংলায় কথা বলতে পারে, কেহ কেহ চোস্ত উর্দ্দু ও বলতে পারে। এই পিকপকেটদের চাপ-জ্ঞান অত্যন্তরূপ অধিক। কতখানি চাপ দিলে শুধু পকেটের উপরটা কাটবে, নীচের জামা বা গাত্রচর্ম্ম কাটবে না তা তাদের বেশ ভাল রকম জানা আছে। অধুনাকালে অনেক ভদ্রঘরের বাঙালী পিকপকেটও দেখা যাচ্ছে।

এদের সময়ের পরিজ্ঞান অতীব তীব্র। কোনও এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার এক সেকেণ্ড পরে বা পূর্ব্বে পকেট মারলে তারা ধরা পড়তে পারে। এইজন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পকেট কেটে থাকে এবং এই জন্য তারা ধরাও পড়ে না। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছি যে ইহাদের সময়ের পরিজ্ঞান (Time Reaction) অতীব প্রখর।

পূর্ব্বকালে এই পিকপকেটরা কলিকাতায় কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল তা নিম্নের কাহিনীটি হ'তে বুঝা যাবে।

"প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বের কথা। এই সময় কলিকাতার মধ্যাংশে বহু বড় বড় বস্তি বিদ্যমান ছিল। কলিকাতার এই বস্তিসঙ্কুল অংশের সহিত গহন বনানীর তুলনা করা চলত, কারণ এই বস্তির বাসিন্দাদের সহিত শহরের ভদ্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা কমই পরিচিত ছিলেন। এই সকল ঘন বস্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধিগণ তাদের স্ব স্ব ডেরা, নির্ভয়ে স্থাপন করতে পারত।

এই সময় কোনও এক ধনী ব্যক্তির পকেট হ'তে একটি রূপার ঘড়ি চুরি যায়। এই ঘড়িটি তিনি বিবাহের সময় যৌতুকরূপে পেয়েছিলেন। এই জন্যে এই ঘড়িটির উপর তাঁর বিশেষ দরদ আছে—এই বলে তিনি কোনও এক ঊর্দ্ধতন অফিসারের নিকট কেঁদে পড়লেন। ঊর্দ্ধতন অফিসারটি সব কথা শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে যেরূপেই হোক ঐ দ্রব্যটি উদ্ধার করবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই সময় ঐ অঞ্চলে বড়মিয়া নামক এক ব্যক্তি পিকপকেটের সর্দ্দার রূপে পরিচিত ছিল। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন, 'বাপু, যে রকমেই হোক এই ঘড়িটা তোমায় উদ্ধার করতে হবে।' পিকপকেট সর্দ্দার রাজী হয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা আপনার ঘড়িটি কোথায় অপহৃত হয়েছিল?' উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে সিঁদুরে পটির মোড়ে?' 'ওঃ বুঝেছি তবে আসেন আমার সঙ্গে।' এই বলে পকেটমার সর্দ্দার তাঁকে একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে তুলে তাঁর চোখ দুটো পুরু কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল।' এর পর ঘোড়ার গাড়ীটি একটি বিরাট বস্তির মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালে ভদ্রলোকের চোখের বন্ধন খুলে দিয়ে তাঁকে একটি প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে

নিয়ে আসা হয়। ভদ্রলোকটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন ঐ হলঘরের মাটির দেওয়ালের উপর সোনার ও রূপার বহু মূল্যবান ঘড়ি সারি সারি টাঙান রয়েছে। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়ল একটি মূল্যবান সোনার ঘড়ির দিকে। ঘড়িটির একাংশে একটি হীরা ও কয়েকটি মুক্তা বসানো ছিল। ভদ্রলোককে হতবিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে পিকপকেট সর্দ্দার বলে উঠল, 'কৈ বাবুসাব! কোন ঘড়িটি আপনার? এর মধ্যে সেটা আছে? বেছে নিন!' প্রলুব্ধ হয়ে ভদ্রলোক ঐ মুক্তা ও হীরা বসানো ঘড়িটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন, 'আজ্ঞে, ঐ ঘড়িটাই হচ্ছে আমার!' 'এঁ্যা, বলেন কি? তাই না'কি?' ক্রুদ্ধ হয়ে পকেটমার সর্দ্দার উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, না! ওটা আপনার ঘড়ি নয়। আপনার হচ্ছে, কোণের দিকে ঝুলানো, ঐ রূপার ঘড়িটা। আপনি দেখছি আমাদের চেয়েও বড় অপরাধী ও লোভী ব্যক্তি। আসুন, চলে আসুন শীগ্‌গির। আপনার উপযুক্ত শাস্তিই আপনি পেয়েছেন। এর পর পকেটমার সর্দ্দার পুনরায় ভদ্রলোকের চোখ দুটো বেঁধে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ী করে তাকে চৌমাথা পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে চলে যায়, ঘড়িটা তাঁকে ফিরিয়ে না দিয়েই।"

অধুনাকালে কোনও কোনও পকেটমার দলবলসহ ট্রামে উঠে ডান হাত দিয়ে উপরের রড্ বা ডাণ্ডা ধ'রে ঈপ্সিত শিকারের (Victim) কাঁধের উপর ঐ হাতের বাহু ন্যস্ত করে। এই ভাবে বাহুর ধমনীর সহিত শিকারমন্য ব্যক্তির কাঁধের ধমনীর সংযোগ স্থাপন করে রক্ত-সঞ্চালন হতে বুঝতে চেষ্টা করে ঐ 'শিকার' ভদ্রলোক কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ইহা বুঝা মাত্র সে ইসারায় সাথীদের জানিয়ে দেয় যে ভীড়ের মধ্যে কাজ হাসিল করার সময় হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এইরূপ সংযোগ স্থাপন করার পর সর্দ্দারজী সন্দেহ এড়াবার জন্য তার মুখটি সর্ব্বদাই শিকারমন্য ব্যক্তির বিপরীত দিকে ফিরিয়ে রাখে।

এই পিকপকেটদের কার্য্যকরণ সম্বন্ধে নিম্নে একটি পকেটমার প্রধানের বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

'স্কুল কলেজ ও অফিসে যাবার সময় বাসে বা ট্রামে উঠে আমরা লেডিস সিটের পিছনে এসে দাঁড়াই। এই লেডিস্ সিট উঠা-নামার দরজার নিকটে থাকলে আমাদের আরও সুবিধে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে যুবকগণ মেয়েদের সহিত নামবার সময় সন্ত্রস্ত, উৎফুল্ল কিংবা ভাবে বিভোর থাকে। এই সুযোগে সারা গাত্র আলোয়ান আবৃত করে তাদের পাশে দাঁড়ালে এরা অন্যমনস্কভাবে ঘড়িশুদ্ধ হাতটা আমাদের আলোয়ানের ভিতরেই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

এরা ডান হাতের বাহু দ্বারা মানুষকে ধাক্কা দিয়ে বাম হাতটি ডান হাতের তলা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে মানুষের পকেট কাটে। এদের কেহ কেহ দুইটি আঙুলকে কর্ত্তনক্ষম কাঁচির ন্যায় করে লোকের পকেট হতে দ্রব্যাদি তুলে নেয়। এদের কেহ কেহ হাতের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি একদিকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলি অপর দিকে রেখে এইরূপ কাঁচি তৈরী করেছে। কখনও কখনও এরা প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলের দ্বারা কাঁচি তৈরী করে তাদের বাকি অঙ্গুলিগুলি মুঠির আকারে বুড়া অঙ্গুলি সহ হাতের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে। এদের কেহ কেহ আঙুল বা ব্রেসলেটের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার ছুরিকা লুকায়িত রেখে পথ চলে। অর্দ্ধ-অঙ্গুলির ন্যায় বাঁকানো ক্ষুদ্র ছুরিকা এদের কেহ কেহ জিহ্বার তলদেশে রেখে থাকে। সাধারণতঃ এরা দোকানে বা ব্যাঙ্কে গমন ক'রে দেখে কেউ টাকার লেনদেন করল কি'না। তারপর তারা তাকে অনুসরণ করে সুবিধাজনক স্থানে ও মুহূর্ত্তে তার পকেট খালি করে।

ছিন্নক চোর

ছিন্নক চোর বা ছিঁচকা চোর নির্ব্বল চৌর্য্য শ্রেণীর অন্তর্গত সরল চৌর্য্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। এদের দলে দুই বা তিনজনের অধিক ব্যক্তি প্রায়ই যুক্ত থাকে না—সাধারণতঃ এরা এককই অপকার্য্য করে থাকে। এই সব ছিন্নক চোরেরা সহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এবং সুবিধামত নারী ও শিশুদের গলা ও বাহু হতে তাবিজ, হার আদি অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। এদের ইংরাজীতে বলা হয় Snatcher; পূর্ব্বে এরা অলঙ্কারাদি টেনে ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে পালাত, কিন্তু অধুনাকালে এই কার্য্যে এরা wire cutter বা কর্ত্তন যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। এতদ্বারা নিমেষের মধ্যে অতি সহজে তারা তাদের কাজ হাসিল করতে সক্ষম হয়। কর্ত্তন যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি অনেকটা প্লাস (plus) বা সাঁড়াশীর মত দেখতে হয়, এর মুখে কিন্তু দাঁতের বদলে কাঁচির মত ধার থাকে। ইহা একটি সাধারণ যন্ত্র মাত্র, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

এই সকল অপরাধীরা অত্যন্তরূপ ধূর্ত্ত হয়। এই সম্বন্ধে কোনও এক ছিন্নক চোরের একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল, বিবৃতিটি প্রণিধান-যোগ্য।

"অপকর্ম্মের সুবিধার জন্যে আমরা এক অদ্ভুত উপায়ে গালের কসির মধ্যে থলি বানাই। ছোট ছোট নুড়িতে চূণ মাখিয়ে সেগুলি গালের কসিতে পুরে, কষির মধ্যে ফুটা করি। চূণের দ্বারা গালের ভিতরকার ছাল ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িত হয়ে ছিদ্র তৈরী হয়। এর পর এই ছিদ্রের মধ্যে আরও বড় বড় নুড়ি পুরে ছিদ্রটি বড় হতে আরও বড় করে উহাকে একটি গুপ্ত থলি বিশেষে পরিণত করি। গহনা বা অর্থাদি ছিনিয়ে নিয়ে উহা

আমরা তৎক্ষণাৎ গিলে ফেলি। সাধারণতঃ লোকে মনে করে আমরা ঐগুলি গিলেই ফেললাম। আসলে কিন্তু ঐগুলি আমরা গিলে ফেলি না। আমরা ঐগুলি গালের ভিতরকার ঐ থলির মধ্যে লুকিয়ে ফেলি। এই কারণে 'এক্স-রে' করেও কেহ আমাদের উদরে কোনও দ্রব্যাদির চিহ্ন দেখতে পায় না।'

কলিকাতা পুলিশ এই সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে প্রথমেই এদের গলদেশের ঐ সব থলির সন্ধান করে। গণ্ডের দুই দিকে অঙ্গুলির দ্বারা ঈষৎ চাপ দিলেই এরা থলির মধ্যে রক্ষিত দ্রব্যাদি উগরে ফেলে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা অপহৃত দ্রব্য যে গিলে না ফেলে তা'ও নয়, এক্স-রে (X-Ray) দ্বারা ইহা প্রমাণিতও হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় জোলাপ দিলে ঐ দ্রব্য বিষ্ঠার সহিত বার হয়ে আসে—তবে এইরূপ ছিন্নক চোরের সংখ্যা খুব কম। এই সব অপরাধীদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"অপকর্ম্মের সময় আমাদের কেহ কেহ বিশেষ ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকি। নিম্নে আমরা একটি ইজের বা পাতলা পাতলুন পরি, এবং উপরে একটা লুঙ্গি পরি। পাঞ্জাবীর উপর একটা কোটও চাপাই। অপকার্য্যের পর তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসে আমরা তাড়াতাড়ি কোট এবং লুঙ্গি খুলে ফেলে অকুস্থলে ফিরে আসি। এই অবস্থায় আমাদের দেখে ফরিয়াদি এবং আশেপাশের কোনও লোকেই আর আমাদের চিনতে পারে না। কারণ তাদের দৃষ্টি থাকে লুঙ্গি পরা কোট গায়ে ব্যক্তিদের দিকে, পাতলুন ও পাঞ্জাবী পরা ব্যক্তিদের দিকে তারা ফিরেও তাকায় না।"

এদের কোনও কোনও দল গঙ্গার ঘাট, মন্দির বা প্রমোদগৃহের পথে ওত্ পেতে অপেক্ষা করে। বিশেষ করে এরা প্রাচীনপন্থী মহিলাদেরই

শিকাররূপে বেছে নেয়, কারণ এই ভদ্রমহিলারা আদালতে সাক্ষ্য দিতে যেতে রাজী হন না। মাড়োয়ারী মহিলাদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য, এতে না'কি তাদের ইজ্জতহানির আশঙ্কা থাকে।

এই ছিন্নক চোরদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অপর দুইটি বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম। বিবৃতি দুইটি হ'তে এদের কার্য্যধারা সম্বন্ধে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি মশাই, অমুক বাবুর বাড়ীর একজন চাকর। মনিবের খোকাকে নিয়ে রাস্তায় হাঁওয়া খাচ্ছিলাম। এই সময় এই ভদ্রবেশী অপরাধীটিও সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি এমন ভাব দেখালেন, যেন খোকাকে তার ভাল লেগেছে। সামনের দোকান থেকে খোকার জন্মে তিনি লজেন্সও কিনতে চাইলেন। তিনি সস্নেহে আমার কোল হতে খোকাকে তুলে নিলেন এবং আমার হাতে একটা আধুলি গুঁজে দিলেন, লজেন্স আনবার জন্মে। দোকান থেকে লজেন্স কিনে ফিরে এসে দেখি, খোকা রাস্তার উপর বসে কাঁদছে, এবং তার গলার সোনার হারটা খোয়া গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও লোকটাকে কোথাও আর আমি দেখতে পাই না, আসলে লোকটা ছিল একজন ছিন্নক চোর Child Snatcher।"

এইবার অপর উদাহরণটি সম্বন্ধে বলা যাক্—

"আমি একজন সওদাগরী আফিসের কেরাণী। আপন মনে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমি ঘাড়ের নীচে এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি। বোলতা কামড়াল কিনা—তা অনুভব করার জন্মে পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়েছি মাত্র, এমন সময় কোথা থেকে একটা লোক এসে তাবিজ সমেত গলার (সোনার) হারটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। এর পর জামার কলারে আমি একটা পাতা দেখতে পাই, পরীক্ষা দ্বারা বুঝতে পারি উহা একটি বিছুটি গাছের পাতা।"

কোনও কোনও স্থলে গোবর বা বিষ্ঠাও নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এইরূপও শোনা গেছে। কোনও কোনও দুর্বৃত্ত এজন্যে ইরিটেণ্ট পাউডারও ব্যবহার করে থাকে। কেহ কেহ এজন্যে ডেঁযো বা কাটপিঁপড়াও ব্যবহার করেছেন। এইজন্য বিবিধ জাতীয় পিপীলিকা এরা বাটীতে পুষেও থাকে। শিকারের দৈহিক গঠন ও কৃষ্টি অনুযায়ী কম বেশী বিষাক্ত পিঁপড়া এরা ব্যবহার করে থাকে। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট আফিসগামী দরোয়ানদের নিকট হ'তেই দুর্বৃত্তরা এই উপায়ে নোটের বাণ্ডিল অপহরণ করে থাকে। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

এই ছিন্নক চোরেরা যে কেবলমাত্র হার প্রভৃতি দ্রব্য ছিনিয়ে নেয় তা নয়, সুবিধামত তারা আধুনিকাদের হাত হ'তে ভ্যানিটি ব্যাগও ছিনিয়ে নিয়েছে। বুদ্ধিমত্তায় (মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানে) এই ছিন্নক চোরেরাও কম যায় না। এ সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি হুজুর সাধারণতঃ নিউ মার্কেটে মেমসাহেবদের ব্যাগ ছিনিয়ে নিই। যে সকল মেমসাহেব অল্প দিন মাত্র বিলাত হ'তে এদেশে এসেছে, মাত্র তাদেরই আমি শিকাররূপে বেছে নিই। আমি প্রথমে লক্ষ্য করি মেমসাহেবের গাল বা গণ্ডের দিকে, যদি তার গাল দুইটি অধিক লাল দেখি তা হলে আমি বুঝে নিই, মেমসাহেব সবেমাত্র এদেশে এসেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক দিন থাকলে গালের এই লালচে ভাব কমে যায়। গণ্ডের মধ্যদেশে মনে মনে একটা বিন্দু এঁকে নিয়ে তার চতুর্দ্দিকের লালাভার বিস্তৃতি হতে আমরা বুঝে নিই, কতদিন এ মেমসাহেব ভারতে এসেছে। নবাগত বিধায় এই ধরণের মেমসাহেবের হাত হ'তে ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে তারা সহসা চীৎকার করে না,

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে, তারা অস্ফুটস্বরে উ-উ—, এইরূপ একটা শব্দ করে মাত্র, এই সুযোগে আমরাও সরে পড়তে পারি। এরা হঠাৎ পুলিশ ডাকে না, কর্ত্তব্য ঠিক করতে এরা একটু সময় নেয়।

এ ছাড়া আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে কি'না এক দৃষ্টিতে বলে দিতে পারে, কোন লোকটা ভীরু, কোন লোকটা বা সাহসী, কে একা যাচ্ছে, কার সঙ্গে বা অনেক লোক যাচ্ছে; এমন কি কার কাছে কি'ই দ্রব্য আছে তাও তারা অনুমান করে নেয়। এই ক্ষমতার জন্যে এদের আমরা গুণী বলি। কিন্তু যারা কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের আমরা বলি শেয়ানা। শেয়ানারা ব্যাঙ্কের কাউণ্টার, পোষ্ট আফিস ও ষ্টেশন থেকে শিকার অনুসরণ করে, গুণীরা কিন্তু রাস্তায় দেখেই এদের শিকার বলে চিনে নিতে পারে।"

উপরের কাহিনীটি হতে বুঝা যাবে যে, ভারতীয় অপরাধীরা কিরূপ 'স্পেসালিয়াজিসেনের' পক্ষপাতী। এই স্পেসালিয়াজিসেন বা একমুখা শিক্ষা এরা ব্যক্তি, কাল, স্থান ও দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে করে থাকে। কিন্তু য়ুরোপীয় বহু অপরাধীদের মধ্যে ভারতীয় প্রাথমিক অপরাধীদের ন্যায় ভারসেটাইলনেস্ বা বহুমুখী শিক্ষা দেখা গিয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় তারাও সম্ভবতঃ য়ুরোপীয় প্রাথমিক অপরাধী।*

এই ছিন্নক চোরদের সংঘটন পূর্ব্বকালে অতি উন্নত ছিল। তৎকালীন জনৈক অধ্যাপকের নিম্নোক্ত বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

---

* একজন যদি বোটানি, জুলজি ও জিওলজী এই তিনটি বিষয়েই M. A. পাশ করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি এই বিদ্যাত্রয়ের কোনটিকেই ভালবাসে না। যে জুলজীতে একমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত তার বোটানী বা জিওলজীতে একমুখী হতে ইচ্ছাই যাবে না।

"এই দিন অমুক রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে আমার কাঁধে ঝুলানো ছাতাটি নিয়ে অন্তর্দ্ধান হ'ল। ঐ স্থানে এক বস্তী সর্দ্দারের সহিত আমি পরিচিত ছিলাম, তাকে অনুযোগ করাতে সে আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। ঐ ঘরটিতে দেখি সারি সারি বহু ছাতা সাজান রয়েছে। কিন্তু আমার ছাতাটি সেখানে আমি দেখতে পেলাম না। ঐ কক্ষের অধিকারী তখন আমাকে বললে—বোধ হয় এখনও ছাতাটি এখানে জমা পড়ে নি। ঘণ্টাখানেক পরে এসে দেখবেন তো। এর পর আধঘণ্টা পরে সেখানে এসে দেখি আমার ছাতাটাও অপরাপর ছাতার পাশে সেখানে দাঁড় করানো আছে। আমি এ'ও বুঝতে পারি যে, এই এলাকায় যা কিছু কাজ তা মাত্র এরাই করে থাকে।"

উত্তোলক চোর

উত্তোলক চোরগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) শকট উত্তোলক বা Cart lifter, (২) বিপণি উত্তোলক বা Shop lifter, এবং (৩) পাশব উত্তোলক বা Cattle lifter। শকট উত্তোলকদের কার্য্য-পদ্ধতির মধ্যে কোনওরূপ মার-প্যাঁচ নেই। অসতর্ক বা ঘুমন্ত গাড়োয়ানদের পিছন দিক থেকে শকট হ'তে মাল সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনওরূপ বাহাদুরী নেই। তবে, হ্যাঁ, এদের গতি অতি দ্রুত হওয়া চাই। সাধারণতঃ মন্থরগতি শকটাদি হ'তেই দ্রব্যাদি এরা অপহরণ ক'রে থাকে। যেমন গো-শকট। সহরে একদল লোক আছে যারা ভোর রাত্রে শহরাগত তরকারীবাহী শকটের পিছন হতে তরকারী

অপহরণ ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করে. কোনও কোনও ক্ষেত্রে অশ্বযানের পিছনের রেকাবিতে উঠেও এরা ছাদ হতে দ্রব্য চুরি করেছে। কোনও কোনও অপরাধী এই শকট উত্তোলনের সুবিধার জন্যে সাইকেল ও মোটরাদি যানেরও সাহায্য নিয়ে থাকে, এর দ্বারা তাড়াতাড়ি সরে পড়ার সুবিধা আছে। এদের কেহ কেহ বাস ট্রাম প্রভৃতি দ্রুতগতি যানে আরোহীরূপে উঠে মালপত্র সরিয়ে নিয়েছে। তবে বহুক্ষেত্রে চালক প্রভৃতির সহিত এদের যে সর থাকেনি তাও নয়।

বিপণি উত্তোলকদের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে কিন্তু অনেক বুদ্ধির মার-প্যাচ দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ উত্তমরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে দোকানে এসে হানা দিয়ে থাকে। এস্থলে একজন বিপণি উত্তোলকের একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা কি'না তাদের গেঞ্জির উপর একটা রবারের বেল্ট এঁটে দিয়ে তার উপর একটি সার্ট ও কোর্ট চাপায়। দোকান হ'তে বস্ত্রাদি তুলে নিয়ে নিমিষে সেই গেঞ্জির নীচে এরা ঢুকিয়ে দেয়। গেঞ্জির নিম্নাংশ রবারের (গোল) বেল্ট দ্বারা বেষ্টিত থাকায়, উহা আর নীচে পড়ে না, ফলে অপরাধীটি হাত দুলাতে দুলাতে প্রকাশ্যেই বেরিয়ে আসতে পারে।"

এই সকল বিপণি উত্তোলকেরা যে সকল দোকানের খদ্দেরের সংখ্যা অত্যধিক, সেই সকল দোকানেই হানা দেয়। অন্যান্য খরিদ্দারদের নিয়ে ব্যস্ত থাকাকালীন তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে এরা কাজ হাসিল করে থাকে।

বামালসহ ধরা পড়ার পর এরা নানারূপ মিথ্যা ভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে, এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি বৌদির জন্যে কাপড় কিনতে গিয়েছিলাম। দোকানদার

বার তেরখানি কাপড় দেখায়, কিন্তু কোনটিই আমার পছন্দ হয় নি। শেষে দোকানদার ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠে, 'এতগুলার পাট ভাঙলেন, নেবেন না মানে, নিতেই হবে। এর পর তর্ক-বিতর্ক এবং গালি-গালাজও আরম্ভ হয়। অবশেষে দোকানদার 'মজা দেখাচ্ছি', বলে এই কাপড়টা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে থানায় ধরে এনেছে, আমি একেবারেই নির্দ্দোষ।" ..

এই বিপণি উত্তোলকেরা আইনানুসারে গৃহ চৌর্য্যের পর্য্যায়ে পড়ে থাকে। উহারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারার মতে অভিযুক্ত হ'য়ে থাকে। যে সকল অপরাধীরা গৃহ বেষ্টনির (enclosure) মধ্য হতে দ্রব্য চুরি করে তাদের গৃহ চোরই বলা হয়, কারণ বিপণিও গৃহ মাত্র। তবে যে সকল বিপণি বা দোকান উন্মুক্ত স্থানে থাকে, যেমন হাটে ও রাস্তায় দেখা যায়, ঐ সব দোকান হতে চুরি হ'লে ঐ চুরিকে গৃহ চৌর্য্য বলা হয় না। উহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা মতে ব্যক্তির নিকট বা সন্নিকট হ'তে চুরি বলা হয়। শকট উত্তোলকগণ এই কারণে ঐ দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা মতেই অভিযুক্ত হয়ে থাকে। গৃহ আবেষ্টনীর মধ্য হ'তে স্বাভাবিকভাবে চুরিকে বলা হয় বাটীর চুরি বা গৃহ চৌর্য্য, ইংরাজীতে ইহাকে বলে house theft, যে ভাবে মানুষ সচরাচর বাটীর মধ্যে যাতায়াত করে, সেইরূপ সোজা বা স্বাভাবিক পথে, গৃহে, দোকানে বা গুদামে প্রবেশ ক'রে যদি কেহ ঐ সকল স্থান হ'তে দ্রব্যাদি চুরি করে ত ঐ সকল চুরিকে বলা হবে 'গৃহ চৌর্য্য'।

এই বিপণি উত্তেলক বা শকট উত্তোলক ছাড়া অপর আর একপ্রকার উত্তোলক আছে, তাদের পশু উত্তোলক বা cattle thief বলা হয়। নিম্নে জনৈক পশু উত্তোলকের বিবৃতি তুলে দিলাম।

"ছাগল চুরি সম্বন্ধে আমরা একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করি, যাতে

করে ঐ ছাগল ডেকে উঠতে না পারে। আমরা গোটা কয় সরিষার দানা ছাগলের কানের মধ্যে ঢালিয়া দিই, এইরূপ অবস্থায় তারা কখনও ডাকে না, অভিজ্ঞতা হ'তে আমরা এইরূপ জেনেছি। কুকুর চুরির সময় সাধারণতঃ আমরা মাংস টুকরা দেখিয়ে তাদের বাইরে এনে পশুগুলিকে করায়ত্ত করি, কখনও কখনও পোষা মাদি কুকুরেরও সাহায্য নিয়ে থাকি।"

কোনও কোনও স্বভাব দুর্ব্বৃত্তজাতীয় ব্যক্তিরা এক অদ্ভুত উপায়ে গবাদি পশু চুরি করে। নিম্নে ঐরূপ এক ব্যক্তির বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

গরু প্রভৃতি চুরি করবার সময় আমরা খড়ের একটি গাত্র-আচ্ছাদন (cloak) বা পোষাক দ্বারা সারা অঙ্গ আবৃত করে নিই। এর পর আমরা চারণরত গবাদির সম্মুখে শুয়ে পড়ে বা বসে ধীরে ধীরে নিরালা স্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। গরু আমাদের গাত্রের খড় খাবার জন্য আমাদের পিছু পিছু অগ্রসর হতে থাকে। এইভাবে প্রলুব্ধ করে পশুদের সুবিধাজনক স্থানে এনে তাদের অপহরণ করি। বাড়ীর মধ্যে হ'তে গরু চুরি করবার সময় গৃহস্থ জেগে উঠলে আমরা ঐ খড়ের আচ্ছাদনসহ উঠানের খড়-গাদায় শুয়ে নিজেদের তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করি।

উত্তোলক চোরেরা বহুবিধ মনস্তত্ত্ব ও জৈব জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৎস্য উত্তোলক বা মৎস্য চোরদের কথা বলা যেতে পারে। মৎস্য চোরেরা পুকুরের জলের উপরিভাগে রাত্রিযোগে আলোড়ন করে অর্থাৎ 'ঘাই মারে'। এর ফলে বহুক্ষণ উপরে উঠতে না পারায় পর্য্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে বহু মৎস্য আধমরা হয়ে জলের উপর ভেসে উঠে। ঐ চোরেরা তখন মৎস্য সকল হাতে ধরে উপরে তুলে আনে। কোনও কোনও মৎস্য ভয়ে পাঁকে মাথা গুঁজে ও

তার ফলে পাঁকের গ্যাসে আহত হয়ে উপরে ভেসে উঠে। বহু মৎস্যদের শ্বাস গ্রহণের জন্য যে মাঝে মাঝে উপরে উঠতে হয় তা অজ্ঞ চোররাও জ্ঞাত আছে।

এ ছাড়া জাল বা পলো বা ছিপ দ্বারাও যে রাত্রিযোগে মাছ চুরি করা না হয় তাও নয়। কিন্তু গৃহস্থগণ এর প্রতিষেধকরূপে পুকুরের তলায় কাঁটা ও বহু ডালপালা ও কঞ্চি ডুবিয়ে রাখায় সব সময় জালের সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয় নি। এইজন্য অপরাধীরা উপরোক্তরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

এই পশু চুরি, গৃহ হ'তে সমাধিত হলে, দণ্ডবিধির ৩৮০ এবং মাঠ বা পথ হইতে চুরি হলে উহার ৩৭৯ ধারা মতে চোরেরা অভিযুক্ত হয়ে থাকে।

বিপণি, শকট ও পথ হ'তে চুরি সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার অপর কয়েক প্রকার গৃহ ও বহি চুরি সম্বন্ধে বলা যাক।

এই চৌর্য্যকার্য্য অপরাধিগণ পোষা জন্তু জানোয়ারদের সাহায্যেও সমাধিত করে থাকে। সাধারণতঃ পোষা কুকুর এবং বাঁদরের সাহায্যেই এই অপকার্য্য সমাধিত হ'য়ে থাকে। বেদিয়া প্রভৃতি স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতির ব্যক্তিগণ তাদের পোষা কুকুরদের এমন ভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলে যে তারা অনায়াসে নর্দ্দমা বা গবাক্ষের পথে বা উন্মুক্ত দুয়ারের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য গৃহস্থের গৃহে ঢুকে সুবিধামত জামা কাপড় বা থালা বাসন মুখে করে বেরিয়ে এসে ঐ অপহৃত দ্রব্য সকল মনিবদের নিকট প্রত্যার্পণ করে।

সহরাঞ্চলে, বিশেষ করে কলিকাতা শহরে এইরূপ অপকার্য্যের জন্যে অধিক ক্ষেত্রে বাঁদরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কলিকাতা শহরের চৌরঙ্গী রাজপথে ফুটপাতের উপর শ্বেতাঙ্গ পথিকদের উপর

এইরূপ বহু উপদ্রব সংঘটিত হয়েছে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে এই অপপদ্ধতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাবে।

"আমি একজন কলিকাতায় নবাগত ইংরাজ নাগরিক। এই দিন আমি আমার মেমসাহেবকে সঙ্গে করে চৌরঙ্গী রাস্তার পূর্ব্বদিকের ফুটপাত ধরে এগিয়ে চলছিলাম, এমন সময় হঠাৎ কোথা হ'তে দুই দুইটা বাঁদর ছুটে এসে আমাদের কাঁধের উপর চড়ে বসল। আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় বাঁদরটি আমার কাঁধে এবং ছোটটি আমার মেমসাহেবের কাঁধে জেঁকে বসেছিল। আমরা হস্ত দ্বারা ঝটকানি দিয়ে তাদের অতিকষ্টে অপসরণ করি। রাস্তার অপর ফুটপাতে দুইজন এদেশীয় ব্যক্তি চেন ও বগলস হাতে অপেক্ষা করছিল। বাঁদরদ্বয় এর পর ছুটে গিয়ে তাদের পায়ের তলায় বসে পড়ল। প্রথমে আমরা এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু মনে করি নি বরং এটাকে আমরা বাঁদরের বাঁদরামী মনে করে হেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে আমি লক্ষ্য করি যে, আমার বুক পকেট হতে দুইটা দামী ফাউণ্টেন পেন অপহৃত হয়েছে। এই সময় আমার মেমসাহেবও উপলব্ধি করলেন যে তাঁর হাতের রিষ্ট-ওয়াচটিও তারা টেনে খুলে নিয়ে গিয়েছে।"

গৃহ-চোর

কলিকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ বাটী আছে অথচ একটি বিশেষ দিন ও সময় একটি বিশেষ বাড়ীতেই বা চুরি হ'ল কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই গৃহস্থের মনে জেগে থাকে। এছাড়া গৃহমধ্যকার মূল্যবান দ্রব্যাদির রক্ষার গুপ্তস্থানগুলিরই বা তারা কোথা হ'তে সন্ধান পেল, এবং মালিকেরা কেউ যে ঐ দিন গৃহে থাকবে না, এ কথাই বা তারা জানালো কি করে,

এ প্রশ্নও নাগরিকদের মনে জেগে থাকে। আসলে বিষয়টি হয় এইরূপ,—কোনও বাড়ীতে চুরি করতে মনস্থ করলে, পেশাদারী চোর মাত্রই প্রথমে সুড়ুক সন্ধান নিয়ে থাকে, বিশেষরূপে সন্ধান না নিয়ে এরা কেহ কাজে অগ্রসর হয় না। এই সব সন্ধান তারা বাড়ীর চাকর, বা বয়াটে (বিপথগামী) ছেলেপুলেদের কাছ থেকেই নিয়ে থাকে। এই সকল চোরেরা বা তাদের নিযুক্ত চরেরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রায়ই খোলা যায়গায় বা রকের উপর বসে তাস বা ঘুঁটি খেলতে দেখা যায়। সাধারণতঃ দুপুর বেলায় বাটীর চাকর-বাকরদের কাজকর্ম্ম থাকে না। এই সময় এরা বাইরে এলে, চোরেরা এদের সঙ্গে আলাপ জমায়। এমন কি এরা এদের নিজ খরচে খাওয়ায়, এবং সিনেমাও দেখিয়ে থাকে। কেহ কেহ এদের কিছু কিছু অর্থ ধার বা দান স্বরূপও দিয়েছে। এই সকল চাকরদের নিকট হ'তে চোরেরা বাটীর যাবতীয় খোঁজখবর (গল্পের মধ্যে) প্রথমে সম্যকরূপে জেনে নেয়। কখনও কখনও এই সকল চাকরেরা সাক্ষাৎরূপে এদের সাহায্যও করে থাকে। ধীরে ধীরে এদের লোভ বর্দ্ধিত হওয়ার কারণে এইরূপ সম্ভব হয়। এই সময় মাত্র সামান্য কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে এই চাকরদের কেহ কেহ চোরেদের জন্যে রাত্রে বাটীর দরজাগুলি খুলেও রেখে দিয়েছে।* এই চাকরদের নির্দ্দেশমত এই গৃহ-চোরেরা যে সকল বাক্সে বা পেটিকায় মূল্যবান দ্রব্যাদি

---

* ধরা পড়ার পর এই চাকরেরা (কেহ কেহ) অপরাধ স্বীকার করলেও, আসল চোরেদের নাম বা ঠিকানা সম্বন্ধে কোনও কিছুই জানাতে অক্ষম হয়। আসলে চোরেরা তাদের নামধাম সম্বন্ধে এদের বলে না, বললেও ভুল খবর দিয়ে থাকে। অনেক সময় পাওনা বা হিস্যা নেবার জন্যে চোরেদের প্রদত্ত ঠিকানায় এসে এরা তাদের কোনও খোঁজ-

ন্যস্ত আছে, মাত্র সেইগুলিই অপহরণ করে থাকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ হাসিল না করতে পারলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, এই কারণে এইরূপ বিলি-ব্যবস্থা না করে বাইরের চোরেরা কোনও গৃহে দ্রব্যাপহরণের কারণে কদাচিৎ প্রবেশ করে। তবে ভিতরের চোরেদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। চাকর বা অন্যান্য ব্যক্তি বা আত্মীয়বর্গ, যারা বাটীতে বাস করে কিংবা যারা সাধারণতঃ ঐ বাটীতে যাতায়াত করে তাদের দ্বারা কোনও চুরি সমাধিত হলে, ঐ চোরদের ভিতরের চোর বলা হয়। ভিতরের চোরদের মধ্যে চাকর-চোরেরা অন্যতম। এই কারণে চাকর হিসাবে চুরির জন্যে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি পৃথক ধারা আছে। চাকর চোরদের ঐ দণ্ডবিধির ৩৮১ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। যে সকল চাকরেরা বাহিরের কোনও ব্যক্তির সম্পর্ক রহিত ভাবে মনিবের দ্রব্যাপহরণ করে, তাদেরই বলা হয় চাকর-চোর। চাকর-চোরদের সম্বন্ধে পরে বলা হবে। এক্ষণে এই গৃহ-চোরদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাক। নিম্নে একটি গৃহ-চোরের বিবৃতি তুলে দিলাম। বিবৃতিটি হ'তে গৃহ-চোর সম্বন্ধে কিছুটা বুঝা যাবে।

"আমাকে হিরু সর্দ্দার প্রথমে পানের সঙ্গে কোকেন খেতে শেখায়। এই নেশার খাতিরে প্রত্যহই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হই। সর্দ্দারজী আমাকে বায়স্কোপ দেখবার জন্যে প্রায়ই পয়সা দিত। এ-ছাড়া আমাকে সে নানারূপ কু-অভ্যাসও শেখায়, এছাড়া সর্দ্দারজী আমাদের জন্যে কয়েকটি মেয়েও এনে দেয়। আমাদের শিক্ষার জন্যে সর্দ্দারজী স্বগৃহে একটা স্কুলও খুলে ছিল, এইখানে আমরা তালা চাবি তৈরি করতে ও খুলতে শিখি। এর পর আমাদের পরীক্ষার দিন ধার্য্য হয়। সর্দ্দারজী আমার হাতে একটা কাপড় কাচা সাবান দিয়ে বলেন, 'যা দিকিনি, বাড়ী

গিয়ে মা'র আঁচল থেকে সিন্দুকের চাবিটি খুলে তার একটা ছাঁচ নিয়ে আয়।' আমি বাটী গিয়ে সুবিধামত মায়ের চাবিটা সাবানের নরম অংশে ঢুকিয়ে দিয়ে ছাঁচ তৈরী করি। সর্দ্দারজীর ডেরায় এই ছাঁচ থেকে চাবি তৈরী হয়। এর পর একমাসের জন্যে আমি মামার বাড়ী চলে যাই, ফিরে এসে শুনি মায়ের সিন্দুকের যাবতীয় গহনাপত্র চুরি গেছে।"

এই গৃহ-চোরেরা ব্যক্তি বা সম্পত্তির উপর কোনওরূপ আঘাত হানে না। এরা নানারূপ কৌশলের সাহায্যে গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ ক'রে দ্রব্য অপহরণ করে। এই সম্বন্ধে নিম্নে দুইটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"বাইরের ঘরে বসেছিলাম এমন সময় যন্ত্রপাতিসহ একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী এসে বলল, বড়বাবু তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, ইলেকট্রিক্ পাখাটার তেল দিতে এবং মেরামতও করতে। এর পর মিস্ত্রিটি তার দুইজন সহকারীর সাহায্যে কাজে লেগে যায়। আমি অনেকক্ষণ ধরে এদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছিলাম, এই সময় মিস্ত্রীটি একটুকরা ছেঁড়া নেকড়া এনে দেবার জন্যে অনুরোধ জানায়। সহকারী লোকটি এক গেলাস জলও খেতে চায়। কিছুক্ষণ পরে আমি ন্যাকড়া ও জল নিয়ে ফিরে এসে দেখি, ঘরের ইলেক্‌ট্রিক পাখা, রেগুলেটার ও বাল্ব কয়টি অপহরণ করে দুর্ব্বৃত্তরা উধাও হয়েছে।"

[এই বিশেষ অপরাধকে বলা হয় মিশ্র অপরাধ। এইখানে চুরির সহিত মিশান আছে প্রবঞ্চনা। প্রথমে প্রবঞ্চকরূপে অগ্রসর হয়ে এরা পরে চুরি করে পালিয়ে যায়।]

এইবার অপর বিবৃতিটি সম্বন্ধে বলা যাক। অপরটিকে চুরি না বলে জুয়াচুরী বলাই ভাল।

"আমার পুত্র 'অমুক' বার হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমার পুত্রের সমবয়স্ক একটি ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা, অমুক বাড়ী আছে?' ছেলেটি আমার পুত্রের সহপাঠী বলে পরিচয় দেয় এবং জানায় যে আমার পুত্র পড়বার জন্যে তার একখানা বই এনেছে, বইটা এক্ষুণি প্রফেসারের কাছে না নিয়ে গেলে বিশেষ ক্ষতি হবে। এমন করুণ ভাবে সে বাক্যজাল বিস্তার করে যে, আমি তার প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করি। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'তা বাবা, আমি তো সব বই চিনি না। ঐ টেবিলটায় ওর বই-টই থাকে, দেখে নাও না তুমি।' ছেলেটি এর পর টেবিল থেকে তিনখানি বই তুলে নিয়ে একটি পত্র আমার পুত্রের নামে লিখে আমার হাতে দেয় এবং এর পর আমার পায়ের ধুলা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে। ঘণ্টাখানেক পরে আমার পুত্র ফিরে এলে সকল সমাচার অবগত হয়ে অবাক হয়ে যায়। আমিও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। বুঝতে পারি আগে-ভাগে আমার পুত্রের নাম ও কলেজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ছেলেটা আমায় ঠকিয়ে গেছে।"

যে সকল গৃহ-চোরেরা বাটীর তালা বা গরাদ ভেঙে, নর্দ্দমা গলে বা পাঁচিল ও ছাদ ডিঙিয়ে অপকর্ম্মের জন্যে গৃহে প্রবেশ করে, তাদের বলা হয় সিঁদেল চোর, তালা তোড় বা সবল চোর। এরা এমন সব পথ দিয়ে (বা এমন ভাবে পথ ক'রে) গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ করে, যেরূপ ভাবে কিনা, সাধারণতঃ কেহ ঐ সব গৃহে প্রবেশ করে না। আইনানুসারে এই সব চোরেরা ঐ ভাবে সর্ব্বাঙ্গ প্রবেশ না করিয়ে যদি মাত্র তাদের হাত বা পা (দেহের অংশ বিশেষও) কোনও গৃহে প্রবেশ করায়, তা হলেও তাকে সবল বা সিঁদেল চোর বলা হয়। অর্থাৎ কি'না কেহ যদি রাস্তা হতে জানালার গরাদের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বস্ত্রাদি বার করে, তা হলেও তাকে

সিঁদেল চোর বলা হবে।* পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এই সিঁদেল চোরদের সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হবে !

লষ্ট রিলেশন ট্রিক

লষ্ট রিলেশন ট্রিক বা "অপহৃত পুত্রের পুনরাগমন" পদ্ধতি দ্বারাও পল্লী অঞ্চলের অপরাধিগণ সরলমনা পল্লীবাসীদের অর্থাদি অপহরণ করে থাকে। এরা প্রথমে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনে নেয়, কোনও পল্লীবাসীর কোনও পুত্র বহুকাল পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ আছে কি'না ! বিশ বা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ কোনও পুত্র কাহারও হারিয়েছে জ্ঞাত হওয়া মাত্র এদের একজন ঐ পুত্রের অভিভাকদের নিকট এসে নিজেকে তাদের সেই হারানো পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে থাকে, এরা ঐ ছেলেটির ছোটবেলায় ঘটেছে এমন অনেক কাহিনীও তাঁদের শুনিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এই সব কাহিনী তারা খোঁজ-খবর নিয়েই জ্ঞাত হয়ে থাকে। এর পর ঐ পরিবারের সকলেই তাকে আদর যত্নে আপ্যায়িত করতে থাকে। এই সময় দুর্ব্বৃত্তটি কি ভাবে এতদিন কোন্ কোন্ সাধুর সঙ্গে কোথায় কোথায় দিনযাপন করেছে, সেই সম্বন্ধে নানারূপ কল্পিত কাহিনী সকলকে

---

* কোনও কোনও অপরাধী রাস্তা হতে লোহার শিক বা লম্বা আঁকশীর সাহায্যেও জানালার ওপার হতে প্রায়ই দ্রব্যাদি বার করে নেয়। অনেক সময় জানালার ধারে তক্তপোষ বা খাটিয়ার উপর সালঙ্কারা কন্যা বা বধূরা শুয়ে থাকেন। জানালার গরাদের ভিতর হাত ঢুকিয়ে এই সব ঘুমন্ত কন্যা বা বধূদের হাত হতে অলঙ্কারাদিও এরা খুলে নিয়েছে এইরূপ কাহিনীও শুনা গেছে। এইগুলিকে গৃহ-চোর না বলে সিঁদেল চোরই বলা উচিত।

শুনাতে থাকে! এই সময় সে এও জাহির করে দেয় যে, সে এমন এক মন্ত্র শিখেছে যাতে করে কি'না সে এক ভরি সোনাকে দু ভরি করে তুলতে সক্ষম। পরিবারভুক্ত সকল ব্যক্তিই তাকে বিশ্বাস ক'রে স্ব স্ব সোনা-দানা এনে তার হাতে সেগুলি সরল বিশ্বাসে তুলে দেয়। দুর্ব্বৃত্তটি তখন প্রতিশ্রুতি মত যাগযজ্ঞ শুরু করে দেয়। এই সোনা দ্বিগুণ করবার জন্যে দুর্ব্বৃত্তটি ঐগুলি বিল্বপত্র ও ফুলের তলায় রেখে দেয় এবং পরে সুযোগ মত সে ঐগুলি ঐ স্থান হ'তে সকলের অজ্ঞাতসারে তুলে নিয়ে রাত্রিযোগে পলায়ন করে থাকে।

সহরের লোকেরা, কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকদের ন্যায় সরল প্রকৃতির নয়। এই সব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে তারা বিশ্বাসীও নয়, এই জন্যে সহর-বাসীদের দ্রব্যাদি অপহরণের জন্যে দুর্ব্বৃত্তরা ভিন্নরূপ পন্থা অবলম্বন ক'রে থাকে—কারণ এখানকার সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন হয়, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। সহরে চোরেরা কতদূর ধূর্ত্ত হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"আমরা কোনও এক আমেরিকান ডিপোতে কাজ করতাম। এই ডিপোর প্রতি গেটেই আমেরিকান পুলিশরা পাহারা দিত। এদের নজর এড়িয়ে কোনও দ্রব্যাদি বাইরে নিয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। আমরা তখন দ্রব্য চুরি করবার একটি সুচতুর মতলবের আশ্রয় নিই। আমাদের মধ্যে একজন চোরের অভিনয় করত, বাকি সকলে কি করতো জানেন? তারা ওই চোরের মাথায় চোরাই দ্রব্য চাপিয়ে, তার কোমরে দড়ি বেঁধে গেটের নিকট এনে সৈনিক পাহারাদের সম্বোধন করে বলতো, 'সাহেব, এই এক বেটা চোর, বামাল শুদ্ধ ধরেছি, থানায় নিয়ে যাব।' শান্ত্রী সাহেবরা 'ঠিক হ্যায়, লে যাও থানে মে,' বলে আমাদের বামাল শুদ্ধ গেট পার করে দিত। এর পর কে আর কার

খবর রাখে, আমরা বাইরে এসে থাউ বা বামাল-গ্রাহকদের কাছে এই সব দ্রব্য বিক্রী করে দিয়ে বাড়ী ফিরতাম।"

আজকাল স্থান বিশেষে এক অদ্ভুত প্রকারের অপকর্ম্মের কথা শুনা যাচ্ছে। সহরের এই সকল অঞ্চলে এমন সব লোক বাস করে যাদের বুদ্ধিমত্তা পল্লী অঞ্চলের লোকের মত সংস্কারাচ্ছন্নও নয়, আবার সহরের অধিকাংশ লোকের ন্যায় অত্যন্তরূপ চৌকসও নয়। এদের বুদ্ধিমত্তা পল্লী এবং নগরবাসী ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তার মাঝামাঝি; এদের মধ্যম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তিও বলা চলে। এই সকল ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে অর্থাপহরণ করবার জন্যে এদের বুদ্ধিমত্তা (বুদ্ধির দৌড়) অনুযায়ী অপপদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতিটি হতে উক্ত প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতিটি সম্বন্ধে বুঝা যাবে। বিবৃতির (হিন্দি) বাংলা তর্জ্জমা নিম্নে প্রদত্ত হল।

"আমার পতি (স্বামী) বেরিয়ে যাবার পাঁচ ঘণ্টা পরে একজন মাড়োয়ারী এক ঝুড়ি আম নিয়ে বাড়ী ঢুকল। আমের ঝুড়িটি আমার সম্মুখে রেখে সে বলেছিল; 'মাজী! এই ফল বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন আর বলে দিয়েছেন আপনার হাতের বাজু আর গলার হারটা নিয়ে আসতে, ওগুলো পালিশ করে নিয়ে আসবেন তিনি।' আমি তার কথায় অবিশ্বাস করি নি, আমি নিঃসন্দেহে তার হাতে গহনাগুলি তুলে দিয়াছিলাম।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেকে হঠাৎ সোনার গহনা খুলে দেয় নি, কিন্তু গহনার বদলে রিপু করবার বা কাচাবার জন্যে শাল বা বস্ত্রাদি চাইলে দুর্বৃত্তরা সহজেই সেইগুলি করায়ত্ত করতে পেরেছে।

এদেশের স্বভাব-দুর্বৃত্তজাতিদের মধ্যে এমন অনেক জাতি আছে যারা কেবলমাত্র চুরি ডাকাতির দ্বারা জীবন যাপন করে। এদের এক একটি দল এক এক পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা চৌর্য্য কার্য্য করে থাকে। ইরাণি

জিপসী এবং সন্দার জাতীয় পুরুষেরা চৌর্য্য কার্য্যের জন্যে প্রায়ই কোনও দোকানে এসে দোকানদারের সহিত কলহে লিপ্ত হয়, ইত্যবসরে এই দলের মেয়েরা দোকানের দ্রব্যাদি বেমালুম ভাবে চুরি করে বস্ত্রাচ্ছাদন মধ্যে লুকিয়ে ফেলে থাকে। এই সকল স্বভাবদুর্ব্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে সাহুরিয়া ব্রাহ্মণ, চন্দ্রবেদী নামে এক জাতি আছে। এই জাতির লোকেরা এক অদ্ভুত উপায়ে উচ্চশ্রেণী হিন্দুদের ঠকিয়ে থাকে। এদের মধ্যে একজন স্নানের ঘাটের নিকট হঠাৎ একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে ছুঁয়ে দিয়ে বলে উঠে, 'ক্ষমা করবেন ঠাকুর, হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলেছি। আমি সামান্য একজন মেথর, যেন অকল্যাণ হয় না আমাদের' ইত্যাদি। এর পর ঐ উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকের স্নান করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এদিকে দ্রব্যাদি ঘাটের চাতালে রেখে ভদ্রলোক জলে নামামাত্র, দুর্ব্বৃত্তটি দ্রব্যাদি চাতাল থেকে তুলে নিয়ে চম্পট দিয়ে থাকে। কখনও কখনও এরা বিষ্ঠার হাঁড়ি নিয়েও ভদ্রলোকদের ছুঁয়ে দেয়, উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারেণ তাদের স্নান করানো—উপরের পাড় হতে দ্রব্য চুরি করবার সুবিধার জন্যেই এরা এইরূপ করে থাকে। যদি এরা কোন মহিলাকে পুষ্করিণী বা নদীর পাড়ে দ্রব্যাদি পাহারায় নিযুক্তা দেখে তা হ'লে এরা এমন ভাবে মল বা মূত্র ত্যাগ করতে বসে, যাতে ক'রে কি'না মহিলাটি অন্য দিকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হয়; ইত্যবসরে দলের অপর আর একজন ঐ দ্রব্যাদি তুলে নিয়ে এক ছুটে পালিয়ে যায়।

এই চন্দ্রবেদী জাতিরা ব্রাহ্মণাদি জাতিকে উপরিউক্ত ভাবে বিভ্রান্ত করলেও এরা নিজেরা উচ্চশ্রেণীরই হিন্দু, কিন্তু এরা এদের গোষ্ঠীর মধ্যে এক চামার ও ঝাড়ুদারদের ছাড়া, সকল শ্রেণীর হিন্দুদেরই গ্রহণ করে থাকে, এমন কি মুসলমানদেরও। বর্ণহিন্দুদের এই অস্পৃশ্যতা দোষের

সুযোগ কোনও কোনও শহরের লোকও নিয়ে থাকে, এ সম্বন্ধে একজন শহরবাসী ছোকরার বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা দুইজন একটি টি-পার্টিতে আহূত হয়েছিলাম। আমরা একটি টেবিলে দুইজন টিকিধারী ব্রাহ্মণকে বসে থাকতে দেখে ঐ টেবিলের পাশে ন্যস্ত অপর দুইটি চেয়ার দখল করে বসলাম। টেবিলে খাদ্যসহ চারিটি মাত্র রেকাবী রাখা ছিল। আমরা তখন লোক দুইটিকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথোপকথন সুরু করলাম। আমি আমার বন্ধুকে উদ্দেশ করে বললাম, 'জাতি ভেদ ভাই একটা পাপ বিশেষ। এই তুই তো ব্রাহ্মণ আর আমি হচ্ছি দুলে বাগ্দী—এই পর্য্যন্ত শুনামাত্র ভদ্রলোক দুজন একটু নড়ে বসলেন, তারপর রেকাব দুটিতে আর হাত না দিয়ে উঠে পড়লেন। এই সুযোগে আমরাও হুপাহুপ করে চারিটি রেকাবের খাবারই সাবড়াতে আরম্ভ করলাম, তবে আমরা (দু'জনেই) আসলে ব্রাহ্মণ সন্তানই ছিলাম।"

স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে এমন দুই একটি দল আছে যাদের পুরুষরা (প্রাপ্তবয়স্ক) নিজেরা চুরি করে না, চুরি করে তাদের ছোট ছোট ছেলেরা, হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে বড়রা এসে ঐ সকল ছেলেদের মার-ধোর করে এবং ফরিয়াদীদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে ছেলেগুলিকে মুক্ত করে নেয়। এই সকল দলের কেহ কেহ সাধু সন্ন্যাসী সেজেও ঘুরা-ফিরা করে, কেহ কেহ ধরা পড়ার পর নির্ব্বোধ বা পাগলের মতও অভিনয় করে থাকে। কেপমারী দলের ছেলেরা ধরা পড়লে প্রায়ই মূক বা বোবা সাজে, এরা জিহ্বা এমন ভাবে উপরে বা নিম্নে গুটিয়ে নেয়, যাতে করে কি'না তাকে বোবাই মনে হবে। কোনও কোনও সময় এরা ফকিরের বেশে কোনও দোকানে এসে জিনিস কেনবার অছিলায় করদ রাজ্য প্রচলিত মুদ্রা প্রদান করে। দোকানদার এই মুদ্রা গ্রহণে

অসম্মত হলে সে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তা'হলে কি এদেশের মুদ্রা ভিন্ন প্রকারের ?' এই বলে সে এদেশের একটি মুদ্রা দেখতে চায়। দোকানদার প্রচলিত একটি রৌপ্য মুদ্রা দেখবার জন্যে তার হাতে তুলে দিলে, সে তৎক্ষণাৎ হাতসাফাইএর সাহায্যে উহা সরিয়ে নিয়ে ঐ স্থলে একটি জালি মুদ্রা এনে, ঐ মুদ্রাটিই দোকানদারকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে। এই দুর্ব্বৃত্ত জাতি সকল এবং তাদের বিভিন্ন প্রকার অপপদ্ধতি-গুলি সম্বন্ধে পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হবে। এক্ষণে অন্যান্য চৌর্য্য পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ক'রে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাক।

সবল চোর

সবল বা সিঁদেল চোরকে ইংরাজীতে বলা হয় Burglary বা House Breaking. যে সকল চোর-কার্য্যে বল প্রকাশ করা হয়, সেইরূপ চৌর-কার্য্যকে বলা হয় সবল চোর। এই বলপ্রকাশ মাত্র সম্পত্তির উপর করা হয়, ব্যক্তির উপর করা হয় না, এমন কি বাধা পেলেও এরা আঘাত হানে না ; তবে কোনও কোনও স্থলে প্রত্যাগমনের পথে বাধা পেলে, আত্ম-রক্ষার্থে এরা আঘাত হেনেছে এইরূপ শুনা গেছে। অপকর্ম্মের পূর্ব্বাহ্নে বাধা পেলে সাধারণতঃ এরা বিনা দ্বন্দ্বেই প্রত্যাগমন করে থাকে। দুয়ার বা তালা ভেঙে যারা চুরি করে বা যারা সিঁদ কাটে, বা যারা দড়ির সাহায্যে বা পাঁচিল টপকে পর-গৃহে প্রবেশ করে তাদেরই সাধারণভাবে বলা হয় সবল চোর, তালা তোড় বা সিঁদেল চোর।

কলিকাতা শহরে সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর বাঙ্গালী, নেপালী এবং হিন্দুস্থানীদেরই দক্ষ তালা তোড়রূপে দেখা গিয়েছে। এদের মধ্যে

পেশাদারী তালা তোড়রা প্রায়ই ঘটনাস্থলে বিষ্ঠা ও পোড়া বিড়ি ফেলে রেখে গিয়েছে। এদের কোনও দল প্রাঙ্গণে, কোনও দল অলিন্দায়, কোনও দল প্রবেশ বা নির্গমন পথে এ সকল দ্রব্য ফেলে রেখে যায়। এই সকল দ্রব্য কোন স্থানে পরিত্যক্ত হয়েছে তা দেখে, ঐ অপকর্ম্মটি এদের কোন দল দ্বারা সমাধা হয়েছে তা বলে দেওয়া গিয়েছে। বেদিয়া প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তরা তুকরূপে ঘটনাস্থলে শিকড় প্রভৃতি ফেলে রেখে গেলেও এই বিষ্ঠা ও বিড়ি ত্যাগ কিন্তু অনুরূপ কোনও তুক নয়। এর অভ্যাসের প্রকৃত কারণ পরে বিবৃত করা হবে।

এইবার এই সিঁদেল চোরদের অপকর্ম্মের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এই সিঁদেল চোরদের দলে সাধারণত চার হ'তে নয় বা দশজন পর্য্যন্ত যুক্ত থাকে। এদের কেহ কেহ পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, বাকি চোরেরা তখন সিঁদ দিতে সুরু করে। দলীয় সিঁদেল চোর ছাড়া একক সিঁদেল চোরও দেখা যায়, তবে অধিক ক্ষেত্রে এরা দল বেঁধেই অপকর্ম্মে বার হয়।

পল্লীগ্রামের সিঁদেল চোরেরা রাত্রিকালে সর্ব্বাঙ্গ তৈলাক্ত করে কাল নেঙট্ পরে অপকর্ম্মে বার হয়। সর্ব্বাঙ্গ তৈলসিক্ত থাকায় কেহ এদের সহজে ধরতে পারে না, এদের গায়ে হাত দিলে হাত পিছলে যায়। এই অবসরে চোর মশাই সহজে সরে পড়তে পারে। দেহে বস্ত্রাদি থাকলে অসুবিধা অনেক, কাপড়টা ধরে ফেললেও এই অবস্থায় চোর আটকা পড়তে পারে। এর জন্যে চোরেরা অধিক কাপড়-চোপড় দেহে রাখে না। শহরে চোরেরা লেঙটের বদলে কাল হাফ প্যাণ্ট ব্যবহার করে। রাত্রিকালে শ্বেত বস্ত্রাদি এরা একেবারেই নিরাপদ মনে করে না। লৌহ নির্ম্মিত সিঁদকাঠিই সিঁদেল চোরদের আদিম যন্ত্র। এদেশের চাষীরা যেমন আজও পর্য্যন্ত ঋগ্বেদীয় যুগের লাঙল নিয়ে সন্তুষ্ট

আছে, ভারতীয় স্বভাব-চোরেরাও অনুরূপভাবে তাদের পুরানো সিঁদকাঠি নিয়েই সন্তুষ্ট, কিন্তু এদেশের অভ্যাস-চোরদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এরা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ ভারতীয় সিঁদেল বা সবল বা তালা তোড় চোরেরা অতি সাধারণ (Simple) হাল্কা যন্ত্রাদি ব্যবহারের পক্ষপাতি। বিশেষ ক'রে ভারতীয় স্বভাব ও পুরাণো চোরদের সম্পর্কে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। য়ুরোপীয় সবল চোরদের ন্যায় এরা উন্নত ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার পছন্দ করে না। তুলনামূলক ভাবে দেখা গিয়েছে যে, য়ুরোপীয় অপরাধীরা যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর এবং ভারতীয় অপরাধীরা উহার ব্যবহারচাতুর্য্যের * উপর নির্ভরশীল। ইহা ব্যতীত নিরপরাধী ভারতীয়দের ন্যায় এই দেশের অপরাধীরাও বহু বিষয়ে পরিবর্ত্তন বিরোধী বা রক্ষণশীল। এইজন্য তারা সাবেকী যন্ত্রপাতিই বিশেষ পছন্দ করে। এই সাবেকী যন্ত্রপাতির মধ্যে সিঁদকাঠিই সর্ব্বপ্রাচীন।

[স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে যারা আদিমকাল হতেই অপরাধে অভ্যস্ত তারা এই সিঁদকাঠিকে পূজা করে এবং উহাকে এক পবিত্র দ্রব্য মনে করে। কিন্তু ইহাদের যে সকল জাতি আমাদের মতই সভ্য মানুষের অধঃপতিত বংশধর তারা ইহাকে অনুরূপ সম্মান দেয় না। এমন কি এদের মেয়েরা উহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নি। এদের মেয়েদের ধারণা ঐ দ্রব্য স্পর্শ করলে তাদের অমঙ্গলই হবে। জাতি মাত্রের মেয়েরাই যে প্রাচীন সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক তা এদের এইরূপ আচার-ব্যবহার প্রমাণিত করে।]

* সামান্য ও সাধারণ যন্ত্র তাদের হাতের কায়দা বা ব্যবহার চাতুর্য্যের জন্য শক্তিশালী অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।

এখানে বিভিন্ন সিঁদকাঠিযন্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হল। দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত এই লৌহ সিঁদকাঠির সাহায্যে এরা সিঁদ কেটে থাকে। হাতে ধরার সুবিধার জন্য এই যন্ত্রের পশ্চাৎভাগে গোলাকার খাঁজ কাটা থাকে। কখনও কখনও ন্যাকড়া দ্বারা উহার পশ্চাদভাগ
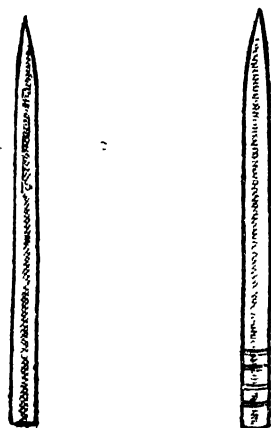
আবৃত রাখা হয়, যাতে ধরবার সময় হাত হতে উহা পিছলে না যায়। দুয়ারের পার্শ্বস্থ কয়েকটি ইষ্টক এরা সিঁদকাঠির সূঁচলা মুখ দ্বারা বার করে দেয়। এর পর তারা এই সিঁদের গর্ত্তে হাত ঢুকিয়ে দুয়ারের খিল, হুড়কা বা ছিটকিনি খুলে ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে। দেওয়াল মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হলে এরা আরও সহজে কার্য্য সমাধা করতে পারে। তবে দেওয়ালের মৃত্তিকার (মধ্যদেশে) অভ্যন্তরে করগেটেড টিন থাকলে উহা সম্ভব হয় না। এই ধরণের সিঁদেল কার্য্যকে এ দেশে "বগলী

সিঁদ” বলা হয়। এদের কেহ কেহ গৃহস্বামী জেগে আছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্যে প্রথমে একটি পা ঢুকায়। গৃহস্বামী খুট-খাট্ শব্দ শুনে জেগে উঠে দা হস্তে দুয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং চোর পা ঢুকানো মাত্র এক কোপে তার পা'টা উড়িয়ে দিয়েছেন—এইরূপ কাহিনীও শুনা গেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে দলের লোকেরা অমনি সঙ্গীটিকে ফেলে না পালিয়ে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে পালিয়েছে, এইরূপ নজীরেরও অভাব নেই। এইরূপ অবস্থায় মৃত সঙ্গীটিকে কেহ সনাক্ত করতেও পারে না, তাকে দিয়ে দোষ কবুল করান তো দূরের কথা। আত্মরক্ষার কারণে পূর্ব্ব হতেই এরা পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ করে নেয়। এই জন্যে এতে দোষেরও কিছু থাকে না, যে যায় সেই যায় এবং যে বাঁচে সেই বাঁচে।

অধুনা কালে সিঁদেল চোরদের মধ্যে যারা অভ্যাস-অপরাধী তারা নানা প্রকার উন্নত যন্ত্রপাতি এবং এ্যাসিড এসিটিলিন গ্যাস প্রভৃতি বস্তুরও সাহায্যে নিয়ে থাকে। এ্যাসিড এবং গ্যাসের সাহায্যে এরা লোহার সিন্দুক ভাঙে। কেহ কেহ এজন্য বোরিঙ ইন্‌স্ট্রুমেণ্টেরও (ইস্পাত নির্ম্মিত তুরপুন) সাহায্য নেয়। এরা সিঁদ না কেটে বোরিঙ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে দুয়ারের স্থানে স্থানে ফুটা করে এবং তার পর এই ফুটার মুখে ‘তার’ বা সিক ঢুকিয়ে খিল বা ছিটকিনি খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে। চিত্রে কয়েক প্রকারের ড্রিল বা বোরিঙ ইন্‌স্ট্রুমেণ্টের প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

ক=একটি কাষ্ঠখণ্ড। ইহাতে বিভিন্ন মাপের কয়েকটি চোকা ফুটা আছে। ঐ কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে ঐ সব ছিদ্রের মাপে তৈরি, কয়েকটি বিভিন্ন মাপের ড্রিল দেখানো হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ সকল ড্রিল ঐ ছিদ্রগুলিতে প্রবেশ করিয়ে, উক্ত কাষ্ঠখণ্ডকে হ্যাণ্ডেলে পরিণত

করা হয়। বিভিন্ন পরিধির লৌহ সিন্দুক এবং পেটিকাদি ছিদ্র করবার কারণে ইহা ব্যবহৃত হয়। সাধারণত গা-চাবির উপর দিয়াই এইরূপে ছিদ্র করা হয়ে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত ইহা বিভিন্ন সাইজের
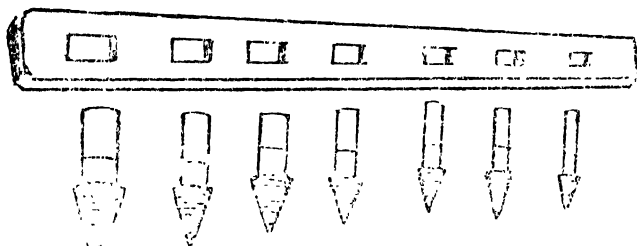
সরল তুরপুন যন্ত্র। য়ুরোপীয় অপরাধীরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের প্যাঁচ কাটা বোরিঙ যন্ত্র ব্যবহার করে।

খ = ভারতীয় অপরাধী ব্যবহৃত একটি সাধারণ লৌহ শিক। উহার প্যাঁচকাটা অংশ দ্বারা তালা খোলা যায়। তালার মুখের মাপ অনুযায়ী প্যাঁচের ছোট বা বড় অংশটি উহার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা খোলা

হয়। এই যন্ত্রের বক্র অংশটি উভয় দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে ভিতরের কাঠের খিলটি টেনে খুলে ফেলা যায়।

কোনও কোনও অপরাধী দরজার একটি পাল্লা হাত দিয়ে সম্মুখের দিকে এবং উহার অপর পাল্লাটি হাত দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে, পাল্লার

কাঠ বেঁকিয়ে দিয়ে উভয় পাল্লার মধ্যে একটা ফাঁকের সৃষ্টি করে উহার মধ্যে শিক ঢুকিয়ে খিল খুলেছে। অপপদ্ধতির এই কায়দাকে এরা 'চাড় বাজী' বলে।

চ= ভারতীয় অপরাধী ব্যবহৃত একটি লৌহ শিকল। উহা চামড়া বা রবার দিয়ে আবৃত থাকায় উহা ধরিয়া সহজেই উপরে উঠা যায়। হুকসহ
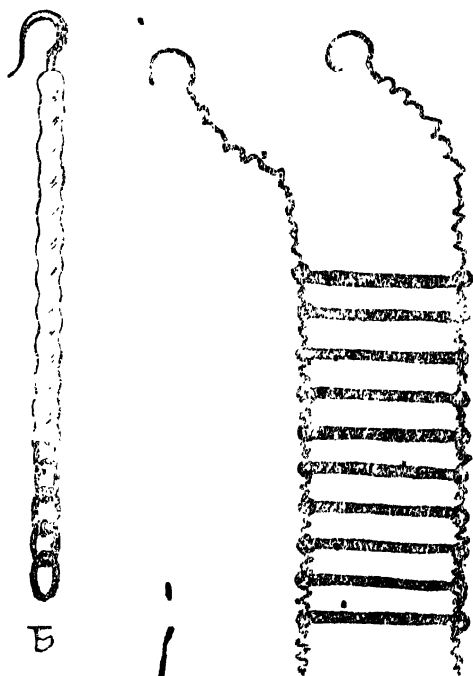
শিকলটি প্রথমে উপরের দিকে ছাদের আলিসায় ছুড়ে দেওয়া হয়। পাঁচিল বা আলিসায় হুকটি আটকে গেলে, চোরেরা এই শিকল ধরে

উপরে উঠে। শিকলটি চামড়ার দ্বারা আবৃত থাকায় এদের হাতে আঘাতও লাগে না, হাতটিও পিছলাইয়া যায় না। য়ুরোপীয় অপরাধীরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে জটিলতর দড়ির মই বা 'রোপ ল্যাডার' ব্যবহার করে। শিকলের পার্শ্বের চিত্রটি দেখুন।

ঙ = একটি ড্রিল। ইহা দ্বারা দুয়ারের এক পাশে ভিতরের খিলের
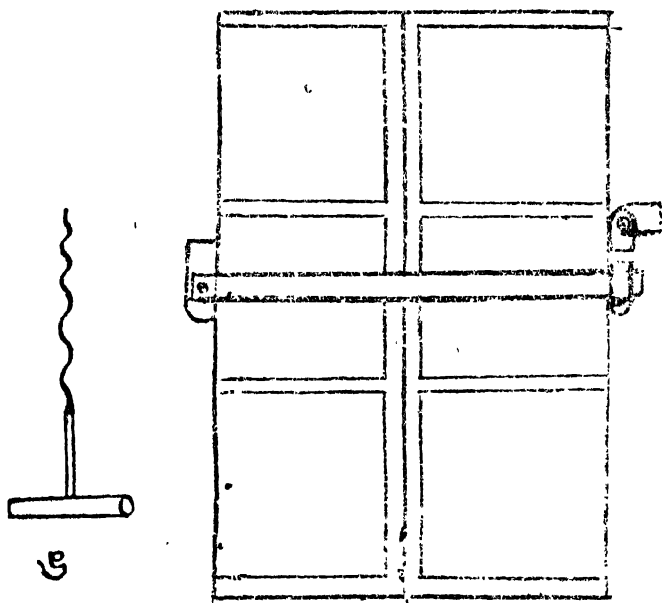
উপর প্রথমে ছিদ্র করা হয়। (এ চিত্র দেখুন)। এর পর ইহার ছিদ্রের মুখে, লৌহ শিকের (খ চিত্র দেখুন) বক্র অংশ ঢুকিয়ে খিলটি টেনে খুলে

ফেলা হয়। কিন্তু, ঐ চিত্র অনুযায়ী থলের মুখের ঊর্দ্ধে কাষ্ঠের বা লোহার ক্লিপ দেওয়া থাকলে ইহা সম্ভব হয় না।

ঘ = একটি আধুনিক ড্রিল। ইহার শক্তি সাধারণ ড্রিল অপেক্ষা অধিক। অনেক সময় ইহা দ্বারা লৌহ বা ইস্পাতও ছিদ্র করা যায়।
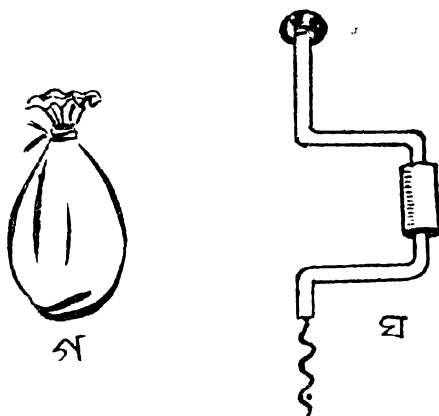
এদের কেহ কেহ ইলেকট্রিক ড্রিলও সঙ্গে রাখে। ঘরের ইলেকট্রিক প্লাগে তার সংলগ্ন করে ইহাকে কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়ে থাকে।

গ = একটি চামড়ার থলি। ইহা জল দ্বারা পূর্ণ করে কোমরে আটকে রাখা হয়। লৌহ পেটিকাদি ড্রিল দ্বারা ছিদ্র করার সময়, মাঝে মাঝে ছিদ্র স্থানে বারি নিক্ষেপ করতে হয়, জল না দিলে সহজে ছিদ্র করা যায় না। ইস্পাত কাটা করাত বা উকা দ্বারা গরাদ কাটবার সময়ও এইভাবে জল নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এ ছাড়া লোহা কাটা ছোট করাত বা উকাও ব্যবহৃত হয়। সিঁদকাঠির স্থূল অংশের সাহায্যে তালা

বা কড়া ভাঙার কাজ এবং সূক্ষ্ম অংশের সাহায্যে দেওয়াল হতে ইষ্টক সরানর কাজ সমাধিত হয়।

ইহা ছাড়া একটি পাতলা ও লম্বা লৌহ শলকা বা শিকও ব্যবহার করা হয়। ইহার মুখটা কিছু বক্র। এই শিক উভয় দুয়ারের মধ্যকার ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে খিল বা ছিট্‌কিনি খোলা হয়। কিন্তু কেহ কেহ খিলের উপরে লোহার ক্লিপ এঁটে রাখেন। এই অবস্থায় এই যন্ত্রের দ্বারা খিল খোলা যায় না। (ঞ চিত্র দেখুন।) এ ছাড়া এদের সঙ্গে অনেক ঝুটা চাবি এবং উকাও থাকে। এরা চাবিতালার কাজে এক রকম পাকা-পোক্ত। এদের কেহ কেহ দিনের বেলায় চাবিতালার কাজ করে, এবং রাত্রে কাটে সিঁদ।* এ ছাড়া এদের কাছে ছোট ছোট ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চও এরা রেখে থাকে। পূর্ব্বে এস্থলে এরা চোর লণ্ঠন ব্যবহার করত।

কোনও কোনও সবল চোর লোহার গরাদ বেঁকাইবার বা সরাইবার জন্যে জ্যাক্ যন্ত্রও ব্যবহার করে থাকে। কেহ কেহ জ্যাকের অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রও তৈরী করে নেয়। এই যন্ত্রের স্ক্রুগুলি এঁটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরাদগুলাও যায় বেঁকে। এরা তখন সহজেই বেঁকে যাওয়া গরাদের ফাঁকে ঘরে প্রবেশ করে। নিম্নের "জ" চিত্রে এবং পূর্ব্বের পৃষ্ঠার "ছ" চিত্রে, দুইটি বিশেষ বাঁকন যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রথমে "জ" চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন। যন্ত্রটি চিত্র প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী জানালার গরাদে সংলগ্ন করে যন্ত্রের ডাঁটি দুইটির মুখের বল্টু (bolt) দুইটি প্লাস বা রেঞ্জের সাহায্যে এঁটে দিতে থাকলে, উহার চাপে একটি লৌহ গরাদ ধীরে ধীরে বেঁকে—উভয় (১ম এবং ২য়) গরাদের মধ্যে একটি বড় ফাঁকের

* নূতন চাবি তৈরী করবার সময় এরা গৃহস্থদের দ্রব্যাদির অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হয়ে থাকে।

সৃষ্টি করে। এই ফাঁকের মুখে তখন চোরেরা সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এইবার "ছ" চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন। যন্ত্রের দুই দিককার
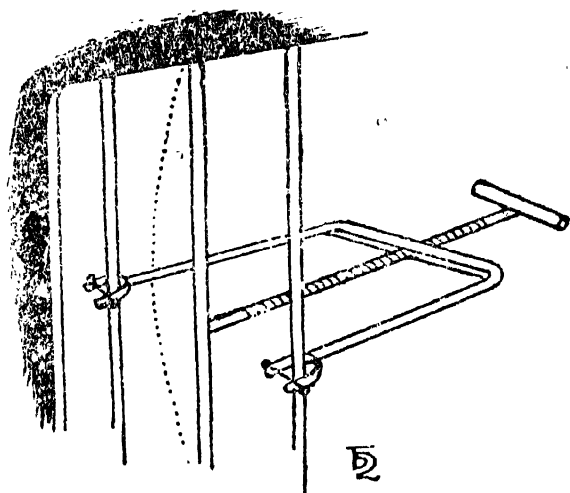
ডাঁটি দুইটি দুই পার্শ্বের দুইটি লৌহ গরাদে ক্লিপের সাহায্যে এঁটে দেওয়া হয়েছে। এই যন্ত্রের মধ্যকার ডাঁটিটির উপর আগাগোড়া প্যাঁচ কাটা (screwed) থাকে। এই মধ্য ডাঁটিটি মধ্যকার গরাদের উপর ন্যস্ত করে, উহার হ্যাণ্ডেলটি ঘুরাইলে, মধ্য ডাঁটিটির চাপে উক্ত লৌহ গরাদটি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বেঁকে যাবে, এবং আরও অধিক চাপ পড়লে উহার উভয় মুখ কাঠের ফ্রেম দুইটি হ'তে খুলেও এসে থাকে। এই সব জ্যাক যন্ত্রের চাপে লোহার ইঞ্জিন, মোটরকার প্রভৃতিও উঠান সম্ভব; সামান্য গরাদ বাঁকান তো কিছুই নয়। কিন্তু "ঝ" চিত্র প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী যদি এই গরাদগুলির মুখ সকল বল্টু দিয়ে আঁটা থাকে, তা হলে

কাষ্ঠ ফ্রেমগুলি হতে গরাদগুলিকে এত সহজে এবং নিঃশব্দে উঠিয়ে আনা সম্ভব হয় না। আমার মতে ঝ চিত্র এবং ঞ চিত্র প্রদর্শিত
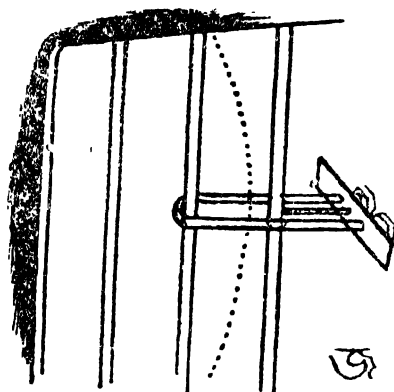
পন্থানুযায়ী জানালা এবং দুয়ার নির্মিত হওয়া উচিত। এতে এই সব চুরির সম্ভাবনা কম থাকে।

ভারতীয় অপরাধীদের দ্বারা আবিষ্কৃত অপর একটি সাধারণ ভাঙন যন্ত্রের প্রতিকৃতি উপরে দেওয়া হ'ল। ইহা মধ্যম ধরণের স্থূল তিন টুকরা ফাঁপা লৌহ পাইপ। ভিতর ফাঁপা হওয়ার কারণে ইহা হাল্কা অথচ নীরেট দণ্ডের ন্যায়ই শক্ত। এই নাতিদীর্ঘ পাইপগুলির দুই মুখে প্যাঁচকাটা থাকে। উহাদের দুইটি পাইপ সরল থাকে, কিন্তু উহাদের একটি পাইপের মুখ বেঁকে উর্দ্ধে উঠে পুনরায় সরলাকার ধারণ করেছে।

প্রয়োজন মত এই সবকয়টি উহাদের প্যাঁচকাটা মুখে পরস্পরের সহিত যুক্ত করে একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ডে পরিণত করা হয়, তার পর উহার পূর্ব্বোক্ত বক্রাংশ জানালার লৌহ গরাদে প্রবেশ করিয়ে চাড় দিয়ে গরাদসমূহ বেঁকিয়ে ফেলা হয়ে থাকে। (ঝ চিত্র দেখুন)।

ঝ
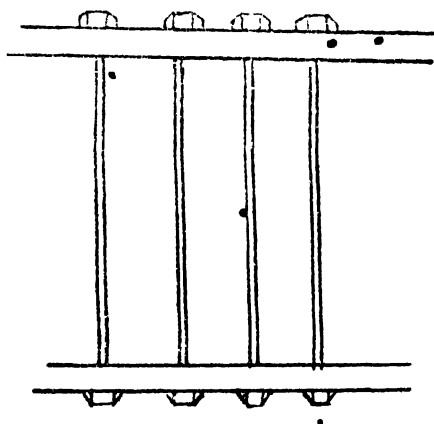
জানালাসমূহের শারসির কাঁচসমূহ এদেশের অপরাধীরা বিশেষ চালাকীর সহিত ভেঙে থাকে। এরা প্রথমে এক টুকরা কাপড় আটা বা লেইয়ের সাহায্যে ঐ সকল কাঁচের উপর সেঁটে দেয়, তার পর একটা কাপড়ের ছোট বল উহার উপর রেখে ঠুকে ঠুকে বা চাপ দিয়ে ঐ কাঁচ ভেঙে ফেলে। এই অবস্থায় কাঁচের টুকরা সকল ঐ আটা মাখানো ন্যাকড়ার সহিত সেঁটে থাকায় ঝন ঝন করে ভেঙে নীচে পড়ে কোনও প্রকার শব্দের সৃষ্টি করে নি।

এদের কেউ টর্চ বা দেশলাই সঙ্গে না নিয়ে, মাত্র একমুঠা চাউল

সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। অন্ধকারে এরা ঘঁরে এই' চাউল কণা ছড়িয়ে উহার পতনের শব্দ হতে এই শব্দবিশারদ চোররা বুঝে নেয় কোথায় কোন দ্রব্য ন্যস্ত আছে। ইহাতে শব্দ হয় না, হলেও গৃহস্থ উহাকে ইঁদুর মনে করে।

এদের কেহ কেহ একজন অপরজনের কাঁধে উঠে স্কাইলাইটের কাঁচ ভেঙেও ঘরে ঢুকেছে। এদের মধ্যে যারা জলের পাইপ ধরে উপরে উঠতে সক্ষম, তাদের ইংরাজীতে বলা হয় "বিড়াল চোর বা ক্যাট বারগেলার"।* কোনও কোনও সবল চোরের দল এজন্য ছোট ছোট ছেলেও পুষে থাকে। এই সব ছোকরারা নর্দ্দমার মুখ দিয়ে বা জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে বড়দের প্রবেশের জন্যে দরজা খুলে দিয়ে থাকে।

এই সবল বা সিঁদেল চোরদের বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি বিবৃতি দেওয়া গেল। এই বিবৃতিগুলি পাঠ করলে এদের কার্য্যকলাপ সকল সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"কোনও গৃহে সিঁদ দিতে হলে আমরা একটি বিশেষ উপায়ের সাহায্য নিই। প্রথমে আমরা একটা পুরাণো মোটরকার বা মোটর সাইকেল সংগ্রহ করি। এর পর উক্ত যন্ত্র-শকটটি কথিত গৃহের সম্মুখে রাস্তার উপর রেখে এইরূপ ভাণ করি, যেন হঠাৎ উহা বিকল হয়ে গেছে। আমাদের কয়েকজন এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অনবরত গ্যাসের ভট্ ভট্ শব্দ বার হতে থাকে, মেরামতের খুট্‌খাট্ শব্দও হয়। দলের অপর ব্যক্তিগণ এই অবসরে গৃহে ঢুকে সিঁদ দিতে সুরু করে।

---

* বহু প্রাচীনকালে এরা গোহাড়গীল জীবের গলার শিকল ধরে পর্ব্বতস্থ দুর্গ প্রাকার উলঙ্ঘন করতেও পেরেছে।

মোটরের আওয়াজে; সিঁদ কাটার আওয়াজ আর শ্রুত হয় না, শ্রুত হলেও গৃহস্বামী মনে করে উহা ঐ গাড়ীরই আওয়াজ। এই কারণে তাঁরা কোনও রূপ সাবধানতাও অবলম্বন করেন না। আমরা অকুস্থলেই বাক্স ভাঙার কাজও সমাধা করতে সমর্থ হই। আমরা নির্ব্বিবাদে চুরি করে ঐ মোটরেই বামালসহ সরে পড়ি। এমন কি পুলিশ ঐ রাস্তায় টহল দিয়ে গেলেও মনে করে আমরা মোটরটা মেরামত করছি। দৈবাৎ গৃহের কেহ যদি চেঁচাতে সুরু করে। তা হলে ঐ শব্দের মাত্রা আমরা আরও বাড়িয়ে দিই, যাতে ক'রে কিনা মোটরের উৎকট শব্দে চীৎকারের শব্দ একেবারে চাপা পড়ে যায়।

—কি করে, এত সব শিখলাম ? শুনুন তবে তা বলছি। ছেলেবেলায় আমি পিতার সঙ্গে কোলকাতায় থাকতাম। আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিল একটা টিন মিস্ত্রির দোকান। দোকানে যখন কাজ হত ঠিক সেই সময়ই আমি আমার বাবার হুঁকায় টান দিতে থাকতাম। পাশের ঘর থেকে বাবা টিন মিস্ত্রির হাতুড়ীর আওয়াজ শুনতেন এবং ঐ শব্দের আওতায় হুঁকার গুড় গুড় আওয়াজ তাঁর আর কানে যেত না। হাতুড়ীর শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমি হুঁকার নলটাও নামিয়ে রাখতাম। পরে প্রাপ্ত বয়সে আমি চোর হয়ে পড়ি। এই সময় হঠাৎ একদিন আমার বাল্যকালের কাহিনীটি মনে পড়ে যায়—তখন আমিই সর্দ্দারকে বিদ্যেটা শিখিয়ে দিই।"

"কখনও কখনও এই মোটরের সাহায্যে আমরা দুয়ারও ভেঙে বা খুলে ফেলেছি। রাস্তার ধারের দোকানগুলিই এই ভাবে ভাঙা হয়। রাস্তা হ'তে একটা কাঠের খুঁটি বা বাঁশ বা কাঠ বা লোহার কড়ি উঠিয়ে নিয়ে উহার একটি মুখ মোটরের পিছনে, এবং অপর মুখটি দুয়ারের উপর ন্যস্ত ক'রে ঐ লৌহ বা কাঠখণ্ডের উপর মোটরটি

সজোরে ব্যাক্ ক'রে দিই, ফলে মোটরের চাপে দরজাটা এমনই ভেঙে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দরজার গরাদের এবং মোটরের পিছনের সঙ্গে শিকল বেঁধে মোটরটি সামনে চালিয়েও দরজা খুলেছি—তবে এইরূপ ব্যবস্থা কদাচিৎ হয়ে থাকে। কখনও কখনও সিডন্ বডিড্ মোটরের ছাদে উঠে আমরা পথের গ্যাস লাইটসমূহ চুরির পূর্ব্বে নিবিয়েও দিয়েছি।"

"—হাঁ হুজুর, ঐ বাড়ীর ঝিটি আমারই উপপত্নী। তাকে তালিম দিয়ে আমিই ঐ বাড়ীতে পাঠিয়েছি, সুলুক সন্ধান পূর্ব্ব হ'তে জেনে নেওয়ার জন্যে। পূর্ব্ব হ'তে চাকর-বাকরদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ না করে আমরা কখনও কারুর বাড়ী ঢুকতে সাহসী হই না। এজন্য বাড়ীর চাকরদের আমরা প্রচুর খাওয়াই, নিজ খরচে তাদের সিনেমাও দেখিয়ে থাকি, বেশ্যালয়েও নিয়ে যাই। কখনও কখনও দুই একদিনের জন্যে নিজেরাও চাকর রূপে বহাল হয়েও যাই, দলের সুবিধের জন্যে। কখন কখনও বাটীর বিপথগামী সন্তানদের সঙ্গে ভাব ক'রেও আমরা খবর সংগ্রহ করেছি। শহরের বেশ্যালয়গুলি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্যে আসে।"

এই সকল সিঁদেল চোরেরা বাড়ী ঢুকে প্রথমেই যে ঘরে চাকর, দরোয়ান বা বাড়ীর পুরুষরা শুয়ে থাকে, সেই সকল ঘরের দরজার কড়াগুলা বাইরে থেকে বেঁধে দেয়, যাতে ক'রে কি'না চীৎকার শুনলে সহজে তারা বার হয়ে না আসতে পারে—অবশ্য যদি এই সব চাকর দরোয়ানদের সহিত বন্দোবস্ত করা সম্ভব না হয় তবেই এই পন্থা গ্রহণ করে। এদের কেহ কেহ চুরির পূর্ব্ব রাত্রে ছোট ছোট ইট বা ঢেলা বাড়ীতে ফেলে বুঝে নেয় বাড়ীর লোকেদের ঘুম সজাগ কি'না। অনেক সময় এরা দিনের বেলাতেও এইভাবে ঢেলা ছুড়ে, বাড়ীর লোকেদের মেজাজ ও প্রকৃতি এবং সংখ্যা সম্বন্ধে জেনে নিয়ে থাকে।"

সিঁদেল চোরদের বুদ্ধিমত্তা এবং অপপদ্ধতি সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"আমি হুজুর একজন বাড়ীর চোর। ঐ দিন ঐ বাড়ীটায় আমিই চুরি করি। ঐ চুরির আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়ীটার নীচের একটা খোলা মাঠে আমি সিঁদকাঠিটা পুঁতে রাখি। অধিক রাত্রে পাছে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ পথে ধরা পড়ি, এই ভয়ে আমরা আগে থেকে সুবিধামত অকুস্থলের নিকট যন্ত্রগুলি পুঁতে রাখি। এর পর সন্নিকটস্থ একটা খোলা বাড়াতে আমি আশ্রয় নিই, এবং কথিত বাটীর ঝিএর সঙ্গে আলাপ জমাই। গভীর রাত্রে অকুস্থলে গিয়ে আমি সিঁদকাঠিটা উঠিয়ে নিই, এবং পরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভিতরের দিকে একটা দড়ি ফেলে দিই। ব্যবস্থা মত বাড়ীর ঝি উঠানে সজাগ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জলের কলের পাইপটার সঙ্গে দড়ির একটা মুখ বেঁধে দেয়, আর আমি সেই দড়ি ধ'রে ভিতরে নামি। এর পর পাইপ ব'য়ে আমি উপরে উঠি, এবং উপরের ঘরের দরজার খিলটা খুলে দিই। ঘরের মধ্যে মশারার ভিতর ফরিয়াদি ও তাঁর স্ত্রী ঘুমাচ্ছিলেন। আমি ডিঙি দিয়ে তাদের শিয়রে এসে বসি। এর পর নিঃশব্দে একটা বিড়ি ধরাই। এই বিড়ি হতে ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু আগুন বেরোয় না। এই বিড়ির মধ্যে কোকেন, চরস, ক্যাম্ফার ইত্যাদি ও একরকম দেশীয় পাতার গুঁড়া গ্রামাঞ্চলে ছিল। এই মিশ্র দ্রব্যের ধোঁয়ার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। কখনও কখনও ঐ সকল দ্রব্যের অগ্নিদগ্ধ ছোট পুঁটলী বাহির হতে জানালার মধ্য দিয়ে আমরা ঘরের ভিতরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। এই ধোঁয়া নাকে গেলে মানুষ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। এর পর আমি ধীরে ধীরে মহিলাটির গায়ে হাত দিই। প্রথমেই গহনাতে হাত না দিয়ে ঐ সকল নারীদের মাথার স্কন্ধে হাত দিয়ে কিছুটা সইয়ে

নিয়ে পরে গহনার স্থানে আমরা হাত দিয়েছি। কুমারী মেয়েদের গা হ'তে গহনা খুলবার সময় আমরা যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করি, হুজুর, বিবাহিতা মেয়েদের বেলায় আমরা অতটা সাবধানতার প্রয়োজন মনে করি না। * কারণ হঠাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় গায় হাত লাগলে, বিবাহিতারা মনে করে উহা তাদের স্বামীর হাত; কুমারী মেয়েরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্পর্শ মাত্রেই জেগে উঠে। আমি মহিলাটির গা হ'তে সকল গহনাই নিঃশব্দে খুলে নিই। তার পর ঝুটা চাবির সাহায্যে আলমারী খুলে অপরাপর দ্রব্য বাহির করি। কিরূপ ভাবে চাপ দিলে বা নাড়লে কোন কোন তালা কি ভাবে খোলা যায় তা আমাদের জানা আছে। আড্ডাখানায় সরু শিকের সাহায্যে তালা খোলা আমরা অভ্যাস করি। এই সব কাপড়-চোপড় ও গহনা একত্রে বেঁধে অচিরেই আমি নেমে আসি, এবং নিকটের এক বেশ্যা গৃহে রাত কাটাই, কারণ রাত্রে মাল সহ পথ চলা নিরাপদ নহে। হাঁ হুজুর, রাত্রে কোন সময় গৃহস্থেরা অঘোরে ঘুমায়, সেই সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরে আলো জ্বলে এইটেই আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করি। রাত্রি দেড়টা বা দুইটার পর আলো নিবলে আমরা বুঝে নিই, এইবার এরা অঘোরে ঘুমাবে। বাড়ীতে কোনও বাচ্চা শিশু আছে কিনা এসম্বন্ধেও আমরা খবর নিই। কারণ এই সব শিশুরা হঠাৎ জেগে উঠে। শীতকালের প্রথম রাত্রে এবং গ্রীষ্মকালের শেষরাত্রে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, অভিজ্ঞতা হ'তে আমরা এইরূপ জেনেছি। আমাদের কেহ কেহ অকুস্থলে এসে অত্যন্ত নারভাস্ হয়ে পড়ি, বিষ্ঠা ত্যাগ না

---

* কুমারী মেয়েদের গাত্রে গহনা থাকে না বা কমই থাকে। গহনা থাকলেও তাদের গাত্র হতে গহনা লওয়া দুষ্কর।

করা পর্য্যন্ত আমাদের এই ভয় বা নারভাস্‌নেস্‌ কাটে না। এই জন্যে আমরা অকুস্থলেই বিষ্ঠা ত্যাগ করি। সময় মত বিষ্ঠা ত্যাগ না হ'লে আমরা অপকর্ম্ম না করেই চলে যাই। কখনও কখনও আমরা দল বেঁধেও সিঁদেল চুরি করে থাকি। এই সময় একটি দল ভিতরে ঢুকে, এবং অপর একটি দল বাহিরে পাহারার কাজে বাহাল থাকে। এদের মধ্যে একজন থাকে পাঁচিলের উপর, সন্দেহজনক লোক দেখলে সে শিস্‌ দিয়ে ভিতরের লোকদের সতর্ক করে দেয়, এছাড়া রাস্তার মোড়ে মোড়েও আমরা পাহারা রেখে থাকি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দোকান বা বাজারের দরোয়ানদের সঙ্গেও * আমরা সড় করে থাকি, চাকরদের সঙ্গে সলা তো করিই।"

কোনও কোনও সিঁদেল চোরের দল তাদের অপকর্ম্মের সুবিধার জন্যে ছোট ছোট ছেলেও পুষে থাকে। গরাদের ফাঁকে, নর্দ্দমার মুখে বা স্কাইলাইটের মধ্যে এরা সহজেই ঢুকে পড়তে পারে—ভিতরে প্রবেশ করে এরা বড়দের জন্যে সদর দরজা খুলে দিয়ে থাকে, এই চোরদের দলে এইরূপ অনেক মার্কা-মারা ছোকরা আছে, এই সকল ছোকরা নিয়ে এক দলের সহিত অপর দলের প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি, এমন কি মারপিট খুনোখুনিও হয়ে থাকে। এই সকল বালকদের সহিত এদের যৌন সম্পর্কও থাকে।

বাড়ীতে পোষা কুকুর থাকলে চুরি করার বিশেষ অসুবিধা হয়। এই জন্যে পূর্ব্বাহ্নেই নির্দ্ধারিত বাটীর দুয়ারে এসে এরা আড্ডা জমায়—উদ্দেশ্য, কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় কুকুরগুলির সহিত পরিচিত হওয়া। এই

* কেহ কেহ মনে করেন, এরা সময় বিশেষে রাস্তার পাহারাদার সিপাইদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে, কিন্তু ইহা সত্য নয়, ভারতীয় পুলিশ এ বিষয়ে সন্দেহের উপরে।

সব কুকুরদের এরা প্রায়ই এটা ওটা খাইয়েও থাকে, মনিবরা এতে বাধা তো দেনই না, বরং এতে খুসীই হয়ে থাকেন। এর পর যখন এরা রাত্রে বাড়ী ঢুকে, তখন পূর্ব্ব পরিচিত বিধায় কুকুরা আর চেঁচায় না। কোনও কোনও স্থলে অকুস্থলেই আহার্য্য দ্বারা কিংবা সঙ্গে আনা মাদি কুকুরের সাহায্যে এরা কুকুরগুলিকে বশ করে নিয়েছে, এইরূপ কাহিনীর কথাও শুনা গেছে।*

কোনও কোনও সবল চোর চুরির সুবিধার জন্যে কোনও এক খালি দোকান ভাড়া নেয়, এর পর রাত্রি যোগে ঐ খালি কামরার দেওয়াল ফুটা করে এরা পাশের দোকানে ঢুকে ঐ দোকানের সমুদয় দ্রব্যাদি চুরি করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সবল চোর আবার ছাত ফুটা করে দড়ির সাহায্যে গুদামে ঢুকে দ্রব্যাদি চুরিও করেছে। প্রতিরাত্রে অল্প অল্প করে এই ফুটা এরা করে থাকে, এইরূপ জানা গেছে।

কোনও কোনও সবল (সিঁদেল) চোরেরা নাকি ক্লোরোফর্মও ব্যবহার করে থাকে। ঘরের যে জানালাটির উল্টা দিকে অর্থাৎ কিনা যে জানালাটি হ'তে ভিতরের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই জানালাতে এসে বায়ুর মুখে এরা নাকি ক্লোরোফর্মের শিশিটা খুলে রাখে, যাতে করে কিনা গৃহস্থদের ঘুম গভীর হবে। কিন্তু এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অনেকের মতে ক্লোরোফর্মের অপ্রত্যক্ষ (indirect) প্রয়োগ নাকি কখনও কার্য্যকরী হয় না।

বাংলা দেশের দিনাজপুর জিলায়, রায় ঘাটোয়াল এবং মালপাহাড়ী নামক দুইটি স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতি বাস করে। এরা সবল-চৌর্য্যের সময় এক অদ্ভুত রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এদের একজন

* কুকুরের নিকট পরিচিতের ন্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে এরা কামড়ায় না।

একটি লম্বা সুতার একটি মুখে একটি বঁড়শী বেঁধে, ঐ বঁড়শীটি তার কাপড়ের সঙ্গে বিঁধিয়ে রাখে এবং এই অবস্থাতেই সে কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে চৌর্য্য কার্য্যের জন্য প্রবেশ করে থাকে। এই সময় দলের অপর আর এক ব্যক্তি ঐ সুতার অপর মুখটি বাণ্ডিলসহ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে। বিপদের কোনও সম্ভাবনা হলে এই বাহিরের ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ ঐ সুতাটির মুখ ধরে টান দিতে থাকে। ভিতরের লোকটির কোমরের বঁড়শীটিতে টান পড়া মাত্র সে বুঝতে পারে যে, বিপদ আগত প্রায় এবং ইহা বুঝা মাত্র সে দ্রুত পদবিক্ষেপে বাইরে এসে পলায়ন করে থাকে।

গ্রামাঞ্চলে সিঁদেল বা সবল চোরেরা পলায়নের সময়ও নানা রূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। মঘেরা ডোম আদি স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিরা পলায়নের সময় শিয়ালের অনুকরণে ডাক তো ডেকেই থাকে, তা ছাড়া এরা হুবহু শিয়ালদের ন্যায়ই চার পায়ে—অর্থাৎ কিনা উভয় হস্ত ও পা দ্বারা ভূমি স্পর্শ ক'রে লাফাতে লাফাতে প্রস্থান করে থাকে। এদের কেহ কেহ চুরির মাল অকুস্থলের নিকটেই ভূমির তলে প্রোথিত ক'রে ঐ ভূমির উপর মাদুর পেতে সুখে নিদ্রা যায়। পরে সুবিধামত ঐ দ্রব্য ঐ ভূমির তলা হ'তে উঠিয়ে নিয়ে এরা প্রস্থান করে থাকে। সহরের কোনও কোনও চোর চুরির পর মালমাল ও যন্ত্রপাতি তরকারির ঝুড়িতে করে—তরকারীর তলাতে রেখে নির্ব্বিবাদে তাহা পাচার করে থাকে। ভোরের দিকে সহরের রাস্তায় ঐরূপ বহু তরকারীওয়ালাকে বাজারের দিকে যেতে দেখা যায়, এই কারণে এদের উপর কারও সন্দেহও আসে না। এই সকল সিঁদেল চোরেদের কেহ কেহ বাসনওয়ালী, ছুতার ও রাজমিস্ত্রিদের নিকট হ'তেও খোঁজ-খবর নিয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, কোনও একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণের সময় আশে-পাশের বহু বাটীতে চুরি

হ'তে আরম্ভ হয়েছে। দিনের সিঁদেল চোরেরা গুদাম আদি স্থানে প্রবেশ করে ধরা পড়লে প্রায়ই এইরূপ বলে থাকে, "আমি অমুক বাবুকে খুঁজতে এসেছি, দেখুন না, এ চিঠিটা।" বস্তুতঃ তাদের কাছে ঐ নামের একটা পত্রও পাওয়া গিয়ে থাকে। এটা অবশ্য এদের একটা চালাকি মাত্র। কোনও কোনও চোর এই অবস্থায় অকুস্থলে মল বা মূত্র ত্যাগ করবার জন্যে প্রবেশ করেছে, এইরূপও ভাণ করে থাকে। এ ছাড়া কোনও কোনও সবল চোর পলায়নের সময় নিজেরাই "চোর চোর" বলে ছুটতে সুরু করেছে, এমন কথাও শুনা গেছে।

এই সকল চোরেরা অপকার্য্যের সুবিধার জন্যে নানা রূপ সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে থাকে—অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে, অপরাধ-সাহিত্য শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়েছে। এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সকল সিঁদেল চোরেদের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে বলা হয়েছে। এই সব চোরেদের দ্বারা ব্যবহৃত অপরাপর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হবে। পূর্ব্বকালে গ্রাম্য কামাররাই (কর্ম্মকার) এই সব যন্ত্রপাতি চোরেদের জন্যে নির্ম্মাণ করে দিত। এ সম্বন্ধে চোরেদের সহিত গ্রাম্য কামারদের একটা সংস্কারগত সম্বন্ধও আবহমান কাল হ'তে চলে এসেছে। এ সম্বন্ধে বাংলা দেশে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। জনপ্রবাদটি হচ্ছে এইরূপ, যথা—"চোরে কামারে দেখা নেই, সিঁদ মোহনায় চুরি।" প্রবাদটির প্রকৃত অর্থ হয় এইরূপ: চোর কামারের অসাক্ষাতে পাঁচপো চাউল এবং পাঁচসিকা, একটা গামছায় বেঁধে কামারশালার দরজায় রেখে যায়। কর্ম্মকার ফিরে এসে ঐ দ্রব্যগুলি দেখা মাত্র বুঝে নেয় কে বা কারা কি জন্যে ঐ দ্রব্যগুলি ঐখানে রেখে গেছে। এর পর কর্ম্মকার মশাই ঐ দ্রব্যগুলি গ্রহণ করে ঐ স্থানে

একটি লোহার সিঁদকাঠি তৈরী করে সকলের অলক্ষ্যে রেখে দিয়ে প্রস্থান করে। চোর মশাই সুযোগ মত ফিরে এসে লৌহ যন্ত্রটি তুলে নিয়ে সরে পড়ে। এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কে যে কার জন্যে দ্রব্যটি তৈরী করে দিল, তা চোর বা কামার উভয়ের কেহই জানতে পারে না। *

তবে সহরে এইরূপ কোনও প্রথার কথা কদাচ শুনা যায় নি। সহরের কর্ম্মকারবা চোরেদের ফরমাস মত নানারূপ উন্নতধরণের এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রায়ই তৈরী করে দিয়ে থাকে। এই সকল যন্ত্রপাতিদ্বারা সাধারণ গৃহগুলি ভাঙা গেলেও বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত লৌহ-কক্ষ Strong-room-গুলি ভেঙে ফেলা দুষ্কর। এদেশের অনেকেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ী নির্ম্মাণ করে থাকেন, কিন্তু তৎসহ আরও দুই এক হাজার টাকা ব্যয় করে একটি লৌহ-কক্ষ বা Strong-room নির্ম্মাণ করার কেহ কোনওরূপ প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ এদেশের অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই মূল্যবান অলঙ্কারাদি স্বগৃহে রাখারই পক্ষপাতী। আমার মতে প্রত্যেক আধুনিক ব্যক্তিরই উচিত বাড়ী নির্ম্মাণের সহিত একটি লৌহ-কক্ষ নির্ম্মাণ করা এবং আসবাবপত্র

* এইরূপ চৌর্য্য সম্বন্ধীয় বহু জনপ্রবাদ বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। এই সকল জনপ্রবাদ সঙ্কলন করলে, প্রাচীন ভারতের অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান গরিমার অনেক তথ্যই প্রকাশ পেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে, যথা—(১) চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, (২) চোরের মন পুঁই আদাড়ে (আঁধারে), (৩) চোরের মন বোঁচকার দিকে, (৪) চোরের সাতদিন, গৃহস্থের একদিন, (৫) চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা, (৬) চোরের এক পাপ, গৃহস্থের সাতপাপ, (৭) ঘাওটার নেই বাটপাড়ের ভয়, (৮) চোরের উপর বাটপাড়ি, (৯) সাত চোরের মার, (১০) চোরের মায়ের কান্না, ইত্যাদি।

ক্রয় করার সহিত তাদের ক্রয় করা উচিত কিছু কিছু পুস্তকও (গৃহসংলগ্ন) পুস্তকাগারের জন্যে। সৌভাগ্যের বিষয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির লৌহ-কক্ষগুলি ভেঙে ফেলার মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার এদেশের অধিকাংশ সিঁদেল চোরেরা আজও পর্য্যন্ত শিখে নাই, কারণ এখনও পর্য্যন্ত এই বিশেষ অপকার্য্যটি এদেশের নিরক্ষর এবং নিম্ন শ্রেণীর অপরাধীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ভদ্রঘরের শিক্ষিত অপরাধীদের প্রবঞ্চনা অপরাধটির প্রতিই অধিক লক্ষ্য দেখা যায়। এই সবল চৌর্য্য রূপ অপরাধের দিকে এখনও তাঁদের নেকনজর পড়ে নি, বোধ হয় এদের দৈহিক পরিশ্রমের প্রতি বিমুখতাই ইহার কারণ। তবে য়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

বিবিধ চৌর্য্য ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার কিরূপ পন্থায় এই সকল অপকর্ম্মের ক্রমবিকাশ পৃথিবীতে হয়েছিল সেই সম্বন্ধে বলব। প্রকৃতপক্ষে চৌর্য্য অপরাধ হতেই পর পর দুটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয় প্রবঞ্চনা ও সবল চৌর্য্য (Burglary)। সুগঠিত গৃহ নির্ম্মাণ ও মানুষের সাবধানতাই উহাদের সৃষ্টির কারণ। মৎস্য হতে সরীসৃপের সৃষ্টির প্রমাণ স্বরূপ আমরা যেমন মধ্যবর্ত্তী জীব ভেকের উল্লেখ করি। তেমনি চৌর্য্য অপরাধ হ'তে প্রবঞ্চনা অপরাধের উৎপত্তির প্রমাণ স্বরূপ আমরা প্রবঞ্চনা-মিশ্রিত চৌর্য্য প্রভৃতি বহু মধ্যবর্ত্তী বা মিশ্র অপরাধের নজির দিতে পারি। এই সকল মিশ্র অপকর্ম্ম সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করব। এই মতবাদের অপর প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, অধিক ক্ষেত্রে আদিম ও নিম্নশ্রেণীর মানবগণই চৌর্য্য অপরাধে লিপ্ত থাকে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সুসভ্য মানুষরা অধিক ক্ষেত্রে লিপ্ত থাকে প্রবঞ্চনা অপরাধে। আরও পরে মানুষ সামাজিক জটিলতাসহ সুসংবদ্ধ হয়ে বাস করার ফলে এই

Burglary অপরাধ হতে সৃষ্ট হয় উহার সমশ্রেণীর Robary বা ডাকাতি অপরাধ। (এই ডাকাতি ও Burglary অপরাধে ব্যক্তি বা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হয়।) নিম্নে অপরাধ সম্পর্কীয় ক্রমবিকাশ বৃক্ষ হতে এই সকল অপরাধের ক্রমিক উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে বুঝা যাবে।
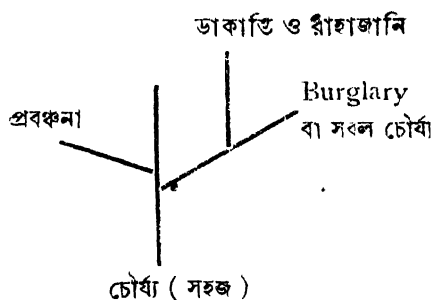
ভৃত্য-চৌর্য্য

ভৃত্য বা চাকর চোর অধুনাকালে একটি বিশেষ সমস্যার বিষয়। অনেক সময় ধন, মান ও প্রাণ এই ভৃত্যদের উপর নির্ভর করে। এই কারণে ভৃত্য নিযোগ অতীব সাবধানে করা উচিত, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিদের কখনও ভৃত্য রাখা উচিত নয়। নবাগত ভৃত্যদের কার্য্যে বাহাল করার পূর্ব্বে বা পরে যথা সত্বর গৃহস্থদের উচিত, এদের নাম, ধাম পরিচয় ও দেশের ঠিকানা সংগ্রহ করে নিকটবর্ত্তী পুলিশ ষ্টেশনে ঐ সম্বন্ধে লিখে পাঠানো। এইরূপ পত্র পেলে পুলিশ ভৃত্যের দেশের ঠিকানায় এবং অন্যান্য স্থলে খবর নিয়ে বলে দিতে পারে লোকটি

ভাল বা মন্দ। কলিকাতার মাননীয় পুলিশ কমিশনার বাহাদুর জনসাধারণের হিতার্থে বহুদিন পূর্ব্বেই এইরূপ সুব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ এই ব্যবস্থার কোনরূপ সুযোগ প্রায়ই গ্রহণ করেন না।

এই চাকরদের মধ্যে দুই প্রকারের চোর দেখা যায়—অভাবী ও পেশাদারী। অভাবী চোরেরা প্রায়ই বিপদজনক হয় না। অভাবের কারণে বা সামান্য স্বভাব দোষে, এরা বাজারের পয়সা কিংবা সুযোগমত ঘরের এটা ওটা দ্রব্যাদি সরিয়ে থাকে, পদচ্যুত চাকরদের বাক্স তল্লাস করলে, এমনি অনেক ছোট-খাটো চোরাই দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায়। বাড়ীতে নারী না থাকলে, এরা বেপরোয়াভাবে চুরি করে থাকে; এই সব বেমালুম ছোট চুরি আবিষ্কার পুরুষদের সাধ্যাতীত। কেবল মাত্র এই চুরি বন্ধের কারণেও ভদ্র মানুষের বিবাহ করা উচিত, এইরূপ আমি মনে করি।

এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম, বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"কোন একটি মেস্‌বাসী ছোকরা প্রায়ই থানায় এসে অর্থাদি চুরির বা হারানোর এজাহার দিত। একদিন তাকে আমি প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা মশাই, এভাবে না থেকে আপনি বিয়ে করেন না কেন?' উত্তরে ছেলেটি আমায় বলেছিল, 'আই ক্যাণ্ট মেইনটেন এ ওয়াইফ।' অর্থাৎ কিনা তিনি একটা বৌও নাকি এফোর্ড করতে পারেন না। আমি তখন গত দেড় বছর যাবৎ তাঁর যত কিছু হারিয়েছে, খোয়া গেছে বা চুরি গেছে, গত দুই বৎসরের নথিপত্র (Record) ঘেঁটে তার একটা হিসাব করে—উক্ত সংখ্যাকে বারো দিয়ে ভাগ করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, যে, গড়ে প্রতিমাসে তাঁর যা খোয়া যায় বা চুরি যায় তা

দিয়ে তিনি শুধু একটা নয়, তুটো বৌ মেইনটেন করতে সক্ষম, কথাটা আমি বিবাহভীরু, বিপত্নীক এবং অবিবাহিতদের ভেবে দেখতে বলি।

চাকর চোর বলতে সাধারণভাবে আমরা পেশাদারি চোরদেরই বুঝি। এরা একমাত্র চুরি করার উদ্দেশ্যেই চাকুরি নিয়ে থাকে, এবং সুযোগের অভাবে চুরি করতে অক্ষম হ'লে চাকরী ছেড়ে চলে যায়। এরা এক এক বাড়ীতে এক এক নামে বাহাল হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম এরা বাটীর ছোট বড় সকলকেই তাদের কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা মুগ্ধ করে দেয়।* এই ভাবে তারা সুযোগ-সুবিধাও অনেক পরিমাণে আদায় করে থাকে। এর পর হঠাৎ একদিন সুযোগ মত দামী দ্রব্য বা অর্থাদি বা অলঙ্কার অপহরণ করে এরা উধাও হয়ে থাকে। এদের কেহ কেহ তাদেব কর্ম্মপদ্ধতিব কিছু কিছু অদল-বদলও করে থাকে। প্রথম দিনেই এরা অপহৃত দ্রব্য বাড়ীর বাইরে নিয়ে যায় না। দ্রব্যাদি অপহরণ কবে বাড়ীর মধ্যেই কোনও গুপ্তস্থানে ঐগুলিকে এরা লুকিয়ে বাখে, সাবধানে এবং সংগোপনে। কয়েক দিন পব বাড়ীর লোকেরা দ্রব্যগুলির জন্যে খোঁজাখুঁজি করে নিরস্ত হ'লে, পরে সুবিধামত একদিন অপহৃত দ্রব্যগুলি ঐ সকল গোপন স্থান থেকে সরিয়ে হঠাৎ একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে এবা পলায়ন করে। চুরির দিন সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাড়ীতে হাজির থাকায় সহসা এদের কেহ সন্দেহও করে না।* এদের অনেকে বাসন চুরি করে উহাদের গামছায় বেঁধে বাড়ীর পুকুরে ডুবিয়ে রেখে নিশানা স্বরূপ নিকটে একটা কঞ্চি পুঁতে রেখে থাকে।

---

* চাকর চোরদের কেহ কেহ সেবা-শুশ্রূষার ছলে বাড়ীর কর্তা বা অন্য কারও বিকৃত যৌন-বোধের উপশম ঘটিয়ে এমন ভাবে তাদের প্রিয়পাত্র, হয়েছে যে বাড়ীর অপর সকলে তাকে ভৎ'সনা পর্য্যন্ত করতে সাহসী হয় নি। সাধারণতঃ পায়ে বা দেহে তেল মালিশ করবার সময় এইরূপ সেবা তারা করে থাকে।

পরের দ্রব্য না বলে গ্রহণ করলে চুরি করা হয়। চৌর্য্য অপরাধের সংজ্ঞা অনুযায়ী ঐ দ্রব্য অস্থির বা অস্থাবর হওয়া চাই এবং উহা অসদুদ্দেশে অপসারণ করা চাই। এইরূপ সংজ্ঞানুযায়ী কেহ কাহারও দ্রব্য চুরি করার উদ্দেশে স্বত্বাধিকারীর টেবিল হ'তে উক্ত দ্রব্য সরিয়ে যদি উহা কেহ ঐ টেবিলেরই এক ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দেয়, তা হ'লেও ঐ অপকার্য্যকে বলা হবে চৌর্য্য অপরাধ। এই সব চোরদের প্রায়ই অলঙ্কারাদি বাড়ীর ভিতরেই কয়লা ঘুঁটের গাদার মধ্যে বা ইলেক্‌ট্রিক মিটার বক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে দেখা গেছে। এরা কাজ হাসিলের উদ্দেশে বিশেষ করে বাড়ীর কর্ত্তার অত্যন্তরূপ প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হবার চেষ্টা করে।

এই সকল চাকর চোরেরা ধরা পড়ার পর এক অভিনবরূপ মিথ্যা-ভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে থাকে। নিম্নের বিবৃতিটি এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি মশাই একজন নিরপরাধী ব্যক্তি। আমি অপরাধী বটে, কিন্তু চোর নই। ফরিয়াদির যুবতী কন্যার সঙ্গে আমার প্রেম হয়। আমি গোপনে রাত্রিযোগে কথিত কন্যার ঘরে যেতাম, কিন্তু কাল ধরা পড়ে যাই। ক্রুদ্ধ হয়ে ফরিয়াদি এই ঘটিটা আমার হাতে দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে। লোকলজ্জাবশতঃ আসল বিষয়টি উনি গোপন করেছেন। ফরিয়াদীর স্ত্রীও আমাদের এই প্রেম সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তিনিও আমাকে গোপনে বাটি-বাটি দুধ খাইয়েছেন।"

চাকর-বাকরদের প্রায়ই এই ধরণের মিথ্যা বিবৃতি থানায় দিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধীরাই এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেয়। কোনও এক চাকর-চোর গহনাশুদ্ধ ধরা পড়ার পর এইরূপ উক্তি করে, "বড় গিন্নীমা আমাকে কর্ত্তাকে না জানিয়ে চুপি চুপি বাঁধা

খা বিক্রী করে টাকা আনতে বলেছেন।" অপর আর এক (নারী) অপরাধী এইরূপ অবস্থায় নিম্নোক্তরূপ উক্তি করে, "দাদাবাবুর সঙ্গে আমার প্রেম হয়। তিনিই আংটিটা চুরি করে আমায় উপহার দেন। এখন ভয়ে ও লজ্জায় উনি একথা অস্বীকার করছেন।"

কোনও কোনও ভৃত্যের বাহিরে প্রেয়সী থাকে। তাদের উপহার দেবার জন্যও তারা গহনা চুরি করেছে। কোনও কোনও ঝি'রও বাহিরে অনুরূপ চোর (বা না) উপপতি আছে। এরা নিজের নামে দু'জনের উপযুক্ত অন্নাদি নিয়ে যায়। তবে কেহ কেহ চুরির পরই দ্রব্যসহ দেশেও চলে গিয়েছে।

এমন অনেক গৃহস্থ আছেন, যাঁরা কি'না ছয় মাস পূর্ব্বে চাকর নিয়োগ করেছেন অথচ তাঁকে তার পুরা নাম বা দেশের ঠিকানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার কিছুই বলতে পারেন না। পীড়াপীড়ি করলে সলজ্জভাবে তিনি এইটুকু মাত্র বলবেন, কি জানি মশাই, কেষ্ট কেষ্ট বলে তো তাকে ডাকতাম আমরা। কিছুকাল পূর্ব্বে কোনও এক মাড়োয়ারীর গদি হতে জনৈক দেশবাসী বহু সহস্র মুদ্রা অপহরণ করে উধাও হয়, অপরাধীর নাম ও ঠিকানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হ'লে সে এইরূপ বলেছিল, "উনকা নাম? উনাকা নাম উ তো বোলা, সদাহরী, মতিহারী? নেহি হুজুর রামহরি ভি হোনে সেকতা। উনকো দেশকো ঠিকানা উ তো বোলা, হোগা মতিহারী, নেহি হুজুর গয়া, নেহি নেহি, বেলিয়া ভি হোনে শেকতা। কেয়া বোলে হুজুর, মেরি সত্যানাশ (সর্ব্বনাশ) হো গয়া।

অনেকে আবার নবাগত ভৃত্যদের নামধাম সম্বন্ধে অনেক পীড়াপীড়ি করতে নারাজ হন, কারণ এতে করে নাকি সে ভয় পেয়ে চলে গেলে তিনি আর চাকর পাবেন না। পেশাদার ভৃত্য-চোরদের হাতের

টিপ নিলে বা নামধাম টুকে নিলে, তারা ভয় খেয়ে যে সরে না পড়ে তা'ও নয়—কিন্তু এতে গৃহস্থের ক্ষতি না হয়ে উপকারই হ'য়ে থাকে। গৃহস্থদের উচিত, মাইনে দেবার সময়, চাকরদের সহি এবং তৎসহ তার টিপ সহিও নেওয়া, এতে চুরি করে পালালে তাকে সহজে ধরে আনা সম্ভব হয়। অন্যথায় পুলিশের পক্ষে এই সব চুরির কিনারা করা অতীব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, কারণ পুলিশ গৃহস্থদের মতই মানুষ মাত্র।* এছাড়া গহনা বা অর্থাদি বার করা বা ন্যস্ত করার সময়—উহা চাকর-বাকরদের সামনে বাহির বা ন্যস্ত না করাই ভাল, এই বিশেষ বাক্যটি সকল সময়ই আমি গৃহস্থদের স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি। এছাড়া সকল বিষয়েই চাকরদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু গৃহস্থালীর কার্য্য নিজেদের হাতাহাতি করে সমাধান করারও সময় এসেছে, এইরূপও আমি মনে করি। এতদ্বারা বাড়ীর পুত্রকন্যাগণ একদিক হ'তে যেমন কর্ম্মঠ হবে, অপরদিক থেকে তেমনি তারা আত্মনির্ভরশীলও হ'তে শিখবে, মনে রাখতে হবে, এ যুগ গণতান্ত্রিক যুগ, কতকটা সমাজতান্ত্রিকও বটে।

ইহা ছাড়া এমন অনেক গৃহস্থও এই সহরে আছেন, যেখানে কর্ত্তার চাকরের সম্বন্ধে গিন্নিমা, এবং গিন্নিমার চাকরের সম্বন্ধে বাড়ার মেজবাবু কোনও কিছুই জানাতে পারেন না—এইরূপ বিলিব্যবস্থার সুযোগও এই সব চাকর চোরেরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। বাড়ীতে অনেকগুলি ভৃত্য থাকলে কোন ভৃত্যটি দ্বারা চৌর্য্য অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে তা জ্ঞাত হওয়াও অত্যন্তরূপ দুষ্কর হয়ে উঠে।

অধুনাকালে কোনও কোনও সুধী ব্যক্তি মনে করেন যে এই সব

---

* চালাকীর সহিত মসৃণ কাঁচের গেলাসে জল আনতে বলে অলক্ষ্যেও এদের অঙ্গুলির টিপ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

গৃহস্থালী ভৃত্যদের সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা উচিত, মোটর চালকদের লাইসেন্সের অনুযায়ী। লাইসেন্স মাত্রেই রীতিমত পুলিশ তদন্তের পর দেওয়া হয়, এই কারণে লাইসেন্স প্রাপ্ত ভৃত্যদের সম্বন্ধে কোনওরূপ ভয়ও থাকে না ; উপরন্তু ইহা দ্বারা রাজস্বের আয়ও কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়, ইহা দেশের আইন সভার বিবেচ্য বিষয়, দেশের শাসন বিভাগের এ সম্বন্ধে কোনও কিছু করবার নেই।

কোনও কোনও গৃহস্থ ভৃত্যগণকে অত্যন্তরূপ বিশ্বাস করে থাকেন, কিন্তু বাহিরের কোনও ব্যক্তিকে—বিশেষরূপ খোঁজ-খবর না নিয়ে এতটা বিশ্বাস করা অতীব অন্যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাক্।

"কোনও একটি ভদ্রলোক থানায় এসে জানায়, তাঁর বাড়ীতে না'কি একটা 'মিস্‌ট্রিয়াস্' চুরি হয়েছে। তিনি সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে দেখেন, তাঁর স্ত্রী তখনও পর্য্যন্ত সিনেমা হ'তে ফেরেন নি। এরও কতক্ষণ পরে তাঁর স্ত্রী বাড়ী ফিরেন, বাড়ীতে তখন অন্য কেহই উপস্থিত ছিল না, এর পর তাঁর স্ত্রী ড্রয়ার খুলে বস্ত্রাদি ন্যস্ত করতে গিয়ে দেখতে পান, তাঁর সমুদয় অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়েছে। এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তদন্তের ব্যপদেশে অকুস্থলে এসে হাজির হই। তদন্তের সময় কোঁচা ঝোলানো টেরি কাটা একটি ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করছিলেন ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার প্রশ্নের জবাব তিনিই দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন কি কোন দিক হতে চোরটা এসে থাকতে পারে সেই সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞের মতই তিনি আমাকে এবং বাড়ীর আর সকলকে বুঝাবার চেষ্টাও করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, আপনি এ বাড়ীর কে?' উত্তরে ভদ্রলোক আমাকে জানালেন, 'আজ্ঞে, আমি? আমি এ বাড়ীর কুক (Cook)।'

ফরিয়াদীর স্ত্রীও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এইবার তিনি বলে উঠলেন, 'ও আমার কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড।* আমার মতে ও ঠিকই বলছে।' এর পর আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে পাশের সোফাটায় বসে পড়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি ইংরাজী জান?' উত্তরে লোকটি বলে উঠে, 'আজ্ঞে না, ফ্রেঞ্চ জানি।' আমি পুনরায় প্রশ্ন করি, 'তাই নাকি, তা ফরাসী বলতে পার?' উত্তরে লোকটা বলে চলে, 'নিশ্চয়ই, এই শুনুন না, মসিঁয়ে, বুনজুর মসিঁয়ে, ওয়ারে ভোঁ, লেলেপে।' এইবার ফরিয়াদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি বলে উঠি, 'এই আপনাদের চাকর? একে আমি আপনার ভাই বা শ্যালক-ট্যালক বা ঐরূপ একজন আত্মীয় মনে করেছিলাম, বেশ ভাল চাকর তো, কতদিন আছে?' এ ছাড়া মনে মনে আমি এ'ও বলি, 'মশাই শীঘ্র বিদায় করুন, নইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত।' উত্তরে ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন, 'মাস তিনেক হবে বাহাল হয়েছে।' আরও কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের পর, আমি ফরিয়াদীকে জানাই, ঐ চাকরটির উপর আমার অত্যন্তরূপ সন্দেহ হচ্ছে, এবং তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থানায় নিয়ে যেতে চাই। আমার অভিমত শুনে ফরিয়াদীর স্ত্রী অত্যন্তরূপ নারাজ হয়ে উঠেন, তা ছাড়া তিনি ক্রুদ্ধও হন। মহিলাটি বিরক্ত হয়ে বলে উঠেন, 'ও সব আপনার বাজে সন্দেহ। ও কি শুধু বাড়ীর চাকর ও আমার ছেলে! যা রে যা, তুই কাজ করগে যা।' মনিবনীর আদেশ পাওয়া মাত্র লোকটা নিমিষে অন্তর্হিত হয়ে যায়। দূর হ'তে চাকরটার কর্ম্মতৎপরতা আমি উপলব্ধি করতে থাকি। নিমিষের মধ্যে সে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেদের পরিচর্য্যার কাজ শেষ করে দিল,

---

* চাকর এবং রাঁধুনী—এই উভয়েরই কার্য্য যারা করে তাদের বলা হয় কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড।

সেই সঙ্গে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজও। এদিকে আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা, চাকরকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবই। ভদ্রমহিলা এইবার তিক্ত স্বরে বলে উঠলেন, 'তা নিয়ে যাবেন বই কি। আপনি ওকে নিয়ে যান, আর আমি হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে থাকি, আর কি? পুলিশে খবর দিয়ে তো দেখছি, এইটুকুই লাভ। না মশাই আমরা আর কেইস্ করতে চাই না, আমি কেইস্ তুলে নিচ্ছি।' বুঝলাম, ভদ্রমহিলা একদিনের জন্যও বন্ধনশালায় প্রবেশ করতে নারাজ। এই কারণে তিনি গহনা ছাড়তেও বাজী, কিন্তু চাকর ছাড়তে রাজী নন। আমি কিন্তু এঁদের কোনও প্রতিবাদই গ্রাহ্য না করে চাকরটাকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনি। থানায় এসে চাকরটি স্বীকার করে যে গহনা চুরি সেই করেছে। শুধু তাই নয়, যে দোকানে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করে এসেছে, সেই দোকানেও আমাদের সে নিয়ে যায়। কিছু গহনা সে ইলেক্‌ট্রিক মিটার বক্সের মধ্যেও লুকিয়ে রেখেছিল। এই ভাবে সমুদয় অপহৃত গহনা, যার মূল্য ছিল, নয় হাজার টাকা—আমরা ঐ চাকরের কথা মতই উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এর পর বিষয়টি আগাগোড়া অনুধাবন করে মহিলাটি বলে উঠেছিলেন, 'ওরে, ও হোরে, এঁ্যা, তোর মনে এই ছিল। তোর হাতে যে আমি আমার লাখ টাকার শিশু পুত্রদের ছেড়ে দিয়েছি। সর্ব্বনাশ, তা মশাই কিছু মনে করবেন না, আমারই ভুল। আপনি কিন্তু কাল আমাদের এখানে এসে খাবেন। নিমন্ত্রণ রইল। হায়রে, এতগুলা গহনা, গিয়েছিল আর কি।' উত্তরে মহিলাটিকে আমি সেই দিন এইরূপ বলেছিলাম, 'তা আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই, তবে হাত পুড়িয়ে আপনি রাঁধতে পারবেন তো? আপনার কুকটিকে (Cook) তো আমি নিয়ে চললুম।"

চৌর্য্যবৃত্তি—অসাধারণ

উপরে সাধারণ চৌর্য্য অপরাধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, কিন্তু এই সাধারণ চৌর্য্য ছাড়া, অসাধারণ চৌর্য্যও দেখা যায়, ইহা দুই প্রকারের হয়, যথা সহজ ও মিশ্র। প্রথমে প্রবঞ্চকরূপে অগ্রসর হয়ে পরে চুরির আশ্রয় নেওয়া হলে আমরা উহাকে অসাধারণ মিশ্র চৌর্য্য বলি। ইহার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সহিত প্রবঞ্চনা ও চৌর্য্য অপপদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই চৌর্য্যপদ্ধতি অবিমিশ্র থাকলে উহাকে আমরা বলি সহজ চৌর্য্য। প্রথমে এই অসাধারণ সহজ চৌর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। চৌর্য্য অপরাধের সংজ্ঞার মধ্যে কেবলমাত্র অস্থাবর বা অস্থির (movable) দ্রব্য চুরির কথাই বলা হয়েছে, স্থাবর বা স্থির (immovable) দ্রব্য অধিকার করলে উহাকে চুরি বলে না, উহাকে বলা হয় অনধিকার প্রবেশ। কিন্তু কোন কোনও ক্ষেত্রে অস্থির দ্রব্যও চুরি করা সম্ভব হয়, এই স্থলে স্থাবর দ্রব্যকে অস্থাবর বা অস্থির দ্রব্যে পরিণত করা মাত্র উহা চুরির পর্য্যায়ে এসে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, না বলে অপরের গাছ কাটার কথা বলা যেতে পারে। বৃক্ষ একটি স্থির দ্রব্য, উহা চুরি করা যায় না, কিন্তু যখনই উহা কাণ্ডচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়েছে, তখনই উহা অস্থির দ্রব্যে পরিণত হবে। এইরূপে কাণ্ডচ্যুত করাকে আইনমত অপসারণ বলা যেতে পারে—এই কারণে বৃক্ষটি মাটিতে পড়ামাত্র বৃক্ষচ্ছেদককে চোর আখ্যায় ভূষিত করা যায়, কর্ত্তনের পর বৃক্ষকাণ্ডটি কার্য্যতঃ অপসারণ না করলেও, কেবলমাত্র কর্ত্তনের কারণেই বৃক্ষচ্ছেদক চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হ'তে পারে। নারিকেল চুরি, আম, কাঁটাল চুরি ইত্যাদি চুরিকেও এই কারণে আইনানুসারে চুরি বলা হয়। কোনও এক লাইট রেলওয়ের ইঞ্জিন চালক পথিমধ্যে ইঞ্জিন থামিয়ে কাঁটাল

চুরি করেছিল, এই অপকর্ম্মের জন্যে তাকে চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পল্লীগ্রামে কোনও কোনও বালক ফাঁপা পাঁকাটির সাহায্যে খেজুর গাছের কলসী হ'তে রস চুষে খায় বা ঐ ভাবে ঐ রস বার করে নেয়। কোনও কোনও দুষ্ট মোটর ড্রাইভার আছে, যে কি'না এই একই প্রণালীতে ভেকুয়মকৃত রবার পাইপের সাহায্যে মালিকের অজ্ঞাতে মোটর হ'তে পেট্রল চুরি করে তা বিক্রী করে থাকে। ইহা একপ্রকার চুরি—ইহা ছাড়া নষ্ট চন্দ্রের রাত্রে বালকেরা যা চুরি করে, তাহাকেও চুরি বলা যায়।

অসাধারণ সহজ চৌর্য্য সম্বন্ধে বলা হ'ল, এইবার অসাধারণ মিশ্র চৌর্য্য সম্বন্ধে বলব। আমরা পুকুর চুরির কাহিনী শুনেছি, যদিও কি'না পুকুর চুরি সম্ভব নয়। কিন্তু পুকুর চুরি* সম্ভব না হলেও, কোনও এক বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ী চুরিও সম্ভব হয়েছিল। ইহা অসাধারণ মিশ্র চৌর্য্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ঘটনাটি ছিল এইরূপ :

"কলিকাতার উত্তরাঞ্চলবাসী কোনও এক ভদ্রলোকের সহরের

* পুকুর চুরি সম্ভব নয়। কিন্তু রাত্রে জাল ফেলে পুকুরের মাছ চুরি সম্ভব। পল্লীগ্রামে ইহা হামেসাই হয়ে থাকে। ক্ষেত বা খামারের কাজের জন্যে অপরের পুকুর হতে জল নিকাশ করে নেওয়ারও নজীর আছে। সরকারী খাল হতে বিনামূল্যে জল বার করলেও উহাকে চুরি বলা হয়। এইভাবে গ্যাস বা ইলেকট্রিক-সিটি চুরি করাও সম্ভব। পুকুর হ'তে মাছ চুরিকেও চুরি বলা হয়। কিন্তু নদী হ'তে মাছ চুরিকে চুরি বলা হয় না, এমন কি যদি কোনও পুকুর, খাল বা নালা দ্বারা এমন ভাবে নদীর সহিত সংযুক্ত থাকে যাতে ক'রে কি'না পুকুরের মাছ ইচ্ছা করলে নদীতে চলে যেতে পারে তাহ'লে ঐরূপ পুকুর হ'তে মৎস্য চুরি করলে উহাকে চুরি বলা হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মৎস্যগুলি বন্দীকৃত অবস্থায় (পুকুরের মালিকের হেপাজতে) নেই, মুক্ত অবস্থায় আছে। অতএব ঐগুলি কোনও ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তিও নয়।

দক্ষিণাঞ্চলের সহরতলীতে একটি সুবৃহৎ ত্রিতল বাড়ী ছিল। বাড়ীটি তিনি জনৈক তথাকথিত ধনী ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেন। ভাড়াটিয়া ভদ্রলোক প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই বাড়ীওয়ালাকে তার প্রাপ্য ভাড়া চুকিয়ে দিতেন, এ বিষয়ে তাঁর কখনও কোনওরূপ ত্রুটি হয় নি, এ ছাড়া ঐ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের ব্যবহারও ছিল অতি মধুর। একদিন তিনি বাড়ীর মালিককে জানালেন, আপনি বুড়ো মানুষ, কষ্ট করে আসেন কেন? দমদমায় আমার ফ্যাক্টরী আছে, রোজই তো যেতে হয় ওখানে। তা ছাড়া আমার যখন মোটর আছে, ফিরবার মুখে ভাড়াটা আমি নিজেই পৌছে দেব আপনাকে। এর পর হতে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে ভদ্রলোক নিজেই ভাড়াটা পৌছে দেন, বাড়ীওয়ালার আর কষ্ট করে একদিনও সহরতলীতে আসতে হয় নি। এদিকে ঠগী ভদ্রলোক পাড়ার লোকেদের সহিত অত্যন্ত রূপ মেলামেশা সুরু করে দেন, নীচের তলাটা পাড়ার ছেলেদের খেলা-ধূলা, ক্লাব ও লাইব্রেরীর জন্যে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, মাঝে মাঝে আবালবৃদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজও করান হয়—এককথায় পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ। একদিন তিনি পাড়ার ভদ্রলোকদের ডেকে পরামর্শ চাইলেন—'হ্যাঁ মশাই, বাড়ীওয়ালা বাড়ীটা আমায় বিক্রী করতে চাইছেন, কি বলেন, কিনবো না'কি?' এইরূপ একটি বিশিষ্ট পরোপকারী ভদ্রলোক পাড়ায় স্থায়ীভাবে থেকে যায়—কে না তা চাইবে, সকলেই এই সাধু প্রস্তাবে তাঁকে উৎসাহিতই করেন, তাঁরা এও বলেন যে, ঐরূপ ভাগ্য কি তাঁদের হবে ইত্যাদি। এর কয়েক দিন পরে তিনি পাড়ায় রটিয়ে দেন, বাড়ীটি তিনি এইবার সত্য সত্যই কিনলেন, শুধু তাই নয় মহা ধুমধামে তিনি গৃহ প্রবেশেরও ব্যবস্থা করলেন। এই উৎসবে যাগ-যজ্ঞ তো হ'লই, তা ছাড়া পাড়ার

স্ত্রী পুরুষকেও তিনি ভূরিভোজন করাতে কার্পণ্য করলেন না। বাড়ীর ভাড়াটা কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বাড়ীওয়ালাকে বাড়ী ব'য়ে সমান ভাবেই তিনি দিয়ে আসছিলেন। এরও দুই তিন মাস পরে তিনি সকলকে জানালেন, বাড়ীটা তাঁর পছন্দসই নয়, তিনি উহা আগাগোড়া ভেঙ্গে ফেলে, ঐ স্থানেই নূতন ক'রে বাড়ী তৈরী করবেন। এই প্রস্তাবে পাড়ার লোকে অবাক হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করে না; তারা মনে করে ভদ্রলোক যুদ্ধের বাজারে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেছেন, কোনও রূপে উহা ব্যয় করা তো চাই ইত্যাদি। এর পর ভাঙাইওয়ালা ডাকা হয়, এবং বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাড়ীর ইট পাথর লোহার কড়ি বরগা ও জানালা দরজা ইত্যাদি উহারা ভেঙে নেয়। যুদ্ধকালীন বাজারের দরুণ এই সব লোহা, ইঁট, কাঠকুঠার অগ্নিমূল্য থাকায় ঐগুলি সহজেই বিক্রী হয়ে যায়। এর পরও মাস দুই ভদ্রলোক যথা নিয়মে বাড়ীওয়ালাকে ভাড়া পৌছতে থাকেন। বাড়ীওয়ালা তখনও পর্য্যন্ত জানতে পারেন নি যে তাঁর বাড়ী নেই, আছে শুধু এক-টুকরা জমি। এর পরের মাসে ভদ্রলোককে যথা সময়ে ভাড়াসহ আসতে (ভাড়া দিতে) না দেখে গৃহস্বামী চিন্তিত হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, 'ওরে, ও খোকা! এমনটি তো কখনও হয় নি, নিশ্চয় ভদ্রলোকের অসুখ করেছে। আহা-হা, বড় ভাল লোক তিনি। যা, যা দিকি একবার, দেখে আয়, সহরে যা কলেরা হচ্ছে, না গেলে খারাপ দেখাবে।' পিতার আদেশে খোকা রাত্রি আটটায় অকুস্থলে এসে হাজির হন, কিন্তু তাদের নিজ বাড়ীটি বহু চেষ্টাতেও খুঁজে পান না। বাড়ী এসে বিষয়টি জানালে পিতাঠাকুর হুঙ্কার দিয়ে ধমকে উঠেন, 'হারামজাদা কক্ষণো তুই যাস্ নি। নিজের বাড়ী খুঁজে পেলিনি, একি একটা কথা না'কি; ছিঃ ছিঃ ভদ্রলোক

'কি মনে করছেন বল তো, কেউ একবার খোঁজও করলি না তাঁর।'
পরের দিন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, নিজেই লাঠি হাতে 'ঠুকঠুক করে অকুস্থলে এসে হাজির হোলেন—কিন্তু তাঁর বাড়ী? বাড়ী তাঁর কোথায়? বিস্মিত হ'য়ে তিনি একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ মশাই, অমুক নম্বরের বাড়ীটা কোনটে বলতে পারেন? চোখে মশাই, সব আর ঠাউর পাই না, বয়স হয়েছে। পথচারী ভদ্রলোক ততোধিক বিস্মিত হয়ে উত্তর করলেন, 'সে কি মশাই, আপনার বাড়া? বাড়ী না আপনি বিক্রী করে দিয়েছেন।' সকল সমাচার অবগত হয়ে গৃহস্বামী ভদ্রলোক 'হা হতোস্মি' বলে মাটিতে বসে পড়েছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও তিনি ঐ ঠগী ব্যক্তির 'এ পর্য্যন্ত কোনও খোঁজ পান নি—ঠগী ভদ্রলোক হয় তো এতক্ষণে ভারতের অপর আর এক জনবহুল সহরে এসে অড্ডা গেড়ে লোক ঠকাচ্ছেন বা লোক ঠকাবার তালে আছেন।"

কোনও কোনও সহরে এইরূপ বাড়ী-চুরি পদ্ধতির কিছু কিছু অদল-বদল হয়েও থাকে। দুর্ব্বৃত্তগণ প্রথমে সন্ধান নেয়, সহরতলীতে কোনও বিরাট বাড়ী তৈরী হচ্ছে কি'না, বাড়ীর মালিকের বর্ত্তমান অবস্থাই বা কিরূপ? এবং বাড়ীর মালিক ঐ বাড়ী হ'তে কতদূরে বসবাস করে। এর পর দুর্ব্বৃত্তটি একজন ধনী ব্যক্তি পেয়ে মালিককে আশাতীত রূপ ভাড়া দিতে চায়, এবং এও সে বলে যে সে নিজেই মনের মত করে বাড়ীর অবশিষ্ট অংশের নির্ম্মাণ কার্য্যটুকু স্বব্যয়ে সমাধা করে নেবে। এর পর দুর্ব্বৃত্তটি বাড়ীটি নিজের লোকেদের দ্বারা তৈরী করতে আরম্ভ করে দেয়—পাড়ার লোকে মনে করে বাড়ীটি দুর্ব্বৃত্তের নিজেরই বাড়ী। কয়েক মাস সে বাড়ীর মালিককে যথারীতি ভাড়াও দিয়ে আসে, এর পর একদিন সুবিধামত ভাঙাইওয়ালা ডাকিয়ে চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকায় সমস্ত বাড়ীটা ভেঙে,'মাল-মশলা যা কিছু, কড়ি,

বরগা, জানালা, দুয়ার, ইলেকট্রিক ফিটিঙস্, জলের পাইপ, সিস্টার্ন ইত্যাদি বিক্রী করে দিয়ে সরে পড়ে। কিছুদিন পরে মালিকের দরোয়ান এসে বাড়ী না দেখতে পেয়ে মালিককে জানায়—হুজুর উহা কুঠি নেহি হ্যায়, সেরেফ জমীন্। মালিক মশাই এ কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি দরোয়ানকে ধমক দিয়ে বলেন, "পাগলা হ্যায় তুম, কুঠি কোই উঠাকে লেনে সেকতা, ফিন যাও, দেখো বাবুকো ব্যামার উমার কুছ জরুর হুয়,' ইত্যাদি।

এই বিশেষ স্থলে বাড়ীটি স্থাবর সম্পত্তি হলে, উহা ভেঙে দেওয়া মাত্র, ঐ ভগ্ন দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে—এই কারণে ঐ সম্পত্তির অপসারণ কার্য্যকে আমরা চুরিই বলব।

পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের দ্রব্যাদি না বলিয়া গ্রহণ করলেও চুরি করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে: ধরুন, আপনার একটি ঘড়ি আছে। আপনি এই ঘড়িটি কোনও ঘড়ির দোকানে সারাতে দিলেন। এর পর আপনি মেরামতের দাম না দিয়ে দোকানদারের অজ্ঞাতে ও বিনানুমতিতে যদি ঘড়িটি লইয়া আসেন তো আপনার এই কার্য্যকে আইনানুসারে অপকার্য্য বা চুরি বলা হবে। এ ছাড়া যদি কেহ বাড়ীর কোনও অপরিণতমনা লোক বা অল্পবয়স্ক বালকের নিকট হ'তে বাড়ীর বড়দের অগোচরে কোনও দ্রব্যাদি চেয়ে নেয়, তা হলেও ঐরূপ অপকার্য্যকে চুরি বলা হয়ে থাকে, এ সম্বন্ধে চৌর্য্য অপরাধের সংজ্ঞা (defination) দ্রষ্টব্য।

চৌর্য্য অপরাধের অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায়, যৌনজ পদ্ধতিও পরিলক্ষিত হয়। প্রেম করবার অছিলায় দুর্ব্বলচিত্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করে মূল্যবান দ্রব্য এবং অর্থাদি অপহরণ করেছে, এমন কন্যারও পৃথিবীতে অভাব নেই, তবে এদেশে এই প্রকার মেয়ের সংখ্যা এখনও

অত্যল্প। 'এই স্থলে মন চুরির কোনও প্রশ্ন উঠে না, দ্রব্যাদি চুরির কথাই উঠে, কারণ এই সকল মেয়েদের নিকট মনের কোনও বালাই নেই। এই প্রকারের চুরির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত হ'ল।

"সেদিন ছিল শনিবার। কাজ-কর্ম্ম সেরে উঠে পড়ছিলাম এমন সময় এক ডাক্তার ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে নালিশ জানালেন। নালিশটি ছিল এইরূপ : 'আমি অমুক গণিকার গৃহে চিকিৎসা করতে গিছলাম। আমার রূপার ঘড়িটা সময় নির্ণয়ের জন্য চৌকির উপর খুলে রেখে আমি মেয়েটির নাড়ী দেখছিলাম, কিছুক্ষণ পরে জল দ্বারা হস্ত ধৌত করে চৌকির কাছে এসে দেখি, আমার ঘড়িটি সেখানে নেই। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমার ঘড়িটি ঐ মেয়েটিই চুরি করেছে।' এজাহারটি ছিল চুরির, এই কারণে বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যক-ভাবে তদন্ত করতে হয়েছিল। তদন্ত ব্যপদেশে কথিত গণিকাটিকে আমি প্রশ্ন করি, 'ডাক্তার সাহেব যা বলছেন তা সত্যি ?' গণিকাটি তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে এইরূপ একটি বিবৃতি দেয়—'কতকটা সত্যি, সবটা নয়। উনি ওঁর প্রোফেস্যানাল কলে আমার বাড়ী আসেন নি, উনি আমার বাড়ী এসেছিলেন আমার প্রোফেস্যানাল কলে, বিশ্বাস না হয় দেখুন ওঁর ডান উরুদেশ, ওখানে একটা কালো তিল আছে কি'না ?' এর পর ডাক্তারবাবু একবারমাত্র খিঁচিয়ে উঠেন, কিন্তু তার পরেই অধোবদন হয়ে যান। কিন্তু ব্যাপারটি যাহাই হোক, আসলে এই সুযোগে গণিকাটি তাঁর ঘড়িটি চুরি করেছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল না।"

বেশ্যালয়ে এইরূপ চুরি হামেসাই হয়ে থাকে, গণিকাদের চাকর-বাকররাও এইভাবে চুরি করে। মদ্যপানে অচৈতন্য যুবকদের পকেট হাতড়ানো. বেশ্যালয়ের এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই যৌনজ চৌর্য্য পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা যাক।

"আমি মশাই একজন শিক্ষিত চোর। জনৈক মাড়োয়ারীর গৃহে আমি শিক্ষক নিযুক্ত হই। দুইটি ছোট ছোট শিশুকে আমি ইংরাজী পড়াতাম। দুপুরবেলা কেউ বাড়ী থাকত না, এই সুযোগে আমি মাড়োয়ারী গিন্নির সহিত আলাপ জমাই। আসলে কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা, প্রেম করা নয়। এমনি কিছুদিন যাবৎ সংলাপের পর একদিন আমি এইরূপ এক আবদার করি—'যেতনা আচ্ছি কাপড়া হ্যায়, উস সব পিনকে মেরি সামনে খাঁড়া হো যাও, হাম ইস্ রূপ আঁখ ভরকে দেখ লেঙ্গে—মেরি পিয়ারী, এ মেরি ভিক্ষা হ্যায়।' আমাকে খুসী করার উদ্দেশ্যে প্রিয়তমা আমার তৎক্ষণাৎ তার সব চেয়ে ভাল শাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি পরিধান করে, শুধু তাই নয়, হীরা জহরৎ বসান তার সমুদয় গহনাগুলিও সে গায় দেয়। কপালে টিকলি হতে গলার হার এবং হাতের বাজু, চুড়ি প্রভৃতি—মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কারে সে ভূষিত হযে উঠে। আমি গদগদ চিত্তে সে রূপ নেহারিয়া মুগ্ধ হয়ে বলে উঠি—হ্যায় হ্যায় কেয়া বলে, ইতো আসমান। দুনিয়ামে কাঁহা বেহস্ত হ্যায় তো উ ইঁহাই।' উত্তরে প্রিয়তমা জানায়, 'হামি তো তুহরি, জনাব।' এর পর আমি তার নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখবার অজুহাতে একে একে নিজ হস্তে তার সমস্ত গহনাগুলি খুলে একটা রুমালে বেঁধে তা তার ডান পাশে রাখি। তার মূল্যবান কাপড়-চোপড়গুলি রাখি একটা পুঁটলি বেঁধে তার বাম পাশে। এর পর আমি গদগদ চিত্তে অনুরোধ (বা আদেশ) করি, 'আচ্ছা, আভি আঁখ বুদ্।' প্রিয়তমা আমার চক্ষু মুদিলে আমি আবেগময় ভাবে বলে উঠি—'হ্যায় হ্যায়, কেয়া বোলে', ইত্যাদি। এর পর আমি তাকে চক্ষু খুলবার

আদেশ জানাই, 'আঁখ্ খুল।' এই উপরোধ অনুরোধটি খেলাচ্ছলেই হতে থাকে, এইভাবে কয়েকবার সে চক্ষু মুদ্রিত ও উন্মুক্ত করে, শেষের বার সে চক্ষু মুদ্রিত করা মাত্র আমি দুই হাতে দুইটি পুঁটলি গ্রহণ করে, দাঁত দিয়ে দরজার খিল খুলে একেবারে রাস্তায় পাড়ি দিই, পরে শুনেছি চক্ষু খুলবার পুনরাদেশ না পেয়ে প্রিয়তমা নিজেই চক্ষু উন্মুক্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এও বুঝতে পারে যে তার যাবতীয় অলঙ্কারাদি চুরি হয়ে গেছে। সে 'চোর চোর,' বলে চীৎকার করে উঠে বটে, কিন্তু আসল তথ্যটি কারও কাছে প্রকাশ করে না।"

উপরের দৃষ্টান্তটি হতে চৌর্য্য অপরাধের যৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে বুঝা যাবে। এমন অনেক স্বামীও আছেন, যিনি কি'না, রাত্রিযোগে ঘুমন্ত স্ত্রীর অলঙ্কার চুরি করে এই চৌর্য্য কার্য্যের জন্যে বাইরের কোনও চোরকে দায়ী করেছেন, এমন কি, এইভাবে তিনি থানায় এসে এজাহারও দিয়েছেন। এ ছাড়া এমন অনেক দুর্ব্বৃত্ত আছে, যে কিনা সালঙ্কারা কন্যার সহিত প্রেমাভিনয় করেছে, কেবলমাত্র তার গহনা চুরি করার জন্যে। এই সব মেয়েরা তাদের প্ররোচনায় মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও অর্থাদিসহ এই সব ভাবী স্বামীর সহিত গৃহত্যাগ করে এবং পরে এদের দ্বারাই সর্ব্বস্বান্ত হয়ে সহায় সম্বলহীন ভাবে পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ এক দুর্ব্বৃত্তের বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"মেয়েটিকে তার যাবতীয় গহনাপত্রসহ ফুসলে এনে তাকে অমুক ষ্ট্রীটের একটা কামরায় তুলি, এই সময় সমুদয় অলঙ্কারাদিই তার দেহে পরা ছিল। আমি গদগদ ভাবে তাকে এই সময় জানাই, 'তুমি যে কত সুন্দর তা আমি আজ বুঝছি। এত কাছে না পেলে এরূপ কোনদিনই আমি উপলব্ধি করতে পারতাম না। আজিকার এ মধু-যামিনীতে স্বর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত গহনা তোমার আমার মাঝে প্রাচীর

তুলবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।' এর পর আমার অনুরোধে প্রিয়া আমার তার দেহের সকল গহনাপত্র খুলে রাখে। এর পর গভীর রাত্রে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে গহনার পুঁটলিটি নিয়ে আমি চম্পট দিই। বলাবাহুল্য, আমার নামধাম বা ঠিকানা পদবী আদি, সবই তাকে আমি মিথ্যে করে জানিয়েছিলাম—এর পর মেয়েটির অদৃষ্টে কি ঘটেছিল সেই সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে আমি অক্ষম।"

বামাল গ্রাহক—চৌর-বৃত্তি

চোরাই মালের গৃহীতাদের বামাল গ্রাহক, থাউ বা "রিসিভার অব্ ষ্টোলেন্ প্রপারটি" বলা হয়। এই সকল বামাল গ্রাহকগণ নিজেরা কখনও চৌর-কার্য্যে লিপ্ত থাকে না—অথচ এই সব গ্রাহকরাই লাভ করে বেশী। পাঁচশত টাকার মূল্যের দ্রব্যাদিও এরা মাত্র পঞ্চাশ বাইট টাকায় চোরদের নিকট হতে ক্রয় করে থাকে। বিভিন্ন রূপ দ্রব্য বিভিন্ন প্রকার গ্রাহকগণ নিয়ে থাকে। সাইকেলের দোকানে সাইকেল, কাপড়ের দোকানে কাপড় এবং সোনার দোকানে সোনা বিক্রয় করে থাকে। এ ছাড়া, এমন অনেক দালাল আছে যারা এই দ্রব্য সামান্য মাত্র মূল্যে ক্রয় করে ঐ সব দোকানে বিক্রয় করে আসে। কলিকাতা সহরে এমন অনেক ব্যবসায়ীও আছে, যাঁরা সামান্যমাত্র মূল্যে হাজার টাকার নম্বরী নোট ক্রয় করে থাকেন—এই সব নোট তাদের কারবারে প্রায়ই লেন দেন হয়, এই কারণে ধরা পড়লেও তাঁদের একটা কৈফিয়ৎ থাকে এবং তাঁরা আইন এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই শহরে এমন অনেক পোদ্দার আছে যারা গহনাদি পাবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উগা গলিয়ে ফেলে "বাট" তৈরী করে ফেলে; শুধু তাই নয় পরদিনই এই বাট তাঁরা

অন্যত্র চালান করে দিয়ে থাকেন। এই সব লেন-দেনের ব্যাপার পরিচিত চোরেদের সহিত হলে তাঁরা এ সম্বন্ধে নথি-পত্রে কোনও জমা বা খরচ লেখেন না, কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হ'তে পেলে পাঁচ টাকা মূল্যে কিনলেও উহা তাঁরা পঞ্চাশ টাকায় (উচিত মূল্য) কিনেছেন,—তাঁদের জমা বহিতে (কখনও কখনও) তাঁরা এইরূপ লিখে রাখেন, এমন কি বিক্রেতার একটি সইও তাঁরা ঐ খাতায় নিয়ে থাকেন।

এই সকল পোদ্দাররা সব সময়ই চোরেদের অপেক্ষায় হাপর জ্বালিয়ে বসে থাকেন। আমার মতে এই সকল পোদ্দারদের লাইসেন্স দ্বারা আয়ত্তাধীন করলে, অসাধু পোদ্দারগণ এখনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটলে চোরেরাও চুরি করবে কম। এই সব লাইসেন্স এদের চরিত্র সম্বন্ধে রীতিমত তদন্ত করে দেওয়া যেতে পারে, ফলে সাধু চরিত্রের পোদ্দারগণেরই প্রাদুর্ভাব হবে। এই সকল পোদ্দারগণের ন্যায় সহরের পুরাণো সাইকেলের দোকানগুলিরও লাইসেন্স হওয়া উচিত। এই সকল সাইকেল গ্রাহকগণ চোরাই সাইকেল ক্রয় করা মাত্র উহা ডিস-ম্যাণ্টেল (খুলে ফেলে) করে, উহার বিভিন্ন অংশগুলি অন্যান্য সাইকেলের অংশের সহিত বিনিময় করে দেয়, অর্থাৎ কিনা, এর অংশটি ওর সঙ্গে এবং ওর অংশটি এর সঙ্গে এরা যুক্ত করে দেয়, যাতে করে কিনা, সাই-কেলের মালিক সহজে তার সাইকেলটি চিনে নিতে না পারে। চোরাই সাইকেল এবং টাইপরাইটার প্রভৃতি হতে নম্বরগুলি তুলে ফেলে তৎস্থলে অন্য নম্বর খোদাই করতেও দেখা গেছে। কিন্তু এই সব চালাকি অধুনা যুগে (সকল সময়) কার্য্যকরী হয় না। কারণ খোদাই করার সময় যে চাপ পড়ে সেই চাপ সূক্ষ্মভাবে ধাতু নির্ম্মিত বস্তু মাত্রেরই শেষ স্তর পর্য্যন্ত (সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে) বিস্তৃত হয়ে থাকে। আপাততঃ দৃষ্টিতে এই নম্বর মুছে গেলেও আসলে তা মুছে না। উপরের স্থূল অংশ উখার

সাহায্যে উঠিয়ে ফেললেও নিম্নের সূক্ষ্মাংশের বিলোপ ঘটে না। এক রকম কেমিক্যাল আছে যাহার প্রলেপ ঐ মুছে যাওয়া অংশে নিক্ষেপ করা মাত্র ঐ নম্বর সূক্ষ্মভাবে প্রকট হয়।

বিভিন্ন রূপ চোরাই মালের মধ্যে মূল্যবান মোটরকারও একটি, কিন্তু এই মোটরকার বিক্রয় করা সম্ভব নয়, এই জন্যে এই সব গ্রাহকগণ মোটরকারগুলি ডিস্‌ম্যান্টেল করে উহার বিভিন্ন অংশগুলি বিক্রয় করে এই সব গ্রাহকেরা প্রায়ই অর্থবান হয়ে থাকেন। এদের কেহ কেহ কলিকাতার দ্রব্যাদি বোম্বাই শহরে এবং বোম্বাইয়ের দ্রব্যাদি মাদ্রাজে বা কলিকাতায় বিক্রয় করে থাকেন।

এই সকল চোরেরা চোরাই মাল দোকানে পৌছবার সময়ও অত্যন্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে, বিশেষ করে রাত্রিকালে। ভারি দ্রব্যাদি হলে ঐ দ্রব্য তারা কোনও এক রিক্সাতে তুলে দেয় এবং নিজে ঐ রিক্সায় দ্রব্যসহ না বসে রিক্সার পিছন পিছন চলতে থাকে। পুলিশ কিংবা অপর কেহ সন্দেহ করে রিক্সা আটকালে এরা পিছন হতে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। রিক্সাচালক বামালসহ ধরা পড়ে, কিন্তু সে আসল চোরের ঠিকানাদি সম্বন্ধে কোনও কিছু জানাতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বামাল রিক্সায় তুলে দিয়ে রিক্সাকে তিন মাইল দূরের কোনও এক স্থানে অপেক্ষা করবার জন্যেও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। আসল চোর তখন ট্রামে বা বাসে করে এসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বামাল গ্রহণ করে থাকে। কোনও কোনও রিক্সাওয়ালা বা ঝাঁকা মুটে আদির সঙ্গে যে তাদের এই বিষয়ে প্রত্যক্ষরূপ যোগসাজস্ না থাকে তা'ও নয়। কোনও রিক্সায় দ্রব্যাদি যাচ্ছে অথচ দ্রব্যের মালিক রিক্সায় জায়গা থাকা সত্ত্বেও, রিক্সায় না উঠে পায়ে হেঁটে রিক্সার পিছু পিছু চলেছে—এইরূপ কোনও দৃশ্য দৃষ্ট হলে, উহা সন্দেহ-জনক মনে করা উচিত। এ ছাড়া ভোরের দিকে তরিতরকারীর

ঝাঁকার মধ্যে চোরাই মাল সরানো হয়ে থাকে, কারণ এই সময় তরকারীওয়ালারা গ্রাম থেকে সহরের বাজারে আসে। সন্দেহ এড়াইবার ইহা এক প্রকৃষ্ট উপায়। সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি ও লোহা-লক্কড়ের দ্রব্যাদি তারা শহরের বিভিন্ন কালোয়ার গ্রাহকদের নিকট ঐ ভাবে বিক্রয় করে থাকে। এই সকল কালোয়ার গ্রাহকদের এক একটি প্রকাশ্য দোকান ও গুদাম থাকলেও এরা কতকগুলি গোপন গুদামও রেখে থাকে, এই সকল বামাল নিরাপদে গুদামজাত করবার জন্যে।

এ ছাড়া এমন সব বামাল গ্রাহক আছে যারা গবাদি জীব ক্রয় করে এ্যাসিড ও অগ্নির সাহায্যে তাদের বাঁকা শিঙ সোজা এবং সোজা শিঙ বাঁকা করে দিয়ে থাকে; উদ্দেশ্য, সনাক্তকরণ সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা। কোনও কোনও বামাল গ্রাহক বস্ত্রাদি চুরি করে ঐ কাপড়-গুলিকে ছাপিয়ে নেয়, কখনও বা মাড় লাগিয়ে ঐ গুলিকে তাঁতের কাপড়ে পরিণত করবার প্রয়াস পেয়ে থাকে।

সহরে এমন অনেক ভাঙাইওয়ালা, বিক্রীওয়ালা আছে, যারা একমাত্র বামাল গ্রহণ দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে থাকে। শহরের বিভিন্ন চোরাবাজার বা চোরাহাট্টার মিশ্র দ্রব্যের (পুরানো দ্রব্যের) দোকানগুলিও এই সকল চোরাই মাল গ্রহণ করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরানো চোরেরাও বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ দোকানের মালিক হয়ে থাকে। অপর দিকে পুরানো পুস্তকাদি বিক্রয় হয় পুরানো বইএর দোকানে। বলাবাহুল্য চুরির পরই এই সব বইএর উপর লিখিত মালিকের নাম ও ঠিকানা মুছে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে সকল সময়ই সকল পুরানো দোকানের মালিকরাই যে জেনে-শুনে চোরাই দ্রব্য গ্রহণ করে তা নয়, এদের মধ্যে বহু সৎ ব্যক্তিও আছে, যারা কি'না সন্দেহ হওয়া মাত্র এই সকল বিক্রেতাকে

আটকে রেখে পুলিশে খবর দিয়েছেন। এই সকল চোরাই দ্রব্যের গৃহীতাদের কাহারও কাহারও মধ্যে লোক ঠকাবারও অভ্যাস দেখা গেছে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি চোরাহাট্টার কোনও এক পুরানো দোকানে এসে এক জোড়া বুট জুতা মাত্র দশ টাকায় ক্রয় করি। জুতা জোড়া ছিল আনকোরা নূতন, উহার আসল মূল্য, অনুমান অন্ততঃ ত্রিশ টাকা হবে। মূল্য পাওয়া মাত্র দোকানদার সযত্নে জুতা দুটি একটা কাপড়ের মোড়কে পুরে মোড়কটি সুতা দ্বারা ভাল রূপে বেঁধে দেয়। আমি সানন্দ চিত্তে মোড়কটি নিয়ে গৃহে ফিরি, কিন্তু উহা খুলা মাত্র অবাক হয়ে যাই, নূতন বুটের বদলে মোড়কটির মধ্যে ছিল এক জোড়া পুরানো ছেঁড়া বুট। হাতসাফাই এর সাহায্যে দোকানদার কখন যে জুতা বেমালুম বদলে নিয়েছে, তা আমি টেরই পাই নি। আমি তৎক্ষণাৎ উক্ত দোকানে ফিরে আসি এবং এ সম্বন্ধে অভিযোগ জানাই। দোকানদার আমার এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে বলে উঠে—'কি বলেন বাবু, আমরা কি ওই রকম মানুষ! যাক, গোলমাল করে লাভ নেই, আসুন, আমার কাছে আর এক জোড়া নূতন বুট আছে, পাঁচ টাকায় নিয়ে যান। অর্দ্ধেক দরেই ছেড়ে দিলাম আপনাকে।' আমি ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে দেখি, দোকানদার আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত বুট জোড়াটাই বার করছে। এর পর আর আমি বোকা বানি নি। আমি বুট জোড়াটা পরিধান করে, আমার পুরানো জুতাটা মোড়কে পুরে বাড়ী ফিরি।*

* ফল মূল এবং অন্যান্য দ্রব্যের দোকানেও এইরূপ হাত সাফাইএর মারপাঁচ দেখা যায়। ভাল এক টুকরি আম দেখিয়ে পচা আমের টুকরি গছিয়ে দেওয়ারও দৃষ্টান্ত

এদেশে পর্দ্দা প্রথার সমধিক প্রচলন থাকায় অপরাধীরা বামাল পাচারের জন্যে প্রায়ই নারীদের সাহায্য নিয়ে থাকে। খানাতল্লাসীর (বাড়ীতল্লাসী) সময় আইনানুযায়ী মেয়েদের সসম্মানে এক কক্ষ হ'তে অপর এক কক্ষে সরে যাবার সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সুযোগে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বামীর নির্দ্দেশে দ্রব্যাদি বোরখা বা শাড়ীর ভিতর ক'রে পর্দ্দার অন্তরালে সরিয়ে নেয়। এইরূপ অবস্থার মধ্যে সন্দেহের কারণ ঘটলে অপর কোনও এক নারীর সাহায্যে এই সব মেয়েদের দেহতল্লাসী নেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত থাকায় ঐরূপভাবে দেহতল্লাসী নেবার মত কোনও স্থানীয় নারী অকুস্থলে পাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠে। এই সময় নারী-পুলিশের প্রয়োজন অত্যন্তরূপ উপলব্ধি হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক বোম্বাই শহর ব্যতীত ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা নেই।† আমি এমন অনেক অপরাধীকে জানি যে বোরখাবৃত আপন নারীর দ্বারা বামালাদি অন্যত্র প্রেরণ করত। বোরখার ভিতরে করে জেনানাটি দ্রব্যাদিসহ পথ চলত এবং সে নিজে চলত তার পিছন পিছন—এইরূপ অবস্থায় স্বামী স্ত্রী উভয়ই বামালসহ ধরা পড়ে যায়। পুরুষদের সাহায্যকল্পে কোনও কোনও নারী যৌন-দেশে নোটের বাণ্ডিল এবং কার্ত্তুজাদি লুকিয়ে রেখেছে, এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

বামাল গ্রাহকেরা কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্য্য কার্য্যে লিপ্ত থাকে না।

আছে। ডেলিভারি বা সম্প্রদানের সময়ই সুবিধামত আসল দ্রব্যের বদলে নকল দ্রব্য গছিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

† এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের সময়ের কিছু পূর্ব্বে কলিকাতায় নারী পুলিশবাহিনী সৃষ্ট করা হয়েছে।

এরা প্রায়ই বিত্তশালী এবং ক্ষমতাবান হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর গ্রাহকদেরও শহরে অভাব নেই। এরা চোরেদের সহিত পরিচিত থাকলেও কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্য্য কার্য্যে লিপ্ত হয় না। এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল—পাগলা হত্যার মামলা, কলিকাতা পুলিশ জার্নাল ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

"জ্যোৎস্নার আলোকে সাঁতারে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে উঠে দেখি খো-বাবু তার দল-বল সহ ঘাটের পাড়ে জটলা করছে। এই দলে নিহত পাগলাকেও আমি দেখতে পাই, এরা পাগলাকে মদ খাওয়াচ্ছিল। আমিও তাদের দলে যোগ দিই, কিছু চোরাই মাল পাবার আশায়। এর পর এরা পথ চলতে থাকে, আমিও কিছু দূর অগ্রসর হই। এর পর খো-বাবু বলে উঠেন, 'একে আমরা ট্যাপ করব।' আমি বুঝতে পারি চুরির উদ্দেশ্য নয়। ব্যাপার বেগতিক বুঝে এদের দল হতে আমি সরে পড়ি। আমি একজন চোরাই মালের গ্রাহক। খুন খারাপ বা চুরির মধ্যে আমি যাব কেন, ওসবে আমাদের বড় ভয়।"

স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় চোরেরা তাদের দ্রব্যাদি তাদের গ্রামেরই জোতদার প্রভৃতিকে বিক্রয় করে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই সকল সন্দেহাতীত গ্রাম্য মাতব্বরগণ গরুর গাড়ী করে তীর্থযাত্রী বা ব্যবসায়ীর বেশে এদের পিছু পিছু গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গমন করেছে, এবং চোর অভিযানে বহির্গত এই চোরেরা চুরি করে দ্রব্যাদি পশ্চাদাগত গোশকট আরোহীদের নিকট পাচার করে দিয়েছে।

অপরাধ—রেলওয়ের

রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাধ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। এই অপরাধের দ্বারা অপরাধীরা রেলওয়ে যাত্রীদের এবং রেলওয়ে কোম্পানীকে সমভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। এই সকল অপকর্ম্ম সম্বন্ধে এইবার একে একে আলোচনা করব। প্রথমে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের অপকর্ম্ম সম্বন্ধে বলা যাক। এই প্ল্যাটফর্ম্মে পিকপকেট চোর এবং ঠগীদের বিভিন্ন দল স্ব স্ব রীতি অনুযায়ী মানুষের দ্রব্য ও অর্থাদি অপহরণ করে। কুলি হারানো এদেশের একটি সচরাচর ব্যাপার। এ জন্যে যাত্রীদের অসাবধানতা এবং সাশ্রয় প্রীতিই বেশী দায়ী। সস্তার তিন অবস্থা—এ কথা জেনেও এঁরা সস্তায় পাওয়ার জন্যে বাহিরের কুলি নিযুক্ত করেন। রেল কোম্পানীর নিযুক্ত কুলি নিয়োগে বিরত হন, যদিও কিনা এর পারিশ্রমিকের তফাৎ সামান্যই থাকে। প্রায়ই শোনা যায়, অমুক যাত্রী কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে হাওড়ার পোলের উপর দিয়ে আসছিলেন, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে কুলি মহাশয় দ্রব্য সমেত উধাও হয়েছেন, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। প্রায়ই দেখা যায় এই সব ক্ষেত্রে যাত্রীরা রেল কোম্পানীর নম্বরী কুলি নিযুক্ত না করে বাহিরের কুলি নিযুক্ত করেছেন। এই সব কুলি ছাড়া, পিকপকেট, ঠগী এবং চোরেরাও প্ল্যাটফর্ম্মের উপর ভিড় জমায়। প্ল্যাটফর্ম্মের চুরির একটি বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে বলা হ'ল, বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন বৃদ্ধা মহিলা, প্ল্যাটফর্ম্মের ভিড়ে আমি টিকিট কিনতে পারছিলাম না। এমন সময় একজন ভদ্রলোক দয়া করে, উপযাচক হয়ে, আমার টিকিটখানা কিনে দিতে চাইলেন। আমি এ জন্য তাঁকে

ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁচটা টাকা দিই। ভদ্রলোক টাকা ক'টা গুণে নিয়ে সেই যে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন, আর ফিরলেন না।"

এই বিশেষ অপরাধীকে বিশ্বাসঘাতক না বলে চোর বলা হয়, কারণ এই ক্ষেত্রে টাকা কয়টি তার কাছে বৃদ্ধা গচ্ছিত রাখে নি, টাকা কয়টি তার হাতে বৃদ্ধা তুলে দিলেও উহা তার নিজ অধিকারভুক্তই ছিল, লোকটি ছিল এই অর্থের বহনকারী মাত্র।

রেলওয়ে যাত্রীদের ন্যায় রেলওয়ে কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যেও এই প্ল্যাটফর্ম্ম ব্যবহৃত হয়। এই সম্বন্ধে আমি জনৈক অপরাধীর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম।

"আমাদের ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জনেই বিনা টিকিটে ভ্রমণ করছিলাম। একজন মাত্র টিকিট ক্রয় করেছিলাম। আমাদের একজন প্রথমে ঐ একখানা টিকিটের সাহায্যে বাহিরে আসে, এর পর সেই ব্যক্তি বাকি পাঁচ জনের জন্যে পাঁচখানি প্লাটফর্ম্মের টিকিট কিনে পুনরায় ভিতরে ঢুকে, আমরা তখন সকলেই ঐ টিকিটের সাহায্যে বাহিরে আসি। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে আমরা, আমাদের মধ্যে যার কাছে একখানি টিকিট আছে, তাকেই সব কয়টি টিকিট দেখাতে বলি। সে তখন তার হাতের টিকিটটা বার করে দিয়ে বলে উঠে, "বারে বা, আমি তো একখানি টিকিটই কিনেছি, বাকি টাকাতো আমার কাছেই রয়েছে। আমরা তখন ভীষণ ভাবে তার এই বোকামি ও ভুলের জন্য তাকে ধমকাতে সুরু করি। টিকিট চেকার আমাদের এই সকল কথা বিশ্বাস করে এবং যে ষ্টেশন থেকে ঐ একখানা টিকিট কেনা হয়েছিল, ঐ ষ্টেশন থেকেই ভাড়া চার্জ্জ করে চেকার ভদ্রলোক আমাদের রেহাই দেন। আরও পিছনের কোনও ষ্টেশন থেকে আমাদের এ জন্য ভাড়া বাবদ অধিক মূল্য প্রদান করতে হয় না। প্রায়শঃ আমরা আমাদের

একজন বাদে বাকি সকলে বিনা টিকিটে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করি—অবশিষ্ট ব্যক্তিটি আমাদের চাপরাশী বা চাকর সেজে তৃতীয় শ্রেণীতে—তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট সহ উঠে বসে। ধরা পড়ার পর আমরা ঐ তথাকথিত চাপরাশীকে আমাদের টিকিট দিতে বলি এবং টিকিট না কেনার জন্যে তাকে ধমকা-ধমকিও করি। ঐ ব্যক্তি তখন টিকিট কিনতে না পারার জন্যে নানা অজুহাত দেখায় এবং আমাদের পাঁচ জনের দরুণ টিকিট ক্রয়ের জন্যে যে প্রয়োজনীয় টাকা আমরা তাকে দিয়েছিলাম তার প্রমাণস্বরূপ টাকা কয়টা টিকিট চেকারের সম্মুখেই সে আমাদের ফেরত দেয়, চেকার ভদ্রলোক তখন আমাদের কথাতে বিশ্বাস করে এবং তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটে পরিদৃষ্ট ষ্টেশন হতেই তিনি আমাদের ভাড়া চার্জ্জ করেন। তবে এই ভাবে আমরা ক্বচিৎ কদাচিৎ ধরা পড়ে থাকি, অর্থাৎ কি'না প্রায়ই ধরা পড়ি না। রাত্রি কালে সদাসর্ব্বদাই আমরা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করে থাকি। এই সময় সারা রাত্রি আমরা ভিতর হতে ছিট্‌কানি লাগিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে রাখি, যাতে করে টিকিট চেকাররা গাড়ীতে উঠতে না পারে। কখনও কখনও কোনও জংসন ষ্টেশনে এসে ষ্টেশন কর্ম্মচারিদের আমরা জানাই, 'আমরা প্রিন্স্‌ অব্‌ অমুক এবং তাঁর পার্টি।' এবং বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করি, 'হাওড়া থেকে কি টেলিগ্রাম পান নি? আমাদের জন্যে কোন্ কামরা রিজার্ভ হয়েছে দেখিয়ে দিন এক্ষুণি।' আমাদের পোষাক, মুখের চুরোট, এবং কথা বলার ভঙ্গি দেখে ষ্টেশন ষ্টাফের সকলে ভড়কে যায় এবং ত্রুটি স্বীকার করে তৎক্ষণাৎ প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় রিজার্ভ কার্ড লাগিয়ে দেয়—'প্রিন্স্‌ অব্‌ অমুক এণ্ড পার্টি', এই কথা তাতে লিখে। আমাদের কাছে একেবারে যে কোনও শ্রেণীরই টিকিট নেই, এই কথা কারুও মনে স্থানও পায় না। এর পর হতে রিজার্ভ

কার্ডের লেখা দেখে, কোনও টিকিট চেকার আর আমাদের বিরক্ত করে না, আমরা অতি সহজেই গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত পৌছতে পারি।"

বিনা টিকিটে ভ্রমণ রেলওয়ের একটি সাধারণ অপরাধ। এমন অনেক লোক আছেন যিনি নিজে টিকিট কিনলেও তাঁর সঙ্গের জেনানা যাত্রীদের জন্তে টিকিট কিনেন না। তাঁর শিক্ষা মত মেয়েরা চেকারদের প্রশ্নের উত্তরে জানান—'পুরুষদের গাড়ীতে টিকিট আঁছে,' ঘোমটার অন্তরাল হতে। এদিকে সারা গাড়ী খুঁজেও চেকার ভদ্রলোক ঐ তথা-কথিত পুরুষটিকে খুঁজে বার করতে পারেন না। এদিকে তাঁর কর্ত্তব্যের গন্তব্য স্থানও এসে যায়, টিকিট কলেক্টারটিও ঝঞ্চাট না করে নেমে পড়েন। এ ছাড়া কোনও কোনও রেলওয়ে কর্ম্মচারী পাশ পেয়ে থাকেন। এই পাশে তিনি, তাঁর স্ত্রী ও নাবালক পুত্রেরা মাত্র ভ্রমণ করার অধিকারী। কিন্তু এ সত্ত্বেও এঁদের কেহ কেহ বাহিরের মেয়েদের নিয়ে—তাঁদেরই সাজান স্ত্রী পুত্র বলে চালিয়ে ঐ পাশে ভ্রমণ করে থাকেন। কোনও এক রেল কর্ম্মচারী ঐরূপ ভাবে তাঁর এক শ্যালিকাকে আপন স্ত্রী সাজিয়ে ভ্রমণ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মহিলাটি ভদ্র-লোককে "জামাইবাবু" বলে সম্বোধন করায় কোনও এক টিকিট চেকার তাঁদের ধরে ফেলেছিলেন। এই সব ক্ষেত্রে সঙ্গের ছোট ছোট বালকদের "পাশওয়ালা ভদ্রলোকটি" তাঁদের কে, এই কথা জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথা প্রায়ই প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। বিনা টিকিটে ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"অমুক আমার সঙ্গে মাত্র তৃতীয় মান পর্য্যন্ত পড়েছিল। তার পর সে স্কুল ছেড়ে পালিয়ে যায়। বহুদিন পরে হঠাৎ একদিন ট্রেণের এক কামরায় তার সঙ্গে আমার দেখা হল। চোস্ত বিলাতী স্যুট পরে সে চুরুট টানছিল, ফার্ষ্ট ক্লাসে বসে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম, সে

এখনও চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরছে, এমন কি সে টিকিটও কিনে নি। ঠিক এই সময় এক টিকিট চেকারও এসে হাজির। টিকিট চাওয়া মাত্র বন্ধুবর ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাউ লঙ ইউ আর হিয়ার, ইয়া।' তার এই চোস্ত ইংরাজী শুনে ও তার জিজ্ঞাসা করবার ভঙ্গিমায় ভড়কে গিয়ে আমতা আমতা করে চেকার ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে আজ্ঞে স্যার, আমি এই তিন মাস এখানে আছি।' বন্ধুবর বিরক্তির সহিত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, 'ইট ইজ এ উইক আই অ্যাম হিয়ার, এণ্ড ইউ ডোণ্ট নো ইয়োর ওন অফিসার', অর্থাৎ কি'না আমি এক সপ্তাহ হবে এখানে এসেছি (বদলি হয়ে) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নিজেদের অফিসারদেরও চেন না। বলাবাহুল্য, এরপর চেকার ভদ্রলোক অত্যন্তরূপ ভড়কে গিয়ে, 'ইয়েস স্যার, নো স্যার, সরিই স্যার' ইত্যাদি উক্তি করে ও ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছিল। আমি বন্ধুবরের সাহস দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধুবর হেসে ফেলে বলেছিলেন, বেটা মনে করেছে আমি ওদের নিউলি ট্রানস্ফারড কোনও ডি-টি-এস্ বা ঐ রকম একটা কিছু হ'ব আর কি, হে হে হে—"

এমন অনেক ভদ্র ব্যক্তিও আছেন যাঁরা প্রায়ই বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে থাকেন। এঁদের কেহ কেহ কম দূরের একটা টিকিট কিনে বেশী দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেও থাকেন, দৈবক্রমে ধরা পড়লে 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিংবা মত পরিবর্ত্তন করে আরও দূরে যেতে হচ্ছে' বলে, কিংবা 'এ্যাঁ, ঐ ষ্টেশন ছেড়ে এসেছি', এই বলে আঁৎকে উঠে বা বোকা বা বুড়বাক সেজে বা ঐরূপ আর কোনওরূপ একটা বাহানা দ্বারা এঁরা মান বা ইজ্জত রক্ষা করে থাকেন। সঙ্গে অবশ্য এঁরা সব সময়ই প্রয়োজনীয় অর্থাদি মজুত রেখে থাকেন, কারণ এঁরা ভালরূপেই বুঝেন যে প্রয়োজনীয়

টাকা টিকিট বাবদ প্রদান করলেই তাঁদের আর কোনও বিপদ নেই, রেলওয়ের কানুন অনুসারে।

এই বিনা টিকিটে ভ্রমণরূপ অপরাধের অপর আর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হ'ল, বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমরা সেবার এক অভিনব পদ্ধতিতে বিনা টিকিটে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা জন পাঁচেক লোক খাঁকি পোষাক পরে শান্ত্রী সাজি এবং আমাদের দলের ষষ্ঠ ব্যক্তিকে পলাতক সিপাই সাজিয়ে তার কোমরে দড়ি বেঁধে নিজেদের হেপাজতে রাখি—এমন ভাব দেখিয়ে যেন আমাদের পাহারাধীনে তাকে লাহোর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে চেকার মশাইও এসে টিকিট চাইতে থাকেন। আমাদের মধ্যে যে হাবিলদার সেজেছে সে গম্ভীর ভাবে বলে উঠে—'টিকিট কর্ণেল সাহেবকো পাশ হ্যায়, দেখিয়ে না উধার।' চেকার সাহেব অবশ্য খেঁকরে উঠে হুকুম জানান, 'উ হাম নেহি জানতা, লে আইয়ে টিকিট, মাঙকে।' উত্তরে আমরা জানিয়ে দিই, 'কেইসেন! হুকুম নেহি হ্যায়। আসামী ভাগে গা, তব?' এর পর আর কথা চলে না, চেকার মশাই কিছুক্ষণ কর্ণেল সাহেবের খোঁজ করেন এবং তার পর গন্তব্য স্থানে এসে পড়ায় গাড়ী থেকে নেমে যান'।" *

---

* ট্রাম এবং বাসেও অনেকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে থাকেন। কণ্ডাক্টার নিকটে এলে আমরা অনেককেই জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসতে দেখেছি। আজকালকার ভিড়ের দিনে পাদানির নিকট জটলা করেও অনেকে টিকিট কেনার দায় হতে এড়িয়ে যান; ভিন্ দেশীয় ছাত্ররা এক অভিনব উপায়ে ট্রাম কোম্পানিকে ঠকিয়ে থাকেন, অবশ্য তা তাঁরা খেলাচ্ছলেই করে থাকেন। এঁরা দল বেঁধে ধর্ম্মতলাগামী এক ট্রামে উঠে কালিঘাটের টিকিট চান—যেন পথ ঘাট সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই ওয়াকিবহাল নন্। নবাগত বিধায় এইসব জ্ঞান-পাপীদের সকলে বুঝিয়ে দিয়ে বলে—'আরে এ কোথা কিরা? এক একদম

এ ছাড়া চোর-ডাকাতরাও ট্রেণে ভ্রমণকালে কখনও টিকিট কেনে না। এরা বিনা টিকিটেই ঘুরাফেরা করে এবং সুবিধামত লোক ঠকায় বা চুরি করে। রেলওয়েতে সংঘটিত প্রবঞ্চনা পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল। বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"হঠাৎ লাহোরের ষ্টেশনে নেমে আমার সহযাত্রীটি ভীষণভাবে চীৎকার সুরু করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে করে আনা দুইটা বাক্সই না'কি চুরি হয়ে গেছে, তাঁকে একবারে কপর্দ্দকহীন করে। আমি দয়া পরবশ হয়ে তাঁকে আমার বাড়ী নিয়ে যাই এবং কিছু অর্থ সাহায্যও করতে চাই, কিন্তু তিনি কোনও অর্থাদি গ্রহণে অস্বীকৃত হন। এর পর তিনি স্বগৃহে (তার পিতার নিকট) একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেন, টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার জন্যে। আমার ছোট ছেলেই টেলিগ্রামটা পোষ্ট অফিসে গিয়ে 'তার' করে আসে, ভদ্রলোকের অনুরোধ মত। পরের দিন পাঁচ শত টাকা আমার ঠিকানায় ভদ্রলোকের পিতাঠাকুর টেলিগ্রাফিক মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেন। এর পর আমাকে সাক্ষী করে পোষ্টাল পিওন টাকাগুলা তাঁকে গুণে দেয়। ভদ্রলোক এই উপকারটুকুর জন্যে আমাকে তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং যথাসত্বর লাহোর ত্যাগ করে চলে

উল্টা হো যাতা।' 'এর পর অপ্রস্তুততার ভাব দেখিয়ে এরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ে ঐ ভাবেই পশ্চাদগামী এক ট্রামে চড়ে বসেন—এইরূপে দুই বা তিনটি ট্রামে চড়ে তাঁরা তাঁদের গন্তব্য স্থান ধর্ম্মতলাতেই এসে হাজির হন, বিনা ব্যয়েই। কখনও কখনও দুই ব্যক্তি বাসে উঠে একজন চার পয়সার টিকিট এবং অপর জন ছয় পয়সার টিকিট কিনেন। এর পর প্রথম ব্যক্তিটি চার পয়সার টিকিটটি দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে দিয়ে গন্তব্য স্থানে নেমে পড়েন—দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন এই দুইখানি টিকিটের সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত আসতে সক্ষম হন। মাত্র দুই পয়সা (দশ পয়সার টিকিটে) বাঁচাবার জন্যে এইরূপ শঠতার আশ্রয় দেওয়া অতীব লজ্জাকর বিষয়।

যান। এই ঘটনার এক মাস বা দেড় মাস পরে আমার বাড়ীতে স্থানীয় পুলিস তদন্তে আসে। আসলে ঐ লোকটা ছিল না'কি একজন ঠগী; ট্রেণে ভ্রমণকালে এক ধনী সহযাত্রীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। লাহোরে এসে সেই লোকটির নামেই তার পিতাকে সাহায্যের জন্যে সে 'তার' করেছিল, নিজের ঐ সব কল্পিত দুরবস্থার কথা লিখে। যুবকটি বাড়ী ফিরে সকল সমাচার অবগত হয়ে পুলিশে খবর দেয়—পুলিশ এই তদন্ত করবার জন্যে আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করেছেন।"

এই ভাবে ঠগীরা সহযাত্রীদের সহিত আলাপ করে প্রথমে তাঁর হাঁড়ির খবর জেনে নেয় এবং তারপর ঐ ভাবে টেলিগ্রাম করে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ঠকিয়ে থাকে। এই সব ঠগীদের একজন সনাক্ত না করলে পোষ্টাল অথোরিটি তাদের অধিক মুদ্রা প্রদান করতে প্রায়ই অসম্মত হয়—এ সম্বন্ধে দেরী হলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে, এই জন্যে এরা ছলনা দ্বারা শহরের একজন পদস্থ ব্যক্তির সহিত আলাপ করে নেয়, তাদের সনাক্ত করবার জন্যে। এ ছাড়া ঐরূপ এক পদস্থ ব্যক্তির ঠিকানায় অর্থ প্রেরকরাও নিঃসন্দেহে টাকা পাঠিয়ে থাকে। বড় ব্যবসায়ীদের এজেণ্টগণ কার্য্য ব্যপদেশে এক শহর হতে অপর আর এক শহরে প্রায়ই যাতায়াত করেন। এই সব এজেণ্টদের সহিত ট্রেণের কামরায় আলাপ করে ঠগীরা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে নিয়ে এদের হেড অফিসে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরূপ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছে—এইরূপ কাহিনীও প্রায়ই শুনা যায়।

এইবার রেলওয়ের চুরির পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। কেপমারী নামক ভ্রাম্যমাণ দুর্ব্বৃত্তেরা এই সব চোরেদের মধ্যে অন্যতম স্থান অধিকার করে। এই সব দুর্ব্বৃত্তেরা অনেকগুলি ভাষা জেনে [illegible] এবং অত্যন্ত [illegible] ভদ্রভাবে যাত্রীদের সহিত আলাপ জমায়। রাত্রি হলে

এরা অমায়িকতার সহিত শয়নের জন্তে তাদের বসবার সিটটি সহযাত্রীদের ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নিম্নে—ভূমিতলে বিছানা করে শুয়ে পড়ে, অনেক সময় চাদর মুড়ি দিয়ে। এর পর সুযোগ মত তারা চাদরের একাংশ দিয়ে তাদের দেহের সহিত যাত্রীদের বাক্স প্যাঁটরাগুলিকেও ঢেকে দেয়। এর পর চাদরের অন্তরালে এরা অতি সহজেই বেঞ্চির তলায় রাখা বাক্সগুলি ভেঙে ফেলতে (বা খুলতে) পারে। এই ভাবে বাক্সগুলি হ'তে দ্রব্যাদি বার করে নিয়ে, ঐ চাদর দিয়েই সেগুলি জড়িয়ে নিয়ে এরা উঠে পড়ে, এবং পরের ষ্টেপেজেই জল সংগ্রহের জন্তে বা অন্ত কোনও অছিলায় নেমে পড়ে অন্ত কামরায় এসে দ্রব্যাদি তার অন্তান্ত সহকর্মীদের কাছে রেখে এসে পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসে।* এইরূপ একটি বিশিষ্ট ভদ্রযাত্রীকে এই চুরির জন্তে কেহ সন্দেহও করে না।

রেলওয়ে টিকিট ফ্রড্ (জাল) রেলওয়ে অপরাধের এক অন্ততম পদ্ধতি। রেলওয়ে টিকিট জাল করার কথাও শুনা গেছে, কিন্তু সরাসরি জাল না করেও অপর আর এক সহজ উপায়েও জাল টিকিট তৈরী করা যায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীরা একটি দূরের বা লঙ্ জার্ণির পুরানো ও ব্যবহৃত টিকিট জোগাড় করে। নিয়মমত এই সব টিকিটের পিছন দিকেই তারিখ দেওয়া হয়। এর পর অপরাধীরা সেই দিনের তারিখ দেওয়া অল্প দূরের বা সর্টজার্ণির একটি টিকিট ক্রয় করে। এইবার অপরাধীটি উভয় টিকিটই কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে উভয় টিকিটেরই পিছন দিককার তারিখ দেওয়া কাগজ দুইটি উঠিয়ে নেয়। এর পর তারা নূতন টিকিটের তারিখ দেওয়া কাগজটি পুরানো টিকিটের পিছনে

---

* এক্ষেত্রে কেহ কেহ শক্ত আটা বা লেই দিয়ে ছোটখাটো দ্রব্যাদি বেঞ্চির নীচের কাষ্ঠ খণ্ডে এঁটে দিয়ে থাকে, যাতে করে বার হতে ঐগুলো কেহ খুঁজে না পায়

সাবধানে লাগিয়ে দেয় এবং এই ভাবে এরা অতি সহজে দূর যাত্রার একটি জাল টিকিট তৈরী করে ফেলে।

উপরি উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতিতেও জাল টিকিট তৈরী করা যায়। এমন অনেক ষ্টেশন আছে, যেখানে ছাপা টিকিট তো থাকেই না (দূর যাত্রার টিকিট) এমন কি ব্লাঙ্ক টিকিটও সেখানে নেই। এই বিশেষ ক্ষেত্রে "N. B. C." লেখা রিশিটের কাগজে যাত্রীর সংখ্যা ও গন্তব্য স্থানের কথা পেন্সিলে লিখে টিকিট বানান হয়। অপর দিকে কোনও যাত্রী যদি গন্তব্য স্থান ছাড়িয়ে আরও বহুদূর গিয়ে পড়ে তো তার কাছে বাড়তি ভাড়া (excess fare) ও জরিমানা (penalty) বাবদ অর্থ আদায় করে চেকাররা অনুরূপ একটি রিশিটেই পেন্সিল দিয়ে যাত্রীর সংখ্যা ও গন্তব্য স্থানের কথা লিখে দেন। তবে শেষোক্ত রিশিটে N. B. C. (No Blank Card) লেখা থাকে না, ঐ স্থলে লেখা থাকে "Over riding"। ঠগী দুর্ব্বৃত্তরা এইরূপ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে রেল কোম্পানীকে প্রায় ঠকিয়ে থাকে। এরা মাত্র এক ষ্টেশনের জন্যে টিকিট কিনে দুই তিন ষ্টেশন ইচ্ছা করেই এগিয়ে যায় এবং তারপর টিকিট চেকারকে নিজেই ডেকে এনে বাড়তি ভাড়া দিয়ে ঐরূপ একটি "Over ride" লেখা রিশিট সংগ্রহ করে এবং পরে ঐ রিশিটের উপর হতে Over ride কথাটা উঠিয়ে ঐ স্থলে লিখে নেয় "N. B. C." এর পর তারা পেন্সিলে লেখা গন্তব্য স্থল ও যাত্রীর সংখ্যাও পরিবর্ত্তন করে নিয়ে দূরের যাত্রার জন্যে একটি জাল টিকিট বানিয়ে নিয়ে থাকে। এই ভাবে জাল টিকিট দুর্ব্বৃত্তেরা তৈরী তো করেই, এ ছাড়া এরা জাল রেলওয়ে ওয়ারেণ্টও তৈরী করে থাকে। সরকারী কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ এই সব ওয়ারেণ্ট ব্যবহার করে থাকে। ব্যবস্থামত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সহিযুক্ত এই ওয়ারেণ্ট টিকিট ঘরে দিবা মাত্র প্রয়োজনীয় টিকিট পাওয়া যায়।

রেলওয়ে কোম্পানি পরে এই সব ওয়ারেণ্ট সরকার বাহাদুরের হিসাব নিকাশ অফিসে পাঠিয়ে তাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করে নেয়। দুর্বৃত্তগণ এই সকল রেলওয়ে ওয়ারেণ্ট চুরি করে বা জাল করে এই সব ওয়ারেণ্টের উপর বিভাগীয় অফিসারদের সহিও জাল করে উহার সাহায্যে টিকিট ক্রয় করে ঐ টিকিট ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিক্রয় করে থাকে।

কোনও কোনও রেলওয়ের দুর্বৃত্ত জাল টিকিট কলেক্টারও সেজে থাকে। এরা একটা সাদা বা কাল কোর্ট পরিধান করে, যার সঙ্গে কি'না কয়েকটা চকচকে পিতলের বোতাম লাগানো আছে। এইরূপ পোষাকের দ্বারা যাত্রীদের বিভ্রান্ত করে তাদের নিকট হতে পরীক্ষার ছলে টিকিটগুলি চেয়ে নেয়। এদের কেহ কেহ এই ভাবে টিকিট সংগ্রহ করে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। এদের উদ্দেশ্য থাকে বিনা পয়সায় টিকিট সংগ্রহ করে নিজেদের যাত্রাপথের বিঘ্ন দূর করা। কথনও কথনও এরা হাতসাফাইএর সাহায্যে অধিক মূল্যের টিকিটটি সরিয়ে ফেলে যাত্রীকে একটি কম মূল্যের টিকিট ফিরিয়ে দেয় এবং এর পর ভয় দেখিয়ে তার কাছে বাড়তি ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় করে রিশিট না দিয়েই সরে পড়ে। এদের কেহ কেহ যাত্রীদের টিকিট কিনে দিবার অছিলায় অধিক মূল্য নিয়ে একটি কম মূল্যের টিকিট যাত্রীটিকে কিনে দিয়ে বেমালুম সরে পড়েছে। এই সকল যাত্রীদের অনেকেই কম মূল্যের টিকিটটাই বেশী মূল্যের টিকিট মনে করে নিঃসন্দেহে রেলে উঠে চেকার-দের হস্তে অপদস্থ হয়, বিপদগ্রস্তও।* এই জাল টিকিট, চুরি, প্রবঞ্চনা

* রেল এবং ট্রাম কোম্পানীও পাশ বা মানথলি টিকিট ইস্যুও করে থাকে। এমন অনেক পরিবার আছে, যে বাড়ীর ছেলেদের নাম যথাক্রমে, জ্যোৎস্না, যামিনী, জ্যোতির্ম্ময়, যোগেন ইত্যাদি; এদের একজন একখানি মাত্র মানথলি টিকিট ক্রয় করে, উহাতে লিখিয়ে

আদি অপরাধ ছাড়া ডাকাতি এবং খুনও রেলওয়ে ভ্রমণকালে হয়ে থাকে, তবে এই সকল অপরাধ যাকে সাধারণ ভাষায় "মেইল রবারি" আদি বলা হয় তা খুব কমই ঘটে থাকে। রেলওয়ে ডাকাতির য়ুরোপীয় পদ্ধতিটি হয় এইরূপ: কোনও এক নির্জ্জন স্থান বা জঙ্গল বেছে নিয়ে ডাকাত দলের অধিকাংশ লোক ওত্ পেতে বসে থাকে। দলের কয়েকজন লোক রেলওয়ের ঐ ট্রেণটিতে উঠে বসে এবং ট্রেণটি ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসা মাত্র শিকল টেনে ট্রেণটি থামিয়ে দেয়। ট্রেণটি থামিবা মাত্র ডাকাতের মূল দলটি ট্রেণে উঠে ড্রাইভার, গার্ড ও যাত্রিদের মারধোর করে মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পলায়ন করে থাকে। এমন অনেক রেলওয়ে অপরাধীও আছে যারা কি'না ট্রেণের ছাদে উঠে বসে থাকে! এমন কি কেহ কেহ নিম্নের ব্যাটারী আঁকড়েও শুয়ে থাকে এবং সুবিধামত বেরিয়ে এসে কামরায় ঢুকে চুরি করে থাকে। এ ছাড়া রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্টে খুন ও রাহাজানির কথাও শুনা গেছে। এ ছাড়া এমন অনেক রেলওয়ে অপরাধ আছে যে সকল অপরাধের জন্ত অপরাধীর সাজা হয় না, সাজা হয় অপরাধীদের পিতামাতার বা অভিভাবকদের। এই সকলই অপরাধ কেবল মাত্র অপরিণত বয়স্ক বালকদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। রেলওয়ে আইনানুসারে বালকগণ যদি রেলগাড়ী লক্ষ্য করে

নের মাত্র "J. Banerjee"। উপরি উক্ত সকল নামের আদি অক্ষররূপে ইংরাজী "J" অক্ষরটি প্রযোজ্য। এছাড়া বাড়ীর সকল ভ্রাতাই ব্যানার্জ্জি। এই একখানি মাত্র টিকিটের সাহায্যে বাড়ীর সকল ভ্রাতাই ট্রামে ভ্রমণ করে থাকেন—ইহাকে একপ্রকার অপরাধ বলা চলে। একজনের নামের টিকিট অপরজন ব্যবহার করলে কানুন মতে উহাকে অপরাধ বলা হবে। এ'ছাড়া নাম ভাড়িয়ে একের মানথ্লি টিকিট অপর একব্যক্তি কর্তৃকও ব্যবহৃত হয়েছে।

ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করে তা হলে এ জন্যে বালকদের অভিভাবকদের সাজা পেতে হয়। যেহেতু নিতান্ত বালককৃত অপরাধ, অপরাধের মধ্যে আইনমত ধরা হয় না, সেই হেতু এই বিশেষ অপরাধের নিবারণের জন্যে একমাত্র অভিভাবকদেরই দায়ী করা হয়ে থাকে। যাত্রীদের রক্ষার জন্যেই এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে।

রেলওয়েতে এক প্রকার প্রবঞ্চনা অপরাধের কথাও প্রায় শুনা যায়। এক স্থান হ'তে অপর আর একস্থানে মাল পাঠালে রেলওয়ে কোম্পানী এ জন্যে একটা রিশিট দেয়। এই রিশিটে দ্রব্যের নাম, ওজন এবং মূল্য আদি লিখে দেওয়া হয়। গন্তব্য স্থানে দ্রব্য পৌঁছনোর পর এই রিশিট দেখালে ঐ মাল ছেড়ে দেওয়া হয়। দুর্বৃত্তরা প্রায়ই এই রিশিটের উল্লিখিত দ্রব্যের স্বরূপ, উহার আসল পরিমাণ ও মূল্যাদির সংখ্যাগুলি উঠিয়ে ফেলে সেই স্থলে ইচ্ছামত বহুল বর্দ্ধিত পরিমাণ ও মূল্যাদির সংখ্যা লিখে নেয়। এরপর দুর্বৃত্তরা সরল চিত্ত ব্যবসায়ীদের নামে এই রিশিট খারিজ করে দিয়ে বহু গুণ অর্থ আদায় করে এবং প্রবঞ্চিত ব্যবসায়ীটি ঐ রিশিটের সাহায্যে দ্রব্যাদি ডেলিভারি নেবার পূর্ব্বেই বেমালুম সরে পড়ে থাকে।

এ ছাড়া এই রেলওয়েতে এমন অনেক গৃহস্থ চোরও যাতায়াত করেন, যিনি কি'না আপন লগেজাদির সহিত অপর যাত্রীদেরও দুই একটা লগেজ নামিয়ে নিয়ে থাকেন। হঠাৎ ধরা পড়া গেলে ত্রুটি স্বীকার করলেই আসল বিষয়টি চাপা পড়ে যায়, এই জন্যে এরা ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ কমই হয়ে থাকেন। রেলওয়ে হ'তে ছেলে চুরি, মেয়ে চুরিরও নজীর আছে। এমন কি বউ চুরিরও। এই সম্বন্ধে একটি হাস্যোদ্দীপক বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"আমার বৌকে নিয়ে দেশে আসছিলাম। ফিমেল কম্পার্টমে

বড় বড় ঘোমটা দেওয়া আর কয়েকজন বধূ বসেছিলেন। গন্তব্য স্থানে ট্রেণটি পৌছবামাত্র, আমি মেয়েদের কামরার সামনে এসে দাঁড়াই। মাত্র এক মিনিট ট্রেণটি ঐ ষ্টেশনটায় দাঁড়িয়ে থাকে। এই জন্তে আমি অত্যন্তরূপ ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠি—'ওগো নেমে এসো, ওগো শীঘ্র নামো।' আমার চেঁচামেচি শুনে আমার আপন স্ত্রী তো নেমে এলেনই, এমন কি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও জন দুই তিন বধূ নেমে পড়লেন। ঘোমটার ভিতর থেকে দেখলেনও না, কে বা কারা তাঁদের ডাকছে। অর্থাৎ কি'না যাঁদের যাঁদের সঙ্গে ঐ ট্রেণে (ভিন্ন কামরায়) ওগো * আসছিলেন, তাঁরা সকলেই নেমে এলেন, আসলেন না শুধু যাঁদের সঙ্গে দাদা, কাকা বা বাবা আছেন।"

ঘটনাটি অবশ্য শুনা কথা, এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহেরও কারণ আছে, তবে এই পর্দ্দাবহুল হিন্দুস্থানে ঐরূপ হওয়া অসম্ভবও নয়। লগেজের উপর ঘোমটাবৃত বধূ বসে আছে, তাড়াহুড়ার মাথায় কোনও কুলির পক্ষে লগেজের সহিত বধূটিকেও লগেজ মনে করে কামরার মধ্যে (প্ল্যাটফর্ম্ম হতে) ছুড়ে ফেলে দেওয়ারও গল্প শুনেছি। হয় তো এই গল্পটিও সত্য নয়, কিন্তু অত্যধিক পরদা প্রথা ও অজ্ঞতার সুযোগই দুর্ব্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে এ কথা অতীব সত্য। এ দেশের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা এখনও এত বেশী যে মেয়েদের গাড়ীতে শুধু "জেনানা" বাংলা, হিন্দি বা ইংরাজীতে লিখে দিলেই হয় না, ঐ লেখার সঙ্গে সঙ্গে একজন জেনানার ছবিও এঁকে দিতে হয় এই দুয়ারের উপর। পুরুষ হয়ে মেয়েদের গাড়ীতে উঠে বসাও একটি অপরাধ, এরূপ অপরাধও

* এদেশের গ্রাম্য মেয়েরা স্বামীকে এবং স্বামীরা স্ত্রীকে "ওগো" সম্বোধন করে ডেকে

রেলওয়েতে হামেসা সংঘটিত হ'তে দেখা যায়। ইহা প্রায় জনসাধারণের নিরক্ষতার কারণেই হয়ে থাকে। অসাবধানতার সহিত ইঞ্জিন চালানো বা ভুল সিগন্যাল দেওয়া এবং তৎজনিত কলিশন দ্বারা বহু লোকের জীবন-নাশের কারণ হওয়া রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাধসমূহের মধ্যে এক অন্যতম অপরাধ; এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

কোনও কোনও রেল ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরাও বহুবিধ অপকর্ম্ম করে থাকে। বে-আইনী দ্রব্য পাচারের জন্য ঘুষ গ্রহণ এবং স্বয়ংকৃত পার্শেল প্রভৃতি চুরির কথা বাদ দিলেও এদের কারুর কারুর সাহায্যে মালগাড়ী পার্শেল ট্রেন প্রভৃতি ভেঙ্গে দ্রব্যাদি অপহরণও করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে ড্রাইভারগণ এমন এক নিরালা স্থানে মাল বা যাত্রী গাড়ী থামিয়ে দিয়েছে কিংবা উহার গতি মন্থর করেছে, যেখানে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত দলবদ্ধ দুর্দ্দান্ত স্মাগলারগণ উপস্থিত থাকে। এই সুযোগে দুর্ব্বৃত্তগণ গাড়ীতে উঠে তা ভেঙে দ্রব্যাদি এবং বিবিধ ফিটিঙ্‌ অপহরণ করে। পরিবর্ত্তে তারা অসাধু ড্রাইভার ও গার্ডদের প্রতিশ্রুত মত হিস্যা প্রদান করে। আস্কারা পেয়ে কয়েক ক্ষেত্রে স্মাগলার বা রেলপথের পাশে নিজেদের কলিশন পর্য্যন্ত করেছে। এ'ছাড়া বহুক্ষেত্রে ইঞ্জিন ড্রাইভারগণ সুবিধা-জনক স্থানে কয়লাও স্মাগলারদের নিকট নিক্ষেপ করে থাকে।

এই রেলওয়ে অপকর্ম্ম সম্বন্ধে নিম্নে একজন অসাধু রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি ঐ সময় অমুক রেল ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলাম। যে সকল শহরবাসী (ছোট শহর) আমাদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করতে পারে বলে আমরা মনে করতাম তাদের কর্ম্মচারীদের ঐ ষ্টেশনে নামতে দেখলে ছুতায়-নাতায় তার নাম জেনে তার অজ্ঞাতে তাদের নামে আমরা মালপত্রের ওভার চার্জ কিংবা বিনা ভাড়ায় আসার জন্য, প্রভৃ

দেখিয়ে মিথ্যা করে রিসিট্ কেটে রাখতাম। ঐ জন্য কোম্পানীকে দেয় অর্থ অবশ্য তাদের অজ্ঞাতে আমরাই জমা দিয়েছি। এর পর ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের নামে দরখাস্ত করলে আমরা রেকড্ হতে প্রমাণ করতাম যে এই ভাবে তাদের কর্ম্মচারীদের রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে না দেওয়ার জন্য আক্রোশ-জনিত তারা আমাদের নামে মিথ্যা দরখাস্ত করেছে।

এ ছাড়া প্যাসেঞ্জারদের নিকট টিকিট না পেলে ঐ টিকিটের অর্দ্ধেক মূল্য গ্রহণ করে রসিদ না কেটে তা আত্মসাৎও কোনও কোনও টিকিট কালেক্‌টার করে থাকে। শহরের নিকটস্থ ষ্টেশনের যাত্রীরা কেহ কেহ গন্তব্যস্থানে এসে টিকিটটি কলেক্ট না করিয়ে—ঐ দিনেই পূর্ব্ব ষ্টেশনে এসে ঐখানকার টিকিট-বিক্রেতাকে অর্দ্ধেক মূল্যের বিনিময়ে তা ফিরিয়ে দিয়েছে, এবং ঐ টিকিট-বিক্রেতা উহা অন্য এক যাত্রীকে পুরা মূল্যে বিক্রয় করে লাভবান হয়েছেন। যাত্রীবহুল রেলপথে একই অভিপ্রায়ে এইরূপ অপরাধ করা সম্ভব।

তবে এদেশে রেল-কর্ম্মচারীদের মাত্র দু'একজন ছাড়া বাকি সকলেই সৎ ও সাধু ব্যক্তি।

অপরাধ—ব্যবসা সংক্রান্ত

ব্যবসায় সংক্রান্ত অপরাধ দুই প্রকারের হয়ে থাকে ; প্রথম ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের ঠকিয়ে থাকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রেতারা ব্যবসায়ীদের ঠকায়। একজন ব্যবসায়ী অপর আর একজন ব্যবসায়ীকে ঠকিয়েছে এইরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এমন অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা কম ওজনের নকল বা জাল বাটখারার সাহায্যে কেনা-বেচা করেন।

কেহ কেহ আসল বাটখারাগুলি হ'তে আরও কিছু লোহা কুরে বার করে দিয়ে ঐগুলির ওজন কমিয়ে দিয়ে থাকেন। এই সকল বাটখারার সাহায্যে উচিত মূল্য নিয়ে কম দ্রব্য ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা অতীব সহজ। অপরদিকে কোনও কোনও ক্রেতাও ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে। এই সব দুর্ব্বৃত্তেরা রাজা বা জমিদার সেজে শহরের কোনও একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি কিনতে থাকেন। কিছুদিন নগদ মূল্যে এমন কি অধিক মূল্যে দ্রব্য কেনার পর একদিন কোনও অজুহাতে তাঁরা বহু টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ধারে কিনে বসেন এবং বাড়ীতে বিল্ পৌছিবার পূর্ব্বেই দ্রব্যাদিসহ বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যান—এইরূপ ভাবে প্রবঞ্চিত এক দোকানদারের একটি বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম।

"কি করব মশাই, আমি কি আর সাধে তাঁদের বিশ্বাস করেছি, কম মূল্যে কোনও দ্রব্য দিলে তাঁরা চ'টে যেতেন, শেষ বরাবর বেশী মূল্যের কোনও দ্রব্য দোকানে না থাকলে, কম মূল্যের দ্রব্যই বেশী মূল্যের দ্রব্য বলে তেনাদের কাছে চালিয়ে দিয়েছি, তাঁরা নিঃসন্দেহে অধিক মূল্যে কম মূল্যের দ্রব্যাদি কিনে নিয়েছেন। আমার ধারণা ছিল, বোকা পেয়ে, আমিই তেনাদের ঠকাচ্ছি, তেনারা যে আমাকে ঠকাতে পারেন, এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল।"

কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতির ন্যায় (Commercial City) বাণিজ্য-মূলক শহরে ব্যবসায় সংক্রান্ত অপকর্ম্মের সুযোগ এবং সুবিধা অত্যন্তরূপ অধিক। এ কারণে এই সকল শহরে বা ব্যবসা কেন্দ্রে এইরূপ অপরাধের সংখ্যা অত্যধিক দেখা যায়। কিরূপ পদ্ধতিতে এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"আমরা চার বা পাঁচ জনে মিলে প্রথমে একটি ঝুটা, মিথ্যা বা

নকল (Bogus) ফার্ম খুলে থাকি। আমাদের ব্যবসায় সমবায়ের আমরা একটি উচ্চাঙ্গের (high sounding) নামও রাখি, যেমন "ইষ্টার্ণ এসিয়ান ফেডারেল কোম্পানী" বা "ইনটার নেশ্যানেল ট্রেডিং ফেডারেশন" ইত্যাদি। আসলে কিন্তু দুই শত বা তিন শত টাকারও ক্যাপিটেল বা মূলধন আমাদের কখনও থাকে নি। আমাদের মধ্যে একজন সাজে ম্যানেজার, একজন সাজে কেসিয়ার, কেহ বা সাজে সরকার, এ ছাড়া বেয়ারা, দরোয়ান ইত্যাদি সাজবার লোকেরও অভাব হয় না, প্রথম প্রথম আমরা বড় বড় ব্যবসায়ীদের এবং ম্যানুফাকচারারদের (শিল্পপতিদের) নিকট হতে নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি কিনতে থাকি। এইভাবে আমরা বাজারের আস্থাভাজনও হয়ে উঠি। এর পর আমরা ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে সুরু করে দিই এবং কর্জ্জের টাকা আমরা ক্ষেপে ক্ষেপে শোধও করতে থাকি। ভবিষ্যতে কোনও মামলা হলে উহা দেওয়ানি মামলায় পর্য্যবসিত করবার জন্যেই আমরা এইরূপ লেন-দেনের অভিনয় করে থাকি। এইভাবে বহু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার পর আমরা ঐগুলি কম মূল্যে বাজারে ছেড়ে দিই। মূল্য কম থাকার জন্যে ঐগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রয় হয়ে যায়। এমন অনেক অসাধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে * যারা সকল সমাচার অবগত থেকেও আমাদের নিকট হতে কম মূল্যে এই সব দ্রব্য কিনে নিয়ে থাকে। এইরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা আমরা আরও বড় বড় কারবারির সহিত কারবারে লিপ্ত হয়ে অনুরূপ ভাবে বহু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি এবং ঐগুলিকে

* এইরূপভাবে দ্রব্য গ্রহণ চোরাই মাল গ্রহণেরই সামিল। এইজন্যে এদের চোরাই মালের গ্রাহক বলে চালান দেওয়াও সম্ভব। এতদ্দ্বারা এই ধরণের অপকর্ম্মের বন্ধ হওয়ারও আশা থাকে।

কম মূল্যে (under sale) বাজারেও ছেড়ে দি। এইভাবে বাজারে আমাদের কর্জ্জের পরিমাণ অত্যধিকরূপ বেড়ে গেলে আমরা হঠাৎ একদিন অফিস বন্ধ করে, পাততাড়ি গুটিয়ে বেমালুম সরে পড়ি।"

এই সকল অপকর্ম্মের দ্বারা অপরাধীরা যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ীদেরই ঠকায় তা নয়, সমষ্টিগতভাবে "কম মূল্যে দ্রব্যাদি ছেড়ে" বাজারেরও ক্ষতি করে থাকে। এইরূপ আণ্ডার সেলের বহর দেখে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে দোকান বন্ধ করাও অসম্ভব নয়। এই সকল ছোট দোকানদাররা এই সময় দরের সমতা রাখবার জন্যে লোকসান দিয়েও 'আণ্ডার সেল' করতে বাধ্য হয় তা না হ'লে তাদের খদ্দেররা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সকল ক্ষেত্রেই এই সকল ব্যবসায় সমবায় (সুরু হতেই) যে প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তা নয়, প্রথমে এদের কেহ কেহ সৎ উদ্দেশ্যেই ব্যবসায় নামে, কিন্তু পরে অকৃতকার্য্য হওয়ায় অনন্যোপায় হয়ে প্রতারণার পথে অগ্রসর হয়; এজন্য ক্যাপিট্যালিষ্ট (পুঁজিবাদী) ও বড় বড় ব্যবসায়ীরাও কতকাংশে দায়ী থাকে। এঁরা ওই সকল ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কোনও সাহায্য করা তো দূরে থাক প্রায়ই এঁরা এঁদের নানারূপ এক্সপ্লয়েটেড্ করে থাকেন—এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা সমবায়ের অকৃতকার্য্যতার ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ এই সকল ছোট ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ এই ভাবে প্রতারণার দ্বারা বড় ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। অনেক সময় এই সকল বড় বড় ব্যবসায়ীরা অল্প সময়ের জন্যে "আণ্ডার সেল্" করে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধও করে দিয়ে থাকে। সমধিক মূলধনের অভাবে লক্ষপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যর্থকাম হয়ে এই সকল ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। হুণ্ডি ও

কিস্তিদারী প্রথার উন্নয়ন, বড় ব্যবসায়ীদের ছোট ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা এবং এই উভয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে এই ধরণের অপরাধ বহুলাংশে কমে যেতে পারে।

আদালতে এই সকল অপরাধীদের অভিযুক্ত করার অনেক অসুবিধাও দেখা যায়। এরা লেনদেনের বহু কাগজপত্র আদালতে দাখিল করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে ব্যাপারটি আগাগোড়াই দেওয়ানী ব্যাপার। হঠাৎ ব্যবসা পড়ে যাওয়ার জন্যেই নাকি এরা দেনদারদের দেনা মেটাতে পারে নি ইত্যাদি, কিন্তু সুযোগ্য ভারতীয় পুলিশের চেষ্টায় এদের এই সকল প্রচেষ্টা সকল সময়ই ব্যর্থ হয়ে থাকে।

আজকালকার কণ্ট্রোলের যুগে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলিতে নানারূপ প্রবঞ্চনামূলক রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে: ব্যবসায়ী মাত্রেই কাপড় কণ্ট্রোল দরে বিক্রয় করতে বাধ্য, কিন্তু কোনও দরজী যদি কাপড় উচিত মূল্যে (কণ্ট্রোল দরে) ১০৲ টাকা চার্জ্জ করে, মেকিং (কাট ছাঁট) চার্জ্জ ৭০৲ টাকা ধরে সুট বানিয়ে লোক ঠকায় তা হলে আইনানুসারে সে দণ্ডনীয় নয়। আইনের এই সকল ফাঁকির সাহায্যে সহজেই লোক ঠকানো চলে। উচিত (কণ্ট্রোল) মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে উহা পাঠানোর জন্যে নৌকা, গাড়ী বা মুটে বাবদ অধিক মূল্য গ্রহণ করে পুষিয়ে নেওয়ার মনোবৃত্তিও কাহারও কাহারও মধ্যে দেখা গেছে। এইবার বড় বড় শহরের ব্যবসাক্ষেত্রে কি ভাবে মানুষের মন বিভ্রান্ত করে সময় সময় প্রবঞ্চনা কার্য্য—এই সকল "আইনের ফাঁকি"র সাহায্যে সংঘটিত হয় বা হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"ধরুন কোনও এক কোটীপতি ব্যবসায়ী কোনও এক ফ্যাক্টরীর বা

কোনও এক ব্যবসা-সমবায়ের সমুদয় শেয়ার বা অংশগুলি কিনে নিতে মনস্থ করলেন।—এই জন্যে এঁরা একটি বিশেষ ফাঁদের সৃষ্টি ক'রে থাকেন। প্রথমে তিনি উচিত মূল্যে কিংবা চড়া দরে স্বয়ং বা লোক-মারফৎ ঐ কোম্পানীর অনেকগুলি শেয়ার বা অংশ কিনে নেন। এর পর ঐ শেয়ারগুলি কিছুদিন পর্য্যন্ত ধ'রে রেখে হঠাৎ একদিন ঐ গুলিকে আধা বা সিঁকি দরে-বিক্রয় করে দিতে সুরু করেন। এইভাবে ভাল ভাল শেয়ারগুলি কম দরে বিক্রয় হ'তে দেখে ঐ কোম্পানীর অন্যান্য অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডাররা অত্যন্তরূপ ভীত হয়ে উঠেন, তাঁদের নিশ্চিতরূপ ধারণা হয় যে, ঐ কোম্পানী বা ফ্যাক্টরীর শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে এবং ঐগুলি লালবাতি জ্বালালো ব'লে। তা না হ'লে অমুক লোকের মত ব্যক্তিও অত কম দরে শেয়ারগুলি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই উনি ভিতরে ভিতরে খবর নিয়ে জেনেছেন যে ঐ প্রতিষ্ঠানটি ফেল হ'তে চলেছে। এইরূপ বিশ্বাস হওয়ামাত্র উহার সকল অংশীদারগণই ভীত হয়ে স্ব স্ব অংশগুলি কম মূল্যেও বিক্রয় করতে থাকেন। এদিকে ক্রোড়পতি ব্যবসায়িটিও দালাল ও এজেণ্ট মারফৎ বেনামীতে ঐ শেয়ার বা অংশগুলি সুবিধাদরে কিনে নিতে থাকেন—এইভাবে ক্রোড়পতি ভদ্রলোকটি ঐ ফ্যাক্টরী বা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত ক'রে একাই উহার মালিক হয়ে বসেন।"

টাকায় হয় না, এমন কোনও কথা নেই। এমন কি ছোট-খাটো একটা রাজ্য বা গভর্ণমেণ্টও টাকা খরচ করে 'ফেল' করে দেওয়া যায়। উপরের ঘটনাটি ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কোনও কোনও ব্যবসায়ী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রতারিত করতে বাধ্যও হয়ে থাকে। ক্রেতারা নিজেরাই এজন্যে দায়ী। এ সম্বন্ধে কোনও এক বিক্রেতার একটি বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"আমি কি করব মশাই, ভদ্রলোক এসে বেশী দামের চাউল কিনতে চাইলেন। আমার দোকানে সর্ব্বাধিক মূল্যের চাউল ছিল দশ টাকা মণ মূল্যের। আমি প্রথমে তাঁকে আট টাকা মণের চাউল দেখালাম, কিন্তু তিনি এতে বিরক্ত হয়ে বেশী দামের কি চাউল আছে তা জানতে চাইলেন; দশ টাকা মণের চাউলও তাঁর মনঃপূত হ'ল না। এদিকে খদ্দেরটিকে হাতছাড়া করতেও আমার মন চায় না। আমি তখন অন্য আর এক বস্তা হ'তে আট টাকা মণের "একই চাউল" বার করে এনে তাঁকে জানালাম, "এই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম চাউল মণকরা মূল্য আঠার টাকা। খদ্দেরটি তখন খুশী হয়ে ঐ চাউল মণ প্রতি দশ টাকা বেশী দিয়ে কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।"

এই সম্বন্ধে আরও দুইটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"আমি একজন কবিরাজ, কোনও এক মহারাণীর চিকিৎসার জন্যে আহূত হয়ে, তেনাদের দশ টাকা মূল্যের ঔষধ পাঠাই। এত কম মূল্যের ঔষধের কারণে তাঁরা আমার চিকিৎসার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন।* এই খবর পাওয়া মাত্র আমি ত্রুটি স্বীকার করে তাঁদের ২৭৫৲ টাকা মূল্যের ঔষধ পাঠিয়ে দিই এবং ভুল ক'রে একজন সাধারণ লোকের ঔষধ রাজবাড়ীতে পাঠানোর জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে আসি।"

এই ব্যবসা সংক্রান্ত অপরাধের অপর একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি একজন কনট্রাকটার। কোনও এক জমিদার আমাকে একটি বাটী নির্ম্মাণের কনট্রাক্ট দেন। মোট পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে

---

* কি? আমার চাকর এবং আমার ঔষধের মূল্য হবে একই?—এইরূপ এক উক্তি না'কি অপর আর এক ধনী ব্যক্তি করেছিলেন।

বাড়ীটি আমাকে নির্ম্মাণ ক'রে দিতে হবে। এদিকে জমিদারের ম্যানেজার আমার কাছ হ'তে "কমিশন" চেয়ে বসলেন কুড়ি হাজার টাকার, তা না হ'লে তিনি সব ভেস্তে দেবেন। আমি এতে রাজী না হ'লে অন্য একজন ব্যক্তি ঐ সর্ত্তেই কাজটা পেয়ে যাবে—অবস্থা যখন এইরূপ তখন গত্যন্তর না থাকায় আমি ঐ প্রস্তাবেই রাজী হয়ে যাই। কিন্তু ঐ টাকাটা ম্যানেজারকে ঘুষ স্বরূপ দিলে আমার লোকসান হয়। সত্যই তো লোকসান দিয়ে আমি ব্যবসা চালাতে পারি না। আমি তখন বাজে বা কম মূল্যের মাল-মসলা দিয়ে ঐ বাড়ীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করি। ঘুষের টাকাটা, মালিককে ঐভাবে না ঠকালে তো তা উসুল হবে না। এই ভাবেই আমাদের তা উসুল ক'রে নিতে হয়। ঐ টাকা ঘর থেকে আমরা কখনও দিই না। এরপর যদি বাড়ীটা প'ড়ে যায় এবং তজ্জনিত যদি জীবনহানি ঘটে তো তার জন্যে দায়ী ঐ জমিদারের ম্যানেজার, যিনি আমাকে এই কার্য্য করতে বাধ্য করেছেন।"

এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা খদ্দেরকে প্রথম একটি বা দুইটি জিনিস খুব সস্তাতেই দিয়ে থাকেন। এতে ক'রে খদ্দেরের ধারণা হয় ঐ দোকানের দ্রব্যাদি অন্য দোকানের তুলনায় সস্তায় পাওয়া যায়। এই সুযোগে খদ্দেরটিকে দুই একটি জিনিস সস্তায় দিয়ে অন্য বহু দ্রব্যাদি অত্যন্ত রূপ অধিক মূল্যে বিক্রয় ক'রে থাকেন। ইহাকে সাধারণ ভাষায় বলা হয় "ট্রেড. সিক্রেট" বা গুপ্ত তথ্য, কিন্তু আসলে এইগুলি প্রবঞ্চনারই সামিল।

এ ছাড়া এমন অনেক প্রতারক আছে, যারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে দোকান-দারদেরও ঠকিয়ে থাকে। এরা কোনও জনবহুল স্থানে একটা বড় বাড়ী ভাড়া ক'রে, নিজেদের কোনও নামকরা পরিবার বা রাজবংশের নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। এরপর কোনও এক স্থানীয় দোকানদারকে

বেছে নিয়ে তার দোকান থেকে নগদে ও ধারে দ্রব্যাদি কিনতে সুরু করে দেয়। এইভাবে ঋণ-পরিশোধের দ্বারা এদের উপর দোকানদারের বিশ্বাস এলে এরা একসঙ্গে ঐরূপ বহু দোকান হ'তে বহু দ্রব্যাদি ধারে সংগ্রহ ক'রে ঐ সকল মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ হঠাৎ একদিন অকুস্থল ত্যাগ ক'রে বাড়ীওয়ালা, দুধওয়ালা, ফার্ণিচারওয়ালা, এমনি আরও অনেকানেক ব্যবসায়ীকে পথে বসিয়ে সরে প'ড়ে থাকে।

কলিকাতা শহরে এমন অনেক অপরাধী আছেন, যারা ইনষ্টলমেণ্টে মূল্যবান দ্রব্যাদি কিনে থাকেন। এঁরা এই সকল দ্রব্যের মূল্য বাবদ মাত্র একটি বা দুইটি ইনষ্টলমেণ্টের অর্থ প্রদান করেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এঁরা এতটুকুও না ক'রে ঐ সকল দ্রব্যাদি অপর কাউকে বিক্রয় ক'রে দিয়ে যথারীতি সরে পড়ে থাকেন। এছাড়া জাল ইন্সিওরেন্স এজেণ্টের ভূমিকায় অভিনয় করেও অনেক দুর্ব্বৃত্ত শহরে অর্থ অপহরণ ক'রে থাকেন। জাল ঘটক বা জাল দালাল সেজেও অর্থ অপহরণ করা এ শহরে সম্ভব হয়েছে। অধুনাকালে "বাড়ী ভাড়া করে দেব" এই স্তোকবাক্যে ভুলিয়েও কেহ কেহ "অগ্রিম ভাড়া" বা পারিতোষিক বাবদ অর্থাদি নিয়েও লোক ঠকিয়ে থাকেন।

এ'ছাড়া শহরে কতিপয় চায়ের দোকানী আছে, যারা চায়ের জলে অহিফেন ধোয়া জল মিশিয়ে খদ্দেরকে তা খেতে দেয়। এর ফলে নেশার কারণে খরিদ্দারগণ প্রতিবারেই তাদেরই দোকানে এসে চা'পান করে।

ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যতম অপরাধ হচ্ছে খাণ্ঠ প্রভৃতিতে ভেজাল প্রদান। প্রকৃতপক্ষে এরা খুনির চেয়েও অপরাধী ; কারণ এরা মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বও হত্যা করে। এই সকল লোভী ব্যক্তিরা সমগ্র জাতিকে বংশানুক্রমে অখাণ্ঠ খাইয়ে পঙ্গু করে তুলে। অপরাধ সম্পর্কীয় পরিসংখ্যা সংগ্রহের সময় এই সকল অপরাধীদের বাদ দেওয়া হয়। অথচ একই

অপরাধ স্পৃহা সাধারণ চোর-ডাকাতদের ন্যায় এই ভেজালকারী ও কালাবাজারীদেরও পরিচালিত করে। * নিম্নে এই ভেজাল সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা হ'ল।

"সাধারণতঃ আটা প্রভৃতিতে শ্বেত পাথর গুঁড়া, চায়ের পাতার সহিত চামড়ার গুঁড়া ও ধূলাকুটা, সরিষার তেলে নিম্নশ্রেণীর তেল, শিয়াল-কাঁটা, নানারূপ বিচির তৈলাক্ত রস, পেট্রোলের সহিত কেরোসিন তেল, ঘৃতের সহিত অনুরূপ গন্ধ সহকারে মোম, ডালদা প্রভৃতি, বিলাতি মাটি বা সিমেণ্টের সহিত গঙ্গামৃত্তিকা, রৌপ্য ও স্বর্ণে খাদ এবং দুধের সহিত ময়দা গোলা, বিলাতী পচা দুধ ও জল মিশানো হয়ে থাকে। যে কোনও খাদ্যের গন্ধানুযায়ী গন্ধ বাজারে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। এই গন্ধ সহকারে প্রকৃত ঘৃত প্রভৃতি যে কোনও খাদ্যের অনুরূপ গন্ধ ভেজাল-কৃত খাদ্যে সংযোজনা করা সম্ভব। ঔষধে ভেজাল প্রদান করেও এরা বহু মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে। সাধারণতঃ ঔষধের লেবেল দেওয়া শিশি বোতল সংগ্রহ করে উহাতে জাল ঔষধসমূহ এরা ভর্ত্তি করে থাকে। পচা মৎস্যসমূহ বরফ সহযোগে কঠিন করে উহাদের কানকোতে লাল রঙ গুলে তা প্রবেশ করিয়ে এরা খরিদ্দারদের বুঝায় যে ঐ রক্তাক্ত মৎস্যগুলি অতীব টাটকা। দুই এক ক্ষেত্রে মাছের পেটে নেকড়া ভরে এরা বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে উহা ডিমে ভরা। 'খয়ের' পর্য্যন্ত এরা মৃত্তিকা মিশ্রিত করে তা বাজারে চালায়। এমন কি প্রসাধন ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও এরা ভেজাল দেয়। এর ফলে সুগন্ধি তেল মেখে অনেকের মাথার চুল উঠে গিয়েছে এবং সাবান আদি মেখে

* বিদেশী কোম্পানীর মালিকরা বহু দূরে থাকায় তাদের পুস্তক, এবং অন্যান্য দ্রব্য সম্ভার জাল করা সহজ। তবে দেশী দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে নকল করা হয়ে থাকে।

অনেকের চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া বিলাতী লেখার কালি, এবং অন্যান্য বিদেশী দ্রব্যও সোডা লেমেনেড, এমন কি সন্দেশ রসগোল্লার জন্য তৈরী ছানাতেও ভেজাল দেওয়া হয়। এই ভেজাল আধিক্যের যুগে মানুষ ভেজালের কারণে বিষ খেয়েও মরেনি।

আলু, ডিম, মাছ, ডাল, মাংস, চাউল প্রভৃতি কয়েকটি খাদ্য জাল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তা হলে কি হয়, কাঁকর মিশান চাউল এবং পচা আলু, ডিম প্রভৃতি ও অন্য মাংস মিশ্রিত ছাগ ও মেষ মাংস বিক্রয় করে ভেজালকারীরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়। এ ছাড়া পুরানো কাপড় রঙ দিয়ে ছাপিয়ে তারা উহা নূতন শাড়ী রূপে বাজারে চালিয়ে দিয়েছে।

ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতারণার গতি আজ অব্যাহত! এমন অনেক জুয়েলারী দোকানী আছে যারা প্রচুর খাদ-মিশান গহনা বিক্রয় করে ক্রেতাদের বিজ্ঞাপন দ্বারা জানায় যে, তারা ইচ্ছা করলে ঐ গহনা একই দরে এক বৎসরের মধ্যে তাদের নিকটই বিক্রয় করতে পারে। বলা-বাহুল্য এই ভাবে তাদের তৈরী গহনা তাদেরই দোকানে ফিরে এলে তাদের লোকসান তো হয়ই না বরং এতদ্বারা তাদের ঐরূপ প্রতারণা ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

এই ভেজাল প্রভৃতি অপরাধের ব্যাপকতার কারণে উহা মানুষের এমনই গা' সওয়া হয়ে গিয়েছে যে, তারা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো করেই না, বরং তারা মনে করে ইহা বুঝিবা এই সংসারের এক স্বাভাবিক পরিণতি। এই জন্য গয়লা দুধে জল মিশালে তারা মনে করে যে, উহাতে বিশুদ্ধ জল দিয়েছে ত'? অন্য দিকে খাদ্যাদির ভেজাল সম্পর্কে তারা মাত্র ভেজালের পরিমাণের কথাই ভেবেছে।

[ব্যবসায়ীরা যাদের কাছ হতে দ্রব্য কেনে এবং যাদের কাছে তা

তারা বিক্রয় করে ; এই উভয়বিধ ব্যক্তিদের নিকট দাও মারার মনো-বৃত্তি নিয়ে তারা কার্য্যে নামে। এই কারণে বড় বড় শহরে যেখানে অতিমাত্রায় ব্যবসায় চলে সেখানে অপরাধ-প্রবণতারও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।]

এই ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে বা সমর্থনে বা প্ররোচনায় বহু দুর্দ্দান্ত আনুষঙ্গিক অপদলেরও সৃষ্ট হয়েছে। এরা বিবিধ আইনগত বিধি-নিষেধ অমান্য করে নিষিদ্ধ পণ্যাদি অবৈধভাবে এক জিলা হতে অপর জিলায়, এক প্রদেশ হতে অপর প্রদেশ এবং এক রাষ্ট্র হতে অপর রাষ্ট্রে চালান করে থাকে। এজন্য এরা খুনখারাপি এবং সৈন্য ও পুলিশের সহিত সংঘাত করতেও পিছপাও হয় নি। এইভাবে তারা ব্যাপক অপরাধের সৃষ্টি তো করেছেই, এমন কি সেই সঙ্গে বহু অপরাধ পরিবার ও অপরাধী-কলোনীরও সৃষ্টি করেছে। এই সকল অপরাধীগণ বড় বড় শহরের চতুর্দ্দিক ঘিরে সাঙ্গপাঙ্গ সহ বসবাস করে।

এই সকল কারণে বড় বড় শহর হতে যারা যত দূরে বাস করে তাদের মধ্যে তত কম দ্রব্য সম্ভূত অপস্পৃহা দেখা যায়। এই সকল শহর হতে বহু দূরে যারা বাস করে তাদের মধ্যে মারপিঠ আদি শোণিতসম্ভূত অপস্পৃহা দেখা গেলেও চুরি-চামারী আদি দ্রব্যসম্ভূত অপস্পৃহা তুলনায় বহু কম দেখা গিয়েছে।

ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেস্

ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেস্ বা ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত মামলা সকল ব্যবসায় সংক্রান্ত অপকর্ম্মের পর্য্যায়ে পড়ে থাকে। "বেয়ারার চেক" জাল বা নকল ক'রে ব্যাঙ্ক হতে অর্থ আদায় এক অতি সাধারণ ব্যাপার। এই অপকর্ম্মে

দুর্ব্বৃত্তেরা কোনও ব্যক্তির নিকট হ'তে কৌশলে একটি ৫্, ১০্ বা ৫০্ টাকার বেয়ারার চেক্ সংগ্রহ করে। এরপর তারা ঐ চেকের সংখ্যাগুলি কোনও এক বিশেষ কেমিক্যালের* সাহায্যে উঠিয়ে ফেলে, ঐস্থলে ৫০০্, ১০০০্ বা ৫০০০০্ টাকা লিখে ঐ চেক্ ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রে টাকা উঠিয়ে নেয়। কখনও এরা এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের সহিত ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত থাকে। ব্রাঞ্চ ব্যাঙ্কগুলিতে সকল সময় অধিক টাকা মজুত থাকে না, এরা ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের নিকট প্রথমে জেনে নেয় ঐদিন প্রয়োজনীয় টাকা ব্যাঙ্কে জমা প'ড়েছে কিনা। ঐ টাকা ঐদিন ব্যাঙ্কে মজুত আছে, জ্ঞাত হওয়ামাত্র তারা ঐ জাল চেকটি ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রে টাকা উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও খোদ মালিকরাও এই সকল ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেসে সংশ্লিষ্ট থাকেন। এদের ধূর্ত্ততা সুচতুর অডিটার-রাও ধরতে অক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে "একাউণ্টে কোনও ভুল নেই", এইরূপ সার্টিফিকেট্ও দিয়ে থাকেন। এই সকল দুর্ব্বৃত্তদের ষড়যন্ত্রের ফলে সাধু চরিত্রের অডিটাররাও বিনাদোষে বদনামের ভাগী হয়েছেন। আমি একবার কোনও এক ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেসের অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা, আপনি বছরের পর বছর ধ'রে অতগুলি অডিটারকে কি রূপে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছেন?" প্রত্যুত্তরে অপরাধীটি নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি প্রদান করে।

"আসলে বিষয়টি থাকে আগাগোড়া মনস্তত্ত্বমূলক। অডিটার প্রথমে

* জন স্বার্থের কারণে এই কেমিক্যাল নাম জানানো হ'ল না। এই কেমিক্যালের সাহায্যে অতি সহজে যে কোনও পেন্সিল বা কালির লেখা বেমালুম ভাবে উঠিয়ে ফেলা যায়।

"আইটেম্ বাই আইটেমের" অঙ্কগুলি মিলিয়ে নিতে থাকেন, এবং আমিও এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে থাকি। নিম্নের তালিকাটি দেখলে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

√২০০০০ | ০	√৫০০০ | ০	আইটেম্ নং	১
√৫০০০০ | ০	√২০০০ | ০	,,	২
√৩০৫০০ | ০	√১৫০০ | ০	,,	৩
√৭০৩৪৫ | ০	√৭০৮০ | ০	,,	৪
√২১০০০ | ০	√২০০০ ০	,,	৫
টাঃ ১৯১৮৪৫ ০৲	টাঃ ১৭৫৮০০৲		

পৃথক পৃথক খাতাপত্র চেক্ ক'রে অডিটার দেখলেন, উহাতে জমা বা খরচ দেখানো হয়েছে, যথাক্রমে ২০০০০৲, ৫০০০০৲, ৩০৫০০৲ ৭০৩৪৫৲ ও ২১০০০৲ এবং ৫০০০৲, ২০০০৲, ১৫০০৲, ৭০৮০৲, ২০০০৲; ভাউচার রিশিট্ প্রভৃতির সহিত এই সংখ্যাগুলির কোনও অমিলও নেই, ইত্যাদি। অডিটারমশাই বিভিন্ন বিষয়ক খাতা-পত্র হ'তে সংখ্যাগুলি যথাক্রমে মিলিয়ে নিয়ে উহার (সংখ্যার) পাশে পাশে একটি ক'রে ঠিক্ দিয়ে গেলেন। এর পরই তিনি যদি যোগ দিয়ে ফেলতেন, তা হ'লে তিনি দেখতে পেতেন যে, যোগফল অত্যন্তরূপ বেশী করে দেখানো হয়েছে; এদিকে অডিটারমশাই যে সময় যোগ দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই আমরা এক হট্টগোল বাধিয়ে বসি, যাতে করে কি'না সেদিনকার মত কার্য্যে তাঁকে ক্ষান্ত দিতে হয়। হঠাৎ উপর হ'তে (ম্যানেজারের বাসা হ'তে) থালি থালি জলখাবার এসে পড়ে, কিংবা হঠাৎ ম্যানেজারের কোনও এক যুবতী ভগিনী বা শ্যালিকা আবির্ভূত হ'য়ে খাবার খেতে অ...রকে উপরে আসবার জন্যে তাগিদ জানায়—এর পর অডিটারের উঠে পড়ে উপরে যাওয়া ছাড়া আর গতান্তর থাকে না। এর পর সুরু হয়, ভগিনী, শ্যালিকার বা কন্যার গীত ও ওরিয়েণ্টেল নৃত্য। অডিটার

কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরের দিনের জন্যে মুলতবী রেখে গৃহে গমন করেন বাধ্য হয়েই। কোনও কোনও সময়, হঠাৎ থিয়েটারের পাশও এসে পড়ে। ম্যানেজারও তখন 'চলুন মশাই থিয়েটার দেখে আসি, কাজ তো আছেই, না হয় কালই হবে।' ইত্যাদি বলে অডিটারকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেন। কখনও বা হঠাৎ ম্যানেজারের বাড়ী থেকে এক দুঃসংবাদ এসে পড়ে, ফলে অডিটারকে এমনিই কার্য্যে ক্ষান্ত দিতে হয়। কখনও কখনও অকারণে ঝগড়াঝাটি করেও অডিটারকে ঐ দিনের মত কার্য্যে ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কি'না যোগ দেওয়ার কার্য্য শেষ না করেই অডিটারকে বিদায় নিয়ে গৃহে ফিরতে হবেই। এমন কি ক্ষেত্র-বিশেষে স্বল্প মাত্রায় আগুন পর্য্যন্ত লাগিয়ে তা পরে নিবান হয়েছে।

অডিটার চলে গেলে আমরা প্রয়োজনমত দাঁড়ির এপারের (চিত্র দেখুন) সংখ্যাগুলি যোগ করে দিই। অর্থাৎ কি'না মূল সংখ্যাগুলির সহিত প্রতি লাইনেই প্রয়োজন মত একটি বা দুইটি ডিজিট (সংখ্যা) আমরা যুক্ত করে দিই যাতে করে কিনা যোগফলের মধ্যে কোনওরূপ ভুল চুক ধরা না পড়ে। পরের দিন কাজে এসে অডিটার সাহেব দেখে নেন কোন্ কোন্ সংখ্যার উপর তিনি ঠিক্ দিয়ে গেছেন। এইগুলি পূর্ব্ব দিন মিলিয়ে নিয়ে তিনি ঠিক মেরে গেছেন, এই জন্যে ঐ গুলি তিনি আর পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন না। এদিকে ঐ সংখ্যাগুলির সহিত যে আমরা প্রয়োজনমত একটি বা দুইটি সংখ্যা যোগ করে দিয়েছি তা তিনি দেখেও দেখতে পান না। তাঁর ধারণা হয় ঐগুলি পূর্ব্ব দিনেও ঐরূপ ভাবে লেখা ছিল, অত খুঁটিনাটি মনে রাখাও কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। অডিটারমশাই এইবার নিঃসন্দেহে সংখ্যাগুলি যোগ দিয়ে, যোগফল মিলিয়ে দেখেন যে, উহাতে কোনও রূপ ভুল নেই—তিনি তখন হেড্ অফিসে (বা গভর্ণমেণ্টে)

দাখিল করে দেন, যে হেড্ অফিসে বা অন্যত্র যে মূলসংখ্যা পাঠান হয়েছে, উহাতে কোনওরূপ ভুল নেই, খাতাপত্র চেক্ ক'রে তিনিও ঐ (যোগফল) সংখ্যাই নির্ভুল ভাবে পেয়েছেন, ইত্যাদি।"

এভাবে রিপোর্ট দাখিল করার জন্যে ঐ সকল হিসাব পরীক্ষকরাও (Auditor) এই সকল তহবিল তছরূপের ব্যাপারে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে প'ড়ে থাকেন, একরকম বিনাদোষেই। সাধারণ দৃষ্টিতে এঁদেরও একজন অপরাধী মনে হয়, কিন্তু আসলে এঁরা থাকেন সম্পূর্ণরূপেই নির্দ্দোষ।

এই ব্যাঙ্ক ফ্রড্ সম্বন্ধে নিম্নে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি তুলে দেওয়া হ'ল। বিবৃতিটি হতে ব্যাঙ্ক ফ্রড্ সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝা যাবে।

"আমি প্রতারণার উদ্দেশ্যে প্রায় বারোটি ছোট ছোট ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খুলে দিই। এই সকল একাউণ্টে আমরা স্বল্প মাত্র টাকা রেখে থাকি। এর পর আমরা কয়েকটা বোগাস্ অর্ডারের কাগজ তৈরী করে নিই। বড় বড় অফিস হ'তে ছাপান ফর্ম্ম সংগ্রহ তো আমরা করিই, এ ছাড়া ঐ অফিসের বড় সাহেবদের সইও—আমরা জাল করেছি। প্রায় একলক্ষ টাকার অর্ডারসহ জাল কাগজপত্র আমরা কোনও একটি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে উহার স্বপক্ষে আমরা হাজার পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ করে নিই। এক লক্ষ টাকার কাগজপত্র জামিন হিসাবে পাওয়ায় ঐ অর্থের অর্দ্ধেক টাকা আমাদের কর্জ্জস্বরূপ দিতে ব্যাঙ্ক সহজেই রাজী হয়ে থাকে। এর কিছুদিন পর ব্যাঙ্ক ঐ সকল কাগজ-পত্র কথিত অফিসে টাকা আদায়ের জন্যে দাখিল ক'রে থাকে—কিন্তু তা করলে কি হয় ঐ অফিসেরই কর্ম্মচারীদের মধ্যে আমাদের লোক থাকায় ঐ সকল কাগজপত্র আমাদের কাছেই ফিরে আসে, কর্ত্তা ব্যক্তিদের নিকট কদাপি পৌঁছায় না। ঐ ব্যাঙ্ক যদি খুব বেশী তাগিদ দিতে থাকে তা হলে ঐ অফিসেরই এক কর্ম্মচারীর মারফৎ মাত্র

একটা বা দুইটা বিলের টাকা আমরা জমা দিয়েই দিই, ঐ. অফিসের আসল কর্ত্তাদের অজ্ঞাতেই। এখন জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে এই টাকাটাই বা আমরা পাই কোথা থেকে, বিশেষ করে চুরির বা জুয়োচুরির টাকাটা যখন আমরা সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিই। আসলে ব্যাপারটি হয়ে থাকে এইরূপ : ঐ ব্যাঙ্কের তাগিদ অত্যধিক হ'বা মাত্র আমরা ঐরূপ' জাল .কাগজপত্র অপব আর একটি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ঐ ভাবেই বহু টাকা কর্জ্জ কবে নিই, এবং এই কর্জ্জ করা টাকাব কিছুটা অংশ ঐ ভাবে লোক মাবফৎ পূর্ব্বেকার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়ে থাকি। এই ভাবে অত টাকা পরিশোধ করায় আমাদের উপর ঐ ব্যাঙ্কের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। ফলে পরের বার আমরা আরও অধিক কর্জ্জ পেয়ে থাকি। এই ভাবে এক সঙ্গে চার বা পাঁচটি ব্যাঙ্কের সহিত লেন দেনের কারবার ক'রে শেষে কারবার যখন আর সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠে, তখন আমরা যা কিছু টাকা পাবার তা পেয়ে নিয়ে কারবার উঠিয়ে রাতারাতি সরে প'ড়ে থাকি। যাতে করে ঐ সকল ব্যাঙ্কাররা আমাদের নাগাল আর না পেতে পারে। আমরা সরে পড়ার পর ব্যাঙ্কেব ম্যানেজাররা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, এত দিন যে কাজকর্ম্ম বা কারবার তারা করেছেন, তা তারা করেছেন একটা ঠগী দলের সঙ্গে, এবং তাবা এও জানতে পারেন যে ঐ অফিসের কর্ম্মকর্ত্তারা এই সকল কাগজপত্র সম্বন্ধে একেবারেই ওয়াকিবহাল নয়।

কোনও কোনও সময় দুষ্টপ্রকৃতির পোষ্টাল পিওনদের সহযোগিতায় এই ব্যাঙ্কের প্রতারণার কার্য্য সমাধিত হয়ে থাকে। অনেক সময় নাগরিকরা খামের ভিতর করে সই করা চেক্ পাঠিয়ে থাকেন। অসৎ প্রকৃতির পোষ্টাল পিওনরা ঐ সকল খাম বা লেপাফা তীব্র আলোকের

সম্মুখে স্বত্ব ক'রে বুঝে নেয় ঐ খামের ভিতর চেক্ আছে কি'না, এই ভাবে চেকের সন্ধান পাওয়া মাত্র তারা খামখানি গাপ করে কিংবা উহা ভেপারের (বাষ্প) মুখে ধরে খুলে ফেলে ঐ খামের ভিতর হতে চেক খানি বার করে নিয়ে ঐ সকল দুর্ব্বৃত্তদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। এর পর দুর্ব্বৃত্তরা উহাতে লিখিত (অর্থের) সংখ্যা কেমিকেলের সাহায্যে উঠিয়ে ফেলে (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ দেখুন) উহা দশগুণ করে নিয়ে জাল সই-এর দ্বারা উহা নিজের নামে এন্‌ডোর্স বা খারিজ করিয়ে ঐ চেক্‌টি কোনও একটি ছোট ব্যাঙ্কের সাহায্যে নিজের একাউণ্টে জমা করিয়ে নেয়। এই উদ্দেশ্যে দুর্ব্বৃত্তরা ছোট ছোট ব্যাঙ্কে মিথ্যা নাম নিয়ে (বা স্বনামে) ছোট ছোট কয়েকটি একাউণ্টও খুলে থাকে। এই ছোট ব্যাঙ্কটি তখন বড় ব্যাঙ্কে ঐ চেকটা পাঠিয়ে দিয়ে উহা ভাঙিয়ে নিয়ে থাকে—ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে চেক্ পাঠানোর ফলে কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহেরও উদ্রেক হয় না, ড্রয়ারকে সনাক্ত করারও কোনও রূপ প্রশ্ন উঠে না, তা না হ'লে সনাক্ত না করে অতগুলো টাকা হয়ত ঐ বড় ব্যাঙ্ক দুর্ব্বৃত্তটিকে না'ও দিতে পারত। এর পরের দিনই ঐ ছোট ব্যাঙ্কটি হতে সমুদয় অর্থ উঠিয়ে নিয়ে দুর্ব্বৃত্তটি সহর ত্যাগ ক'রে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। ছোট ব্যাঙ্কগুলির টাকার খাঁকতি থাকায় উহারা বিনা ইন্‌ট্রোডাকসনে সকল ব্যক্তিরই অর্থাদি জমা নিয়ে থাকে।

এই সকল চোরাই চেক অন্যান্য উপায়েও ভাঙিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে দুর্ব্বৃত্তরা কোনও দোকানে একটি জাল বা চোরাই চেক প্রদান করে বহু টাকার মূল্যের দ্রব্য কেনে। দোকানী অবশ্য প্রথমে নিজের ব্যাঙ্কের একাউণ্টের মাধ্যমে কথিত ব্যাঙ্ক হতে ঐ চেক ভাঙিয়ে নিয়ে তবে দুর্ব্বৃত্তদের দ্রব্যাদির ডেলিভারি দিয়েছে। পরে

পুলিশ ঐ দুইটি ব্যাঙ্কের সাহায্যে ঐ দোকানীকে আবিষ্কার করেছে, কিন্তু প্রকৃত চোরকে সব ক্ষেত্রে খুঁজে বার করতে পারে নি।

অপর আর এক ব্যাঙ্ক ফ্রড্ সংক্রান্ত অপরাধী আমার নিকট এইরূপ এক বিবৃতি দিয়েছিল।

"আমরা প্রথমে একটি জাল রেলওয়ে রিসিট যোগাড় করি—ঐ রেলওয়ে রিসিটে প্রায় ২০০০০৲ টাকার মূল্যের দ্রব্যের কথা লিখা থাকে। এর পর আমরা কোনও এক ব্যাঙ্কে ঐ রিশিট দাখিল ক'রে উক্ত ব্যাঙ্ককে উক্ত দ্রব্যাদি খালাস করে নেবার জন্যে অথোরাইজড্ করে দিয়ে থাকি—এর পর ঐ দ্রব্যের বিনিময়ে আমরা যৎসামান্য এ্যাডভান্স স্বরূপ চেয়ে নিই। অত টাকার দ্রব্য হেপাজতে থাকায় উক্ত ব্যাঙ্ক আমাকে একটা ৫০৲ বা ৫০০৲ টাকার চেক এমনিই লিখে দিয়ে থাকে। এই চেক্‌টির অঙ্ক আমরা যথা নিয়মে কেমিক্যালের দ্বারা উঠিয়ে ফেলে উহাতে একটা ৫০০০৲ বা ৫০০০০৲ টাকার মোটা অঙ্ক খুসীমত লিখে নিয়ে উক্ত চেক আমরা যথাসময়ে ভাঙিয়ে নিয়ে সরে পড়ে থাকি। নিম্নের সইটি এবং চেকের নম্বর ঠিক থাকায় ব্যাঙ্ক নিঃসন্দেহে আমাদের উক্ত অর্থ প্রদান করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা দূর শহরে একটা ছোট ফার্ম্ম খুলে বড় শহরের কোনও এক ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঐ স্থান হ'তে চিঠিপত্র চালাতে থাকি। এর পর ঐরূপ একটা রেলওয়ে রিশিট দাখিল করে ঐ ব্যাঙ্কের নিকট আমরা টাকা আমানত চাই। ঐ রিশিটে আমরা লিখিয়ে দিই যে ১০ টিন প্লাটিনাম বা অনুরূপ কোনও দুর্ম্মূল্য দ্রব্যাদির কথা, আসলে কিন্তু ঐ টিন বা পিপাগুলিতে থাকে সিমেণ্ট, টিন বা মাটি। ব্যাঙ্কের লোকেরা যথারীতি রেলওয়ের গুদামে এসে ঐ টিন বা পিপা গুণে দেখে নেয় ঠিক আছে কি'না, কিংবা কোম্পানির

লোকেদের নিকট হ'তে তদন্ত ক'রে জেনে নেয়, ঐরূপ পিপা যথার্থই বুক্ করা হয়েছে কি'না। এর পর ব্যাঙ্ক ঐ প্লাটিনামের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা প্রতারকদের কর্জ্জস্বরূপ প্রদান করে ঐ মাল ঐ রিশিটের সাহায্যে রেলওয়ে হ'তে ছাড়িয়ে এনে, গুদামে তুলে দেখতে পায়, উহাতে প্লাটিনাম নেই, আছে মাত্র সিমেণ্ট বা মাটি।"

ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্কের কোনও কোনও কর্ত্তাব্যক্তিরাও তাঁদের খাতকদের ঠকিয়ে থাকেন। এঁরা জেনেশুনে এমন সকল ব্যক্তিকে ওভার-ড্রাফ্ট বা কর্জ্জ দেন, যারা কিনা কস্মিনকালেও ঐ টাকা পরিশোধ করতে পারবেন না। আসলে এই সকল বাহিরের দুর্ব্বৃত্তদের সহিত তাঁদের আধাআধি হিসাবে বখরা হ'য়ে থাকে। এই জন্যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা এমন সব সম্পত্তি জামিনস্বরূপ গ্রহণ করেন "কর্জ্জ দেওয়ার অর্থের" তুলনায়, যার কিনা কোনও মূল্যই নেই, এখানেও ঐরূপ আধাআধির হিসাবে বখরার বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী, নিজেই নিজেদের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করা শোভা পায় না। তাই আমি আমার এক নাম করা বন্ধুর কাছে এসে প্রস্তাব করি, 'দেখ ভাই আমি একজন ব্যবসাদার, প্রায়ই নানারূপ দেনা-পাওনায় আমরা জড়িয়ে পড়ি, এজন্যে আমি বেনামিতে একটা একাউণ্ট খুলতে চাই। মনে করছি তোর নামেই একাউণ্টটা খুলব। টাকাকড়ি যা জমা দেবার তা আমিই দেব। তুই মাঝে মাঝে একটা করে সই দিয়ে যাবি। এজন্যে মাসে মাসে তোকে আমি ৫০৲ টাকা ক'রে দিয়ে যাব তোর পারিশ্রমিক স্বরূপ। বন্ধুবর এই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোনও কিছুই বুঝতেন না। এজন্যে তিনি সহজেই আমার এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। এর কয়দিন পর হ'তেই আমি

আমার 'নিজের সাহায্যেই' আমার ব্যাঙ্ক হতেই ওভার ড্রাফ্ট নিতে সুরু করে দিই। এই টাকা হ'তে আমি তিন চারটি কারবারও সুরু করে দিই। আমার ইচ্ছে ছিল এই সকল কারবার ফেঁপে উঠলে আমি এই সকল কর্জ্জ বন্ধুর মারফৎ কারবার হ'তেই শোধ করে দেব, কিন্তু হায়, ব্যবসার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ থাকায় আমার ব্যবসায় ফেল হয়, টাকা পরিশোধ করতে আমি অপারক হই, এবং এইভাবে আমি নিজের, বন্ধুর এবং তৎসহ ঐ ব্যাঙ্কেরও বিপদের কারণ ঘটাই।

আত্মীয়বাৎসল্য বা বন্ধুপ্রীতির কারণে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা অবাঞ্ছনীয় বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপও অনেক ছোট-খাটো নূতন ব্যাঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ ছাড়া কোনও কোনও ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কে জমার জন্যে কিছু টাকার আমদানী করতে সাহায্য করার জন্যেও বিনানুসন্ধানে যা'কে তা'কে ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিযুক্ত করে থাকেন। এই সকল ব্যক্তি দ্বারা তহবিল তছ্রূপ আদি অপকর্ম্ম করা অসম্ভব নয়। নবজাত দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির পতনের জন্যে এইরূপ নির্ব্বিচার কর্ম্মচারী নিয়োগও বহুল পরিমাণে দায়ী থাকে।

[এমন অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকের কথাও শুনা গেছে যিনি নানাবিধ কৌশলে ব্যবসায়ের সমুদয় পুঁজিপাতি সরিয়ে ফেলে, পরে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিকে হঠাৎ লিমিটেড্ ক'রে শেয়ার বিক্রয় করতে সুরু করেছেন। এছাড়া এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন যাঁরা ব্যবসাক্ষেত্রে কোনও এক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বহু লাভের কথা ব'লে ব্যবসায় নামিয়ে তার অর্থ অপহরণ করে থাকেন। লোভ ক্রোধের ন্যায় মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি হরণ করে থাকে—এই কারণে ঐ ব্যক্তি দুর্ব্বৃত্তদের সকল কথাই বিশ্বাস করে যায়। এইরূপ অবস্থায় কোনও এক তৃতীয় পক্ষের মতামত নিয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা বিধেয়।]

কোনও কোনও দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ের কারণে পল্লীগ্রামে এসে "দোনাখেল" ব্যাঙ্কেরও প্রবর্ত্তন করে লোক ঠকিয়েছে। এই ব্যাঙ্ক খুলে এরা প্রথমে জানিয়ে দেয় যে, এক টাকা রাখলে দু'টাকা দেওয়া হ'বে, অর্থাৎ কি'না জমা অর্থের দ্বিগুণ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হ'বে। প্রথম প্রথম এরা কয়েকজনকে প্রতিশ্রুতিমত দ্বিগুণ অর্থ দিয়েও থাকে। কিন্তু পরে অনেক টাকা জমা পড়লে এঁরা একদিন সমুদয় অর্থ নিয়ে সরে পড়ে থাকেন।

অপকর্ম্ম—ডাকঘরের

ব্যাঙ্ক ফ্রড্ অপকর্ম্ম সম্বন্ধে বলা হ'ল, এইবার পোষ্টাল বা ডাকঘর সংক্রান্ত অপরাধ সম্বন্ধে বলা যাক। ডাকঘরে আমরা চুরি এবং জুয়োচুরি, এই উভয়বিধ অপরাধই সংঘটিত হ'তে দেখি। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ডাকঘরের চোরেরা অত্যন্তরূপ চতুর হয়ে থাকে। নিম্নের দৃষ্টান্তটি এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

"য়ুরোপে এমন অনেক ডাকঘরের অপরাধী আছে যারা কি'না পোষ্ট অফিসের মারফৎ একটি কাঠের ছোট বাক্স পার্শেল্ ক'রে পাঠায়। ঐ বাক্সের উপরে তারা লিখে রাখে "সোনার গহনা, মূল্য ২৫০০০৲ টাকা।" আসলে কিন্তু ঐ পার্শেলে কোনও গহনা থাকে না, গহনার পরিবর্ত্তে তারা কয়েকটুকরা পাথর ও তৎসহ একটি জীবন্ত ইঁদুর অক্সিজেন গ্যাস সহ ঐ বাক্সে পুরে রাখে। এর পর যথারীতি উপরে সীলমোহর এঁটে তারা বাক্সটি পার্শেল ক'রে অপর আর এক অপরাধীর কাছে ডাকঘরের মারফৎ পাঠিয়ে দেয়। এদিকে ইঁদুরটি বাক্সবন্দি হয়ে বসবাস করতে স্বভাবতঃই রাজী থাকে না, পথিমধ্যেই ঐ জন্তুটি বাক্সটি দন্ত দ্বারা ফুটা ক'রে বেমালুম বার হয়ে যায়। এদিকে যথাস্থানে বাক্সটি পৌঁছানোর পর

বাক্সটির মধ্যে একটা ছিদ্র দেখা যায়। এই অবস্থায় বাক্সটি প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ অপরাধীটি বাক্সটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয় এবং পোষ্ট অফিসের নিকট পার্শেলের মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দাবী করে থাকে, স্বভাবতঃ সকলের মনে হয় যে কে বা কাহারা বাক্সটি ঐরূপ ভাবে ফুটা করে গহনা-গুলি বার করে নিয়েছে। পোষ্ট অফিসকেও বাক্সটির প্রেরককে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্শেলের মূল্য বাবদ সমস্ত টাকা খয়রাত দিতে বাধ্য হতে হয়।

চৌর্য্য অপরাধের এই পদ্ধতিটি যে একটি অদ্ভুত পদ্ধতি তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। এদেশেও পোষ্টাল পার্শেলগুলি হামেসাই অপহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় পোষ্টাল কর্ম্মচারীদের যোগসাজসেও এই সকল চুরি সংঘটিত হয়ে থাকে। কখনও ঐ সকল কর্ম্মচারীদের কেহ কেহ নিজেরাও চুরি করে থাকেন। কেহ কেহ আবার এইরূপ ছোট-খাট চুরিকে "পাওনা" নামে অভিহিত করে থাকেন। এই সকল কর্ম্মচারীদের পত্নীদের প্রায়ই বলতে শুনা গেছে, "এই সব জিনিস, উনি অফিসে পেয়ে থাকেন।" মা লক্ষ্মীরা বুঝেও বুঝতে চান না, এইগুলি তাঁদের স্বামীরা অফিস হ'তে চুরি করে এনেছেন। কোনও কোনও রেল কর্ম্মচারীর স্ত্রীদেরও ঐরূপ বলতে শুনা গেছে। এই সকল ছোট বড় পার্শেল পোষ্ট অফিস, ষ্টিমার এবং রেল, এই তিনটি স্থান হতেই অপহৃত হ'য়ে থাকে। দুঃখের বিষয় এই সকল ভদ্রসন্তানদের একবারও মনে হয় না, ঐ সকল দ্রব্যের প্রেরকদের স্ত্রীপুত্রের কথা। ঐ এক-টুকরা দ্রব্য, তা যত কম মূল্যেরই হোক না কেন—ঐ দ্রব্যটির জন্যে তাঁদের স্ত্রী পুত্রেরা কত অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে। দূরদেশ হ'তে আগত তাদের স্বামী, পুত্রের বা প্রিয়জনের ঐ স্মৃতিচিহ্ন সকল তাদের কতটা আনন্দ প্রদান করতে পারে, তার শতাংশের একাংশও যদি তাঁরা তা বুঝতেন, তা হ'লে ঐ সামান্য দ্রব্যের জন্যে তাঁরা এইরূপ

জঘন্য চৌর্য্য কার্য্যে কখনও লিপ্ত হতেন না। আমি এই সকল ভদ্রসন্তানদের নিজেদের স্ত্রীপুত্রের ও বিদেশস্থ প্রিয়জনদের কথা স্মরণ করে বিষয়টি অনুধাবন করবার জন্যে অনুরোধ করি। সুখের বিষয় ভারতবর্ষের অধিকাংশ পোষ্টাল ও রেল কর্ম্মচারীরা সাধুপ্রকৃতিরই হয়ে থাকে।

"টেলিগ্রাফ সুইণ্ডিলিঙ" ডাকঘর সংক্রান্ত একটি অন্যতম অপরাধ। সাধারণতঃ টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারের সাহায্যে এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। এই সকল অপরাধীরা সাবধানে খবর নেয়, কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোনও কর্ম্মচারী বা প্রতিনিধি ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্য ব্যপদেশে বিদেশে যাচ্ছে কি'না। ঐরূপ কোনও খবর পাওয়া মাত্র এরা ঐ ব্যক্তির পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে তার গন্তব্য স্থানে এসে হাজির হয়। পথিমধ্যে (ট্রেণের কামরায়) ঐ ব্যক্তির সহিত সংলাপ ক'রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও তারা সংগ্রহ ক'রে নিতে ভুলে না। এর পর কথিত শহরের বা জনপদের কোনও দোকানে এসে তারা কিছু দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় ক'রে ঐ দোকানদারকে এইরূপ অনুরোধ জানায়—"দেখুন, আরও কিছু দ্রব্যাদি আপনার দোকান হতে খরিদ করতে চাই। কিন্তু, মশাই টাকার কম পড়ে গেছে, তা যাই হোক আমাদের ফার্ম্মে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি আপনার এই ঠিকানাতেই টাকা পাঠাতে। যদি তারা টাকা পাঠায় তা হলে দয়া করে পিওনকে আমার কথা বলে রাখবেন।" দোকানী দেখে লোকটি তার একটা বড় দরের খরিদ্দার, তাই তার এই প্রস্তাবে তারা আনন্দের সহিতই রাজী হয়ে যায়। সাধারণতঃ অমুক ব্যক্তিরূপে কাহাকেও কেহ রীতিমত সনাক্ত না করলে পোষ্টাল পিওনরা অত টাকা কাহাকেও ডেলিভারি দেয় না, এই কারণে দুর্ব্বৃত্তরা ঐ দোকানদারের

সহিত ঐরূপ ব্যবস্থা ক'রে কথিত ফার্ম্মের কর্ম্মচারী বা এজেণ্টের নাম দিয়ে তাদের ব্যবসার কেন্দ্রে, কোনও এক জরুরী কার্য্যের উল্লেখ করে টাকা পাঠানোর জন্যে অনুরোধ জানিয়ে "তার" করে দেয়, এবং এর পর যথারীতি ঐ দোকানের ঠিকানায় টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে টাকা এলে অপরাধীটি ঐ টাকা আত্মসাৎ করে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। সাধারণতঃ, ব্যবসা কেন্দ্রের ব্রাঞ্চ অফিসের নাম নিয়ে মূল ব্যবসায় কেন্দ্রগুলিতে ঐরূপ ভাবে টাকা পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করে 'তার' পাঠান হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ এই সকল ঠগীদের একজন, যে শহরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির হেড অফিস থাকে সেই শহর হতে অপর এক শহরের উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির ব্রাঞ্চ অফিসে 'তার' করে জানায় "অমুক ব্যক্তি অদ্যই ওখানে পৌছাবে তাকে এত টাকা দিবেন ইত্যাদি।" ব্যবস্থা মত অপর দুর্ব্বৃত্তটি ঐ ছোট শহরটিতে ঐ সময়েই হাজির থেকে, পূর্ব্ব ব্যবস্থামত টাকা নিয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রবাসী পুত্র বা ভ্রাতা বা আত্মীয়বর্গের নাম নিয়ে দেশস্থ অভিভাবকদের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করেও দুর্ব্বৃত্তরা অর্থাদি অপহরণ করে থাকে। এই সকল অপকর্ম্মে দুর্ব্বৃত্তগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে পোষ্টাল পিওনের যোগসাজসে পোষ্টঅফিস থেকেই অর্থাদি গ্রহণ ক'রে সরে পড়েছে। তবে এদেশের ডাক-কর্ম্মচারীরা অধিক ক্ষেত্রেই অত্যন্তরূপ সাধু চরিত্রেরই হয়ে থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জিলায় কোনও এক দুর্ব্বৃত্তদল এক অভিনব উপায়ে এইরূপ অপকার্য্য করতে পেরেছে। এরা টেলিগ্রাফ লাইনের ধারে একটি নির্জ্জন স্থান বেছে নিয়ে একটি টেলিগ্রাফিক যন্ত্র বসিয়ে—ঐ যন্ত্রের সহিত সরকারী টেলিগ্রাফ লাইনের

সংযোগ ঘটিয়ে বহু জাল টেলিগ্রাম বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই দুর্ব্বৃত্তদলের অপরাপর ব্যক্তি যথাসময়ে যথা-স্থানে উপস্থিত থেকে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হ'তে অর্থাদি গ্রহণ করে সরেও পড়েছে।

অপকর্ম্ম—রাহাজানি ও ডাকাতি

ডাকাতি অপরাধের প্রকৃত সংজ্ঞা অবশ্য দেওয়া কঠিন। কতিপয় ব্যক্তি আপন স্বার্থে একটি বাটী লুঠ করলে আমরা তাকে ডাকাতি বলি। কিন্তু সহস্র ব্যক্তি একত্রে একশত বাটী লুঠ করলে তাকে আমরা ডাকাতি না বলে তাকে বলি জনবিক্ষোভ। কারণ এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তারা মাত্র সংখ্যার জোরে তাদের এই অপকর্ম্মের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। অন্যদিকে প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা তাদের সংখ্যার নগণ্যতার জন্য ঐরূপ এক ব্যাখ্যা দিতে পারে নি ব'লে তাদের আমরা বলেছি ডাকাত এবং তাদের ঐ অপকর্ম্ম রোধ করতে না পারায় রক্ষী-কুলকে আমরা দায়ী করেছি। আমাদের কেহ কেহ আবার প্রথমোক্ত-দের প্রতিরোধ না করার জন্য এবং দ্বিতীয়োক্তদের (উৎপীড়ন করা হয়েছে এই অছিলায়) প্রতিরোধ করার * জন্য সরকারকে দায়ী করেছে। অপরদিকে এক রাষ্ট্রের সুশস্ত্র সৈন্যদের অপর এক দুর্ব্বল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযানকে ডাকাতি না বলে, বলা হয়েছে, যুদ্ধ। নির্ম্মমতার কথা বাদ দিলে এই তিন গোষ্ঠীর মানুষই তাদের কম বেশী সংখ্যানুযায়ী

+ এইরূপ বিতণ্ডা আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত অপস্পৃহার কথঞ্চিৎ বহির্বিকাশের প্রমাণ।

উপরোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে, মূলতঃ কিন্তু তাদের সমাধিত ক্ষতির হার ও উদ্দেশ্য থাকে হারাহারিরূপে একই।

রাহাজানিকে ইংরাজীতে বলা হয় রবারি এবং ডাকাতিকে বলা হয় ডেকয়টী। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় "রবারির" সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন (Extortion) দ্বারা অর্থ অপহরণ করার অপর নাম রাহাজানি (Robbery), এই বিশেষ অপকার্য্যে অপরাধীরা অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে কিংবা অপকর্ম্মের সময়, কিংবা চুরির বামাল লইয়া পলায়নের সময়, কিংবা বামালাদি লইয়া যাইবার প্রচেষ্টায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কাহাকেও যদি আঘাত হানে কিংবা আঘাত হানবার চেষ্টা করে, কিংবা কাহারও মৃত্যু ঘটায়, কিংবা কাহাকে বেআইনিভাবে আটক রাখে, কিংবা এমন ভাবে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে করে কি'না কেহ আশু আঘাত, মৃত্যু বা বেআইনি আটকের ভয়ে ভীত হয়ে উঠে—এই বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি সহযোগে অর্থ বা দ্রব্য অপহরণ করলে ঐ অপরাধকে রাহাজানি অপরাধ বলা হবে।"

রাহাজানি অপরাধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার ডাকাতি অপরাধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা যাক। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারায় এই অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"যদি কখনও পাঁচ জন বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে বা একত্রে রাহাজানি অপকর্ম্ম করে কিংবা উহা করার চেষ্টা করে, তা হ'লে তাদের দ্বারা কৃত ঐ অপরাধকে ডাকাতি অপরাধ বলা হবে, এবং উক্ত অপকর্ম্মকালীন যে সকল ব্যক্তি অকুস্থলে হাজির থাকবে বা উক্ত অপকর্ম্মে সহায়তা করবে, কিংবা উহার জন্যে চেষ্টা করবে, তাদের সংখ্যা যদি পাঁচ বা ততোধিক হয়, তা হলে ঐরূপ কার্য্যের জন্যে তাদের

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ডাকাত বলা হবে এবং তাদের দ্বারা কৃত ঐরূপ কার্য্য সকলকে বলা হবে ডাকাতির কার্য্য।"

এই রাহাজানি এবং ডাকাতি অপরাধ এদেশের প্রাচীন অপরাধ-সমূহের মধ্যে অন্যতম অপরাধ। এই ডাকাতি এবং রাহাজানি জলে ও স্থলে, এই উভয় স্থানেই হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ লোকে নানা কার্য্যব্যপদেশে স্থলপথে যাতায়াত করে থাকে, এজন্যে এই অঞ্চলে এই সকল অপরাধ স্থলেই সংঘটিত হয়ে থাকে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় জলা প্রদেশ (Wet District) সাধারণতঃ লোকে জলপথেই অধিক যাতায়াত করে থাকে। এই জন্যে এই সকল অপরাধ এই প্রদেশে জলপথে সংঘটিত হয়। প্রথমে জলপথের অপকর্ম্ম সম্বন্ধেই বলা যাক। এই সকল জলদস্যুরা প্রাচীনকালে ডাকাতির উদ্দেশ্যে দ্রুতগামী ছিপ ব্যবহার (বিশ ত্রিশ দাঁড়ের লম্বা ও সরু নৌকা) করত। অনেকগুলি দাঁড় সংযুক্ত থাকায় এই সকল হালকা জলযান সকল বহু ব্যক্তিকে অতি দ্রুত বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। সরকার বাহাদুরের প্রচেষ্টায় এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ জলদস্যুর দলগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গেছে; অধুনাকালে তাদের কোনওরূপ সন্ধান আর মিলে না। আজকালকার জলদস্যুরা সাধারণতঃ যাত্রী নৌকাতে ক'রে বড় বড় নদীতে ডাকাতি ক'রে থাকে। এই সকল ডাকাতরা কাছাকাছি কোনও যাত্রী নৌকা দেখলে, ঐ নৌকার যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়ে বলে—"একটু আগুন দেবে গো।" এর পর আগুন নেবার অছিলায় এরা এদের নৌকাটি যাত্রী নৌকার পার্শ্বে এনে সদলে ঐ নৌকাটিকে আক্রমণ করতে থাকে। এদেশে "বিজনা" নামক স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় জলদস্যুরা এই বিশেষ পদ্ধতিতে পদ্মা বক্ষে আজও ডাকাতি করে থাকে। এই সকল কারণে দয়াপরবশ হ'য়ে মহাজনী, গহনার বা যাত্রী নৌকার

লোকেদের "আগুন বা তামাক দেবার জন্যে" কখনও তাদের নৌকা দাঁড় করান উচিত নয়, বরং "আগুন দেবে গো বা তামুক দেবে গো" প্রভৃতি শব্দ শুনা মাত্র তাদের নৌকাটিকে বহুদূরে সরিয়ে নেওয়া উচিত। এই সকল জলদস্যুদের মধ্যে স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় সন্দার এবং গায়না দল অন্যতম। এই সকল জলদস্যুরা নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়ায় এবং মৎস্য শিকার ক'রে আহার সংগ্রহ ক'রে থাকে। এই সব দস্যুদল কতদূর ভীষণ প্রকৃতির হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"দস্যুদলের অবস্থিতির সংবাদটি পাওয়া মাত্র আমরা নদীর মোহানার দিকে আমাদের নৌকাটি চালিয়ে দিলাম। সামান্য দূর অগ্রসর হয়ে আমরা দস্যুদলের নৌকাটি দেখতে পাই। ঐ নৌকাটিতে চার বা পাঁচ ব্যক্তি সড়কি হাতে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হওয়া মাত্র এদের একজন হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'আয় দেখি কেডা তুই। দশ হাত জলের তলে মাছ রয়, ঐ মাছকেই গাঁথিয়ে তুলছি, তোকে তো হালা দেখা যায়, তোকে তো গাঁথমুই।' যুক্তি যে অকাট্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদের এই হুঙ্কারে স্বভাবতঃই আমি ভড়কে গিছলাম, কিন্তু তা মাত্র ক্ষণিকের জন্যেই।"

প্রাচীনকালে রাজরাজড়া, নবাব এবং জমিদারদের অনেকেই যুদ্ধাদি কার্য্যে বা জমি দখলের জন্যে এই সকল জলবাসীদের প্রায়ই সাহায্য নিতেন। ঐ সকল জমিদার বা রাজবংশের পতনের পর কিছুকাল যাবৎ এই সকল দল কেবলমাত্র দস্যুবৃত্তির দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করতে বাধ্য হয়।

এই জলদস্যুদের ন্যায় স্থলদস্যুরাও পূর্ব্বকালে এদেশে অত্যন্তরূপ প্রবল ছিল। স্থলবিশেষে এদের দলপতিরা রাজার ন্যায়ই সমাদর বা সম্মান পেয়েছে। পূর্ব্বকালে জমিদাররা এদের বার্ষিক কর পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছেন। বৃটিশাধীন ভারতের প্রথম দিকটাতেও এদের কম

প্রতাপ ছিল না। শুনা গেছে বর্ত্তমানকালের কোনও কোনও নামজাদা জমিদারবংশের পূর্ব্বপুরুষরা পর্য্যন্ত ডাকাত ছিলেন। এই সকল ডাকাতেরা ডাকাতি করলেও গরীবদের সম্পত্তি এরা কমই অপহরণ করতেন। এদের লক্ষ্য সর্ব্বদাই থাকতো বড় বড় জমিদার বাড়ী বা মহাজনদের গদির দিকে। এদের একমাত্র বুলি ছিল, "মারি তো গণ্ডার লুঠি ত ভাণ্ডার।" ভাণ্ডার শব্দটি দ্বারা ট্রেজারী বা রাজভাণ্ডার বুঝায়। এই সকল প্রচলিত কিংবদন্তি বা চলতি কথা হ'তে তৎকালীন ডাকাতদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। এদের কেহ কেহ ধনী লোকের অর্থ লুটে এনে ঢোল সহরত ক'রে গরীবদের অর্থ দান করেছেন—এদেশের ডাকাতদের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কাহিনীও শুনা গেছে। এদের প্রতি দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সহানুভূতি থাকায় এদের ধৃতিকরণ বা গ্রেপ্তার করা প্রাচীনকালে অত্যন্তরূপ দুঃসাধ্য ছিল। কালক্রমে ব্রিটিশ শাসন এদেশে কায়েমী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ডাকাত দলও নিঃশেষিত হয়েছে। পূর্ব্বকালের ডাকাতি সম্বন্ধে অশীতিবর্ষ বয়স্কা এক ঠাকুরমাতার নিকট আমি এইরূপ এক কাহিনী শুনেছিলাম।

"৭৫ বৎসর পূর্ব্বে তোদের এই বাড়ীতে যখন আমি বৌ হয়ে আসি তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ। সেদিন তোদের বার মহলের দেউড়ীর পাশের পাঁচিলটা ঐরূপভাবেই আমি ভাঙা পড়ে থাকতে দেখেছি। কেমন ক'রে অত উঁচু পাঁচিলটা ভেঙে পড়েছিল, সেই সম্বন্ধে আমি আমার শাউড়ীর কাছে গল্প শুনেছিলাম। আমি তখনও একটি ছোট্ট মেয়ে তাই তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদের সঙ্গে আমাকেও কত সত্যিকারের গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন। তাঁর কাছে শুনা সেই গল্পটা তোদের বলে যাচ্ছি, শুনে যা—

'হঠাৎ একদিন এক ঝাকড়া চুলো কপালে সিঁদুর মাথা, বেঁটে কালো হোঁতকা গোছের লোক ভূর্জ্জিপত্রের উপর লেখা এক টুকরা চিরকুট-পত্র এনে কর্ত্তামশাইএর হাতে দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম জানাল। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল—'এবার হতে প্রতি বৎসর কালীপূজার রাত্রে আপনার বাড়ীতে আমার লোক ধন্না দেবে, আশা করি বাৎসরিক দেয় সিধা এবং পাঁচকুড়ি টেকা পাঠিয়ে বাধিত হবেন, তা না হলে বাধ্য হয়ে আমি নিজেই আসব। রতনপুরের বড়তরফদের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করে ইহার অন্যথা করবেন না, ইত্যাদি।' এইরূপ ভীতিপ্রদর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তেনা (কর্ত্তামশাই) তাঁর তাঁবেদার কয়েকজন বাছা বাছা লাঠিয়ালদের মহাল থেকে আনিয়ে নিয়ে দেউড়ীতে এনে জমা করলেন। এর পর কয়েকদিন পরেই এলো সেই কালীপূজার অমানিশি, মধ্যরাত্রের মহাপূজা সমাপন হয়েছে, আমরা যে যার ঘরে এসে শয়নের উপক্রম করছি, এমনি সময় একটা বিকট শব্দে আমরা চমকে উঠলাম। দূর হ'তে একটা বীভৎস আওয়াজ আসছিল, 'রে রে রে রে-এ।' জানালা খুলে সভয়ে চেয়ে দেখলাম, বাইরের পাঁচিলের ওপারে মশালের আগুনের গাঁতি লেগে গেছে। প্রায় আশী জন ডাকাত মশাল, সড়কী ও তরোয়াল হাতে 'রে রে রে' শব্দে এগিয়ে আসছে। ব্যাপার বেগতিক বুঝে আমরা অন্দর মহলের দ্বিতলের উপরকার চাপা সিঁড়িটা বন্ধ করে দিই, আর গহনাপত্র যা কিছু চোর-কুঠরীটার মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে থাকি। ঐ যে চিলের ছাদটা দেখছিস, ওর ওপরেও আর একটা ঘর ছিল, সেবারের আশ্বিনের ঝড়ে সেটা পড়ে গিয়েছে। ওটা দেখতে ছিল ঠিক একটা উঁচু মিনারের মত শুনেছি ওর ওপর দাঁড়ালে নাকি গঙ্গা পর্য্যন্ত দেখা যেত। আমাদের তীরন্দাজরা ঐ মিনারের উপর উঠে তীর আর গুলতি ছুড়ে ডাকাতদের

বাধা দিতে থাকে। ওদিকে আমাদের বিশ্বস্ত লাঠিয়ালরাও নীচের উঠানে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছে, এমন সময় ঢেঁকিকলের সাহায্যে দেউড়ীর পাশের অত উঁচু পাঁচিলটা ভেঙে ফেলে ডাকাতরা বার-বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। চিলের ঘরে যে বাঁকা বাঁকা মরচে ধরা ভারি তরোয়াল-গুলো দেখেছিস্, ঐগুলোই হাতে করে বাড়ীর ছেলেরাও সেদিন যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়িয়ে আমার শ্বশুরমশাই তখন শিঙ্গা ফুঁকে অদূরের বাগ্দীপাড়ার প্রজাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, এই ডাকাত পড়ার সংবাদ। ওদিকে কাছারীর একজন সওয়ার রওনা হয়ে গেছে সদরের তশীলদারকে ও তাঁর বরকন্দাজদের খবর দিতে। কিন্তু এত কাণ্ড করেও ডাকাতদের কেউ আটকে রাখতে পারে নি। দুচারটা হত্যাকাণ্ড সমাধান করে তারা অন্দর মহলের বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে সুরু করে দিল। বাঁকা সিঁড়ির উপরকার চাতালের উপর বস্তা দশেক সরষে রাখা ছিল। আমার দিদিশাশুড়ী ছুটে এসে সেই বস্তা বস্তা সরষে সিঁড়ির উপর ঢেলে দিতে লাগলেন। হুড় হুড় করে সরষে নীচে গড়িয়ে পড়ছিল। এই সরষের উপর পা পড়ায় ডাকাতদের সব কয়জনই পা হড়কে একে একে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ে আহত হল। ইতিমধ্যে হৈ হৈ করতে করতে এবং কালীমায়ী কী জয় বলে বাগ্দীপাড়ার দুশো ঘর প্রজাও দা কুড়ুল ও সড়কী নিয়ে হাজির। শুনেছি গৌরে বেদে ডাকাতদের জীবনের সেই প্রথম পরাজয়। আমাদের মেয়ে পুরুষের সমবেত সাহস ও বীরত্বই সেইদিন আমাদের মান ও প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল। আমার দিদিশাউড়ীর সাহসের কথা শুনে তোরা অবাক হচ্ছিস্, না? সেকালের মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্যে এইরূপ সাহস প্রায়ই দেখাতে হোত। এই সে দিনও আমার শ্বশুরের এক বুড়ী ঝি চোরকে ঘরে ঢুকতে দেখে, ঘরের মশারীর চারটে খুঁট

তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে, মশারীটা চোরের ঘাড়ে জালের মত ক'রে চেপে দিয়ে, তার উপর নিজে চেপে বসেছিল। চেঁচামেচি শুনে ঝিএর ঘরে এসে দেখি চোরটা দম বন্ধ হয়ে আধমরার মত হয়ে শুয়ে রয়েছে, এমন কি তার নড়বার শক্তি পর্য্যন্ত নেই।"

শুনা গেছে, পূর্ব্বকালের ডাকাতরা নিম্নশ্রেণীর হলেও অত্যন্তরূপ কালীভক্ত ছিল। ডাকাতির জন্যে বহির্গত হবার পূর্ব্বে এরা কালী পূজা করে তবে বেরুত।* এদের কোনও কোনও দল নাকি এই পূজায় নরবলিও দিয়েছে। অনেকের মতে যুদ্ধ-বন্দীদের ধরে এনে বলি দেওয়ার পদ্ধতি হতেই এই নরবলির সৃষ্টি হয়। এই নরবলি সম্বন্ধে এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে আমি একটি গল্প শুনেছিলাম, ঐ ভদ্রলোকটি আবার তাঁর ছোটবেলায় অপর এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখে ঐ গল্পটি শুনে-ছিলেন। গল্পটি শেষোক্ত ভদ্রলোকের ছোটদাদুর জীবনের একটি কাহিনী অবলম্বনে বলা হয়েছে। বিবৃতির আকারে উক্ত গল্পটি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"ঐ সময়ে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ক'রে ভারতের দূরবর্ত্তী তীর্থস্থানগুলিতে আমরা যাতায়াত করতাম। কাশী হতে ফিরতিমুখে আমরা গঙ্গার এক পাড়ে এসে বিশ্রাম করছিলাম। পড়শীরা আমাকেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনবার জন্যে অনুরোধ জানায়। আমি জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় জন চার-পাঁচ ষণ্ডামার্কা লোক আমাকে ধরে ফেলে। তারা আমার মুখ ও হাত গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে চেংদোলা করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে সুরু ক'রে দেয়। এর পর তারা একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর পাড়ে এনে আমাকে ধপাস করে নামিয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে দেখি একটা বটগাছের তলায় প্রকাণ্ড একটা কালী-মূর্ত্তি, লকলকে তার জিভ, হাতে তাঁর সত্যকার একটা কাতান এরা যে

আমাকে মায়ের কাছে বলি দিতে এনেছে তা বুঝতে আমার বাকী থাকে নি। আশেপাশে চেটাই পেতে প্রায় জন যাটেক লোক বসে বসে তামুক খাচ্ছিল। অদূরে হাঁড়কাঠ আর তার পাশে রাখা মাজা তোলা খাঁড়াটার দিকে চেয়ে চেয়ে আমি শিউরে উঠছিলাম। এর পর রাত্রি দুইটার সময় পূজার পর এদের জন দুই লোক, আমার বাঁধন খুলে দিয়ে হাতে ধরে আমাকে পুকুর পাড়ে নিয়ে এলো, স্নান করাবার জন্যে। এদের একজন আমাকে টেনে নিয়ে জলেও নেমে পড়ল। সৌভাগ্য ক্রমে আমার উত্তমরূপ ডুব সাঁতার জানা ছিল, দমও ছিল আমার অসম্ভব। ডুব দিবার অছিলায় ডুব মেরে এক ডুবে আমি পুকুরের এপারে এসে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটা বড় গাছের মগডালে উঠে নিঃসাড়ে বসে থাকি। ডাকাতরা মশাল জেলে বনে বাঁদাড়ে আমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে যায়। ইত্যবসরে আমি চুপি চুপি নেমে এসে পা টিপে টিপে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে পরে একদৌড়ে গঙ্গার ধারে এসে আমাদের নৌকাটায় উঠে পড়ি। মা কালীরই দয়ায় সে যাত্রা আমার প্রাণটি কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিল, তাই তোমাদের এই গল্পটাও শুনাতে পারলাম, নইলে বন্ধুদের সকলে মনে করত আমাকে বাঘেই নিয়ে গেছে।"

এইরূপ কাপালিক ডাকাতদের কাহিনী বাঙ্গলার ঘরে ঘরে শুনা যায়, জানি না এর মধ্যে কতটা সত্য আছে। তবে জনপ্রবাদ মাত্রকেই অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত। এই সকল ডাকাতদের কালীভক্তির সুযোগ নিয়ে কোনও কোনও প্রাচীনকালীন শ্যামাঙ্গী কুলবধূ এলোচুল করে উলঙ্গ অবস্থায় দা' বা খাঁড়া হাতে এগিয়ে এসে ডাকাতদের প্রতিরোধ করেছে এবং ডাকাতরা এই দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে "মা মা" বলে প্রণাম জানিয়ে স্থান ত্যাগ করেছে, এইরূপ অনেক কাহিনীও এদেশে শুনা যায়। এই সকল কাহিনীর মধ্যে কিছুটাও কি সত্য নেই? জানি

না, আছে কি'না, তবে এ যুগের কোনও কোনও ডাকাত দলের মধ্যে যে অত্যন্তরূপ কালীভক্তি দেখা গেছে, তা ঐতিহাসিক সত্যাবিধায় উহা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রাক্তনকালের জলদস্যুগণ দ্রুত গমনাগমনের জন্যে যেমন ছিপ-নৌকা ব্যবহার করত, স্থলদস্যুরা তেমনি দ্রুত গমনাগমনের জন্যে একপ্রকার "রণ-পা" ব্যবহার করতো। রণ অর্থে এখানে যুদ্ধ বুঝায়। রণ-পা দুই খণ্ড লম্বা পাতলা বাঁশ দিয়ে তৈরী হয়। এই বাঁশের মধ্যস্থলে একটা করে গাঁইট থাকে। এই গাঁইট দুইটিতে পা দিয়ে অনেক উপরে উঠে ডাকাতরা এই রণ-পার সাহায্যে ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে ধাবিত হ'তে পারত। এই রণ-পার সাহায্যে এরা সদলে খাল, বিল, মাঠ, ধেনো জমি ও কাশবন ভেদ করে অতি দ্রুত অন্তর্দ্ধান হ'তে সক্ষম ছিল। এই রণ-পা সম্বলিত ডাকাতদের চলবার সময় মনে হত যেন বড় বড় দৈত্য বিরাট বিরাট লম্বা পায়ের সাহায্যে চলতে সুরু করেছে। এই রণ-পা ব্যবহার অত্যন্তরূপ অভ্যাস সাপেক্ষ হয়ে থাকে। ফিন্ জাতি ব্যতীত যেমন অন্য কোনও জাতি বরফের উপর "স্কিই" ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না, বাঙ্গালী ছাড়া এই রণ-পা'ও তেমনি অন্য কেহ ব্যবহার করতে পারে নি। এই রণ-পা ব্যবহারে দক্ষ সুশিক্ষিত ডাকাতদের এ যুগের মেকানাইজড্ ট্রুপের সহিত তুলনা করা চলে। বাঙ্গালী রাজাদের আমলে সৈন্য-সামন্তরা গতির কারণে এই রণ-পা ব্যবহার করত, এই কারণে এই কৃত্রিম পা'কে রণ-পা বলা হয়। প্রাচীন ভারতেও যুদ্ধের রীতি ছিল কতকটা এইরূপ। প্রথমে (প্রথম লাইনে) অধুনাকালের বৃহৎ বৃহৎ ট্যাঙ্কের ন্যায় বর্ম্মাবৃত হস্তীচমূ তাদের বিরাট বিরাট দেহ নিয়ে হুড়মুড় করে সকল বাধা বিপত্তি চুরমার করে দিয়ে পররাজ্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলত এবং এই জীবন্ত ট্যাঙ্কবাহিনীর পিছন পিছন ছুটে চলত রথ ও অশ্ববাহিনী, আজকালকার

মোটরবাহিনীর ন্যায়। কিন্তু এই যুদ্ধরীতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কঠিন ভূমি ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে কার্য্যকরী হলেও, বাঙ্গালার স্থলপথ বিহীন ভূমি এবং জলা মাঠ-ঘাটগুলিতে এইরূপ যুদ্ধপদ্ধতি ছিল একেবারে অচল, এই কারণে এদেশে রাজারাজড়ার সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত গমনাগমনের জন্যে জলপথে ছিপ-নৌকা এবং স্থলপথে এই রণ-পা'র সাহায্য নিতে হ'ত। এক কথায় এই রণ-পা পদ্ধতি বাঙ্গালী যোদ্ধাদের এক নিজস্ব জিনিস। বলা বাহুল্য, বড় বড় রাজবংশের পতনের পর—তাঁদেরই সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে

পূর্ব্বকালে এই সকল ডাকাতদল গড়ে তুলেছিল। এই রণ-পা শব্দটি এবং ডাকাতদল দ্বারা উহার একচেটিয়া ব্যবহার ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে। উপরের এই চিত্রটি হতে রণ-পা সম্বন্ধে সম্যকরূপ ধারণা করা যাবে।

আমি অনুসন্ধানে জেনেছি যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভকালে যে সকল ডাকাত দলের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল জমিদারদের বরখাস্ত করা বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালগণ। পাঠান রাজত্বের সময় এই সকল জমিদার আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন, এই কারণে বংশপরম্পরায় তাঁদের এই সকল বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল বংশকে জমি দান করে স্বরাজ্যে বসবাস করাতে হ'ত। বংশপরম্পরায় এদের পেশাই ছিল জমিদারদের হয়ে লড়াই করা। মোগল শাসনকালে জমিদারদের আভ্যন্তরিক ক্ষমতা সামান্য পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হলেও, এই সকল লড়াকুদের নিজ প্রয়োজনে তাঁরা বহুকাল পর্য্যন্ত ভরণপোষণ করে এসেছেন। ইংরাজ শাসনকালেও কিছুকাল যাবৎ এই সকল জমিদারদের হাতেই দেশের পুলিশের (শান্তিরক্ষার) ভার ন্যস্ত ছিল। এরপর যথারীতি পুলিশ ও শাসন বিভাগ স্থাপিত হওয়ার পর জমিদারদের নিকট এদের কোনও প্রয়োজন থাকে নি। এই সকল বরখাস্ত লাঠিয়ালদের অনেকেই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যে তৎকালীন ডাকাতদের সর্দ্দারদের নিকট কর্ম্মে বহাল হ'তে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে এই সময় বাঙ্গালার জেলায় জেলায় অনেকগুলি দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতদল সংগঠিত হয়েছিল। আজকাল কোনও কোনও স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় ডাকাতরা যে এই সকল যোদ্ধবংশেরই অযোগ্য বংশধর তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাগ্দী জাতির কথা বলা চলে। এই বাগ্দী জাতির কয়েকটি শাখা অধুনাকালে তাদের আক্রমণাত্মক স্বভাবের জন্যে স্বভাবদুর্ব্বৃত্ত জাতির (Criminal Tribe) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বাগ্দীজাতি একদা সমর ব্যবসায়ী জাতি সকলের মধ্যে অন্যতম ছিল। মারাঠাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খান তাঁর পরিবারবর্গকে নিরপত্তার জন্যে যে সময়

নাটোর রাজপরিবারের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সময় অর্দ্ধস্বাধীন নাটোর সরকারের অধীন সেনাবাহিনী পশ্চিমবঙ্গের বাগ্দী সৈন্য এবং বিহারের ভোজপুরী সৈন্য দ্বারা গঠিত ছিল। এই বাগ্দী জাতীয় সৈন্যদের উপর অত্যন্তরূপ আস্থা থাকার কারণেই নবাব আলীবর্দ্দী খান এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের বাগ্দী সৈন্যদের বীরত্ব ঐতিহাসিক মাত্রই অবগত আছেন। এইরূপ সৈন্যের সাহায্যে বিষ্ণুপুর বহুদিন পর্য্যন্ত তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কামান সকল এই বাগ্দী সৈন্য দ্বারাই পরিচালিত হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বাগ্দী জাতীয় লোকদেরই কোনও কোনও দল পরবর্ত্তীকালে ডাকাত দলে পরিণত হয়েছিল। আবহমানকাল ধরে অর্জ্জিত যুদ্ধস্পৃহা এরা আজও বোধ হয় ত্যাগ করতে পারে নি, তাই এতদিনের চেষ্টাতেও এই সকল স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতির স্বভাব বদলান যায় নি। * আমার মতে এই সকল স্বভাব-দুর্ব্বৃত্তদের সামরিক বিভাগে ভর্ত্তি ক'রে এদের মজ্জাগত যুদ্ধস্পৃহার উপশম ঘটিয়ে এদের স্বাভাবিক করা সম্ভব। এই সকল উপজাতীয় লোকদের অনেকে পরবর্ত্তীকালে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলেও তাদের অন্তর্নিহিত যুদ্ধস্পৃহা তারা হারায় নি। আজও জমিজমার দখল নিয়ে যখন তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়, তখন তারা এই দাঙ্গার মধ্যে যুদ্ধবিদ্যাই প্রদর্শন করে থাকে। গ্রাম হ'তে দূর প্রান্তরের মধ্যে এসে এরা যুদ্ধ করে। একজন হয় তো এপার হ'তে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, "করিম ভাই সামাল নাও, না-আ-

---

* ইহার অপর দৃষ্টান্ত হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্ম্মী স্বভাব বা দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় বেকার জাতি। এরা পূর্ব্বে টিপুসুলতানের অন্যতম সেনা ও সেনানি রূপে বহাল ছিল। কিন্তু ঐ রাজ্যের পতনের পর হতে আজও পর্য্যন্ত তারা ডাকাতি করেই বেড়ায়।

ক, নাক লক্ষ্য করে কেঁচা ছুড়লাম।" করিম ভাই এর পর তাড়াতাড়ি বাঁশের তৈরী ঢালের সাহায্যে নাক বাঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "রাধু খুড়ো, চোখ বাঁচাও, ভাইরে চোখ, এই ছুড়লাম, সড়কী, সা-মা-সামাল।" এই ভাবে এরা খালের ধারে বা প্রান্তরে এসে যুদ্ধ করলেও, এরা কখনও গ্রামের মধ্যে এসে শান্তি ভঙ্গ করে নি। পারিপার্শ্বিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে মাত্র এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে থাকে, উহার মধ্যে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক দোষ যারা দেখে থাকেন তারা ভুলই করেন। এই সকল উপজাতীয় লোকেরা সড়কি ব্যতীত এক প্রকার কানা ভাঙা পিত্তলের বা কাঁসার থালিও ব্যবহার ক'রে থাকে। এই সকল কানা ভাঙা থালি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন জোরে এরা ছুড়ে দেয় যে ঐ থালি ঘুরতে ঘুরতে বহুদূর পর্য্যন্ত এসে যে কোনও লোকের মুণ্ড ছিন্ন করতে সক্ষম হ'তে পারে।* পূর্ব্বকালে ডাকাতরা, যোদ্ধারাও, এইরূপ কানা ভাঙা থালি যুদ্ধবিগ্রহের সময় ব্যবহার করেছে। এই সকল বিষয় অনুধাবন করলে বর্ত্তমান কালের উপজাতীয় ডাকাতদলের জন্ম কাহিনী সম্বন্ধে অনেক কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল যুদ্ধব্যবসায়ী জাতীয় লোকেদের যে সকল দল চাষবাসের কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে তাদের জীবনধারা বদলাতে পারে নি, তারাই পূর্ব্বকালের ডাকাতদলের এবং বর্ত্তমান কালের কোনও কোনও স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতির সৃষ্টি করেছে।

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভকালেও এই সকল সামরিক জাতির লোকদের দ্বারা গঠিত বহু ডাকাতদল বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ঘুরাফিরা করত। এই সকল ডাকাতদের মধ্যে গোঁরে বেদে ও রঘু ডাকাত ছিল

---

* দড়ির শিঁটের সহিত ইষ্টক খণ্ড সংযুক্ত করে এবং উহা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন ভাবে ছুঁড়ে থাকে যে উহা গুলির মতই বেগে ছুটে এসে মানুষ হত্যা করতে সক্ষম হয়।

অন্যতম। এদের উভয়েরই বাস ছিল ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিশহর পরগণায়। নৈহাটীর সন্নিকটে মাদরাল গ্রামের প্রান্তদেশে রঘু ডাকাতের কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। স্থানীয় লোকেদের ধারণা, এখনও না'কি আশে-পাশে জঙ্গলা জমিগুলা খুঁড়লে ডাকাতদের পুঁতে রাখা গুপ্ত ধন পাওয়া যেতে পারে।

ঐ সময় কোনও দূরগ্রামে যেতে হ'লে গ্রামবাসিগণ প্রায়ই উইলাদি লিখে বা জমিজমার স্থায়ী বিলি ব্যবস্থা করে তবে বাড়ীর বার হত, কারণ এঁদের প্রতিটি মুহূর্ত্তেই ডাকাতের বা ঠ্যাঙ্গাড়েদের হাতে প্রাণ-নাশের আশঙ্কা রেখে এই সময় এঁদের পথ চলতে হ'ত। এখনও এমনি অনেক ঠ্যাঙ্গাড়ে মাঠ বা ডাকাতে কালীর কাহিনী গ্রামে গ্রামে শুনা গিয়ে থাকে। এই সকল ডাকাতরা কোনও জমিদার বাড়ীতে আহার করতে এলে কখনও নুন খেত না, অর্থাৎ কি'না এরা নুন বিহীন আহার করে যেত, কারণ এরা জানত এই সকল জমিদারদের সহিত চিরদিন তাদের ভাব নাও থাকতে পারে। গুপ্তভাণ্ডারের সন্ধানে এরা পুরুষদের খোঁটায় বেঁধে কলকের ছ্যাকা দিয়েছে কিন্তু মা জননীদের গায়ে হাত দেওয়া তো দূরের কথা তাঁদের গাত্র হ'তে একটি গহনা খুলবারও কখনও প্রয়াস পায় নি। কিন্তু অধুনাকালের ডাকাতদলের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। আধুনিক ডাকাতরা কোনও কোনও সময় স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে অকথ্য অত্যাচার ক'রে থাকে।

অধুনাকালের ডাকাতদলের মধ্যে স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় তুঁতিয়া মুসলমান এবং বাগ্দী জাতি ও ডোম জাতি অন্যতম। এরা আজও ডাকাতির সময় ঢেঁকিকল ব্যবহার করে থাকে। এই ঢেঁকিকল একটি সাধারণ ধান ভাঙা ঢেঁকিমাত্র। পল্লীগ্রামের ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের বাড়ীতেই ইহা দেখা যায়। এই দুর্ব্বৃত্তগণ কোনও এক গরীবের

ঢেঁকিঘর হ'তে একটি ঢেঁকি অপহরণ ক'রে উহা তিনটি বাঁশের খুঁটির সাহায্যে ভূমি হ'তে কিছু উপরে ঝুলিয়ে দেয়। এইরূপে তৈয়ারী যন্ত্রকেই বলা হয় ঢেঁকিকল। য়ুরোপীয় যোদ্ধারাও প্রাচীনকালে দুর্গপ্রাচীর ভগ্নের জন্যে এই ধরণের এক যন্ত্র ব্যবহার করত। ইহাকে বলা হত Battery Ram। নিম্নে এই ঢেঁকিকলের প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল। এই ঢেঁকি-

কল ধনী ব্যক্তির গৃহের দুয়ারের সামনে এনে এরা ঐ ঝুলানো ঢেঁকির দড়ি ধরে কিছুটা দূর টেনে এনে উহা সবেগে দুয়ারের উপর ঠেলে দিত। এই ঢেঁকির পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাতের ফলে যে কোনও দুয়ার বা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে।
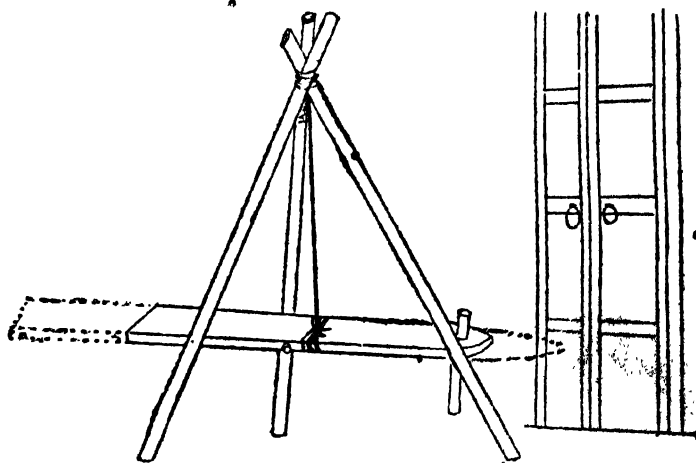
তুঁতিয়া মুসলম্যানরা ঐরূপ ধান ভাঙা ঢেঁকির সাহায্য নেওয়া ছাড়া দেওয়ালের খাড়া ব'য়েও উপরে উঠে থাকে। এইভাবে এদের এক-জন বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে সদরের দরজা খুলে দিলে দলের বাকি লোকেরা চীৎকার করতে করতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে। এরা

ডাকাতির পূর্ব্বে আশ-পাশের গৃহস্থদের বাটীর দরজার কড়াগুলা দড়ির দ্বারা বেঁধে রাখে, যাতে ক'রে কিনা চীৎকার শুনলে তাদের কেহ আক্রান্ত লোকেদের সাহায্যে আসতে না পারে। এরা তরোয়াল মশাল ও লাঠির সাহায্যে ডাকাতি করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা ছোট ছোট শিশুদের মাটিতে উপুড় করে ফেলে তাদের পিঠে পা রেখে কোমরের সোনার গোট প্রভৃতি অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়েছে। এই ডাকাতদল মেয়েদের গাত্র হতেও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নিয়েছে। পলায়নের সময়, "মাছি ঘন জাল গুটো"—এই শব্দটি তারা ব্যবহার করে থাকে। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এইরূপ, "মাছিরা উঠছে দলে দলে, এইবার জাল গুটোও, অর্থাৎ কি'না এইবার সরে পড়।" এই সকল ডাকাতেরা অভিযানের সময় বা প্রত্যাগমনের সময় শিয়ালের অনুকরণে চীৎকার করে পরস্পর পরস্পরকে পরস্পরের সান্নিধ্য জানিয়ে দিয়ে থাকে। এই তুঁতিয়া মুসলমানের ন্যায় মঘেয়া ডোমরাও এইরূপ করে থাকে। সাধারণতঃ যশোহর, মেদিনীপুর, নদীয়া, হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলায় এরা ডাকাতি করে বেড়ায়। হিন্দুদের মধ্যে পোদ, বাগ্দী কেওরা ও থারু জাতীয় লোকেরাও ডাকাতি করে। হিন্দি ভাষী হিন্দুদের মধ্যে চাম্পারণের কুর্মী, পালওয়ার, দুসাদ এবং রায়বোধলী, বারাবাংকির পাশীরাও বাংলা দেশে ডাকাতি ক'রে বেড়ায়। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং মানভূমের ভীমজী এবং বিহারের ভোব নামক সমরপ্রিয় জাতিরাও ডাকাতি করে বেড়ায়। এরা ডাকাতির জন্যে তরোয়াল, সড়কি, কুড়ুল, মশাল এবং সময় সময় বন্দুক ডিনামাইটও ব্যবহার ক'রে থাকে। এ ছাড়া এরা একপ্রকার মুখোসও ব্যবহার করে থাকে। এদের কেহ কেহ সারা মুখময় এমনভাবে আলকাতরা মাখে, যাতে ক'রে কিনা কেহ তাদের চিনতে না'পারে। আক্রমণ,

প্রত্যাগমন এবং গমনাগমনের সময় এরা যে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকে, তা হ'তে এ বেশ বোঝা যায় যে এরাই পূর্ব্বকালের যোদ্ধদল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি মাত্র এইরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ উদ্ধৃত করা হ'ল—"ব্রো" অর্থাৎ কিনা "যাও" (quick march)। "বে ব্রো" অর্থাৎ কিনা "শীঘ্র যাও" (Double march)। এ ছাড়া এই স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে অঙ্গুলি বা হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে।

পুরাকালের ডাকতদলের মধ্যে ঠগী ও পিণ্ডারী ডাকাতদল ছিল অন্যতম। এরা সাধারণতঃ পথিকদেরই অর্থাদি অপহরণ করেছে। এরা একটা রুমাল, গামছা বা বস্ত্রখণ্ডের একটি খুঁটে একটা পয়সা বেঁধে ঐ খুঁটটি আক্রান্ত ব্যক্তির গলদেশে এমনভাবে ছুড়ে দিত যাতে করে কি'না উহা ফাঁসের আকারে গলায় আটকে যায়। এইভাবে এরা মানুষ হত্যা করে তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নিত। এদের দলপতিগণ সংস্কৃত শব্দে আদেশ প্রদান করতেন। এঁদের দমনের জন্যে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি বিশেষ ধারাও সংযুক্ত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই ডাকাতদল এক্ষণে নিঃশেষিত হয়েছে।

সে যুগের অনেক জমিদাররাও না'কি এদের গোপনে সাহায্য করেছে। ভুল ক'রে এরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের মনিব জমিদারের জামাতাকেই পথিমধ্যে হত্যা ক'রে তার সোণার হার ও আংটি তারই শ্বশুরকে এনে দিয়েছে, এমন কথাও শোনা গেছে।

পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক ডাকাতদল আছে, যারা কিনা জীবজন্তুর ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে পরস্পরকে পরস্পরের অবস্থিতি জানিয়ে দেয়। দলপতিরা প্রায়ই ইহার দ্বারা দলের লোকেদের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে জড় হবার জন্যে নির্দ্দেশ দেয়। এমন অনেক স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতি আছে; যারা কি'না আজও এই ধরণের ডাক ডেকে

অপকর্ম্ম করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলার বাউরি জাতির কথা বলা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমার বাস ছিল বর্দ্ধমান অঞ্চলের এক পল্লীগ্রামে। বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা--আমি তখন বালক। বাইরের ঘরে বসে পিতাঠাকুর পাড়ার মুখুয্যে মশাইএর সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। হঠাৎ একটা শিয়ালের ডাক শুনা গেল, 'হুয়া-য়া-য়া, হু-উ-উ হুয়া।' মুখুয্যেমশাই চমকে উঠে বাবাকে শুধালেন, 'উঁহু বাঁড়ুয্যে, গতিক সুবিধের নয়। এ যে এক শিয়ালীর ডাক!' এক শিয়ালীর ডাক নাকি এক ভয়াবহ ব্যাপার। সাধারণতঃ কখনও মাত্র একটা শিয়াল ডাকে না, একটা ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক শিয়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠে। আসলে কোনও এক দস্যু সর্দ্দার শিয়ালের ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে, তার অনুচরদের কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমা হ'তে বলছিল। মুখুয্যেমশাইয়ের কথায় বাবা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চাপা সিঁড়ি বন্ধ করলেন। মুখুয্যেমশাইও আর দেরী না করে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। সকালে উঠে শুনতে পেলাম, গাঁয়ে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। ডাকাতরা পাড়ার মনো স্যাকরাকে কেটে দুইখানা ক'রে তার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে।"

হিংস্র জীবজন্তুমাত্রই শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ করবার পূর্ব্বে একটা বিকটরূপ ডাক ডেকে নেয়। এই হাঁক বা চীৎকার শুনে দুর্ব্বল জীবরা এমনই নিস্তেজ এবং ভীত হয়ে পড়ে। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, এই অবস্থায় তারা পলায়নে পর্য্যন্ত অক্ষম হয়ে পড়ে, অর্থাৎ কি'না রক্ত তাদের হিম হয়ে যায়—স্নায়ুর শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলে, এবং এর অল্পকাল পরেই এই হিংস্র জীবরা তাদের শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে' তাদের বধ ক'রে থাকে। ব্যাঘ্র সিংহাদি তাদের

সিংহনাদ এই কারণেই ক'রে থাকে। এদেশের ডাকাতদলও এইরূপ রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে। এরা কোনও গৃহস্থ বাড়ীতে হানা দিবার পূর্ব্বে এই সব জীবজন্তুর অনুকরণে মুহুর্মুহুঃ হাঁক দিতে থাকে। এই হাঁককে এরা "জীর্গা" হাঁক বলে থাকে। চলতি কথায় এই হাঁককে বলা হয় "জীর্গা দেওয়া"। যথা—"আবা আবা আবা-আ। ইয়া-য়া-য়া—" কিংবা "ও ও ও ো, ো,—এ-এ-এ-ৈ"—কিংবা "রে রে রে-এ-এ—" ইত্যাদি। এ দেশের নমঃশূদ্র, বাগ্দী প্রভৃতি সমরপ্রিয় জাতিরা প্রায়ই এইরূপ জীর্গা হাঁক হেঁকে থাকে। হঠাৎ এদের কাউকে দেখে কোনও গৃহস্থ যদি জিজ্ঞাসা করে, "কেডা রে?" তাহলে উত্তরে এরা এইরূপ বলে থাকে, "তোর যম্" বা "তোর বাবা" ইত্যাদি।*

আজকালকার কোনও কোনও ডাকাতদল এক অভিনব উপায়ে গৃহস্থদের দরজা খুলে দিতে প্ররোচিত করে। রাত্রিকালে এদের একজন এগিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে পোষ্টাল পিওনের অনুকরণে চেঁচাতে থাকে, 'বাবু, টেলিগেরাম, টেলি আছে—এ—' টেলিগ্রাম এ দেশে সাধারণতঃ দুঃসংবাদই বহন ক'রে আনে, শুভকার্য্যে টেলিগ্রাম করার রীতি এদেশে প্রচলিত নেই। টেলিগ্রাম আসার সংবাদ শুনা মাত্র গৃহস্থগণ (দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে) তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দরজা খুলে দেয়। এর পর দরজা খোলা পাওয়া মাত্র ডাকাতরা সদলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের একটা দল যাত্রা বা কবিদল সেজে, গ্রামের প্রান্তরে নাচ বা যাত্রা বসিয়ে, গ্রামের

---

* এদেশে এমন অনেক শীর্ণকায় লোকও দেখা যায় যাদের কি'না ডাকাত মনে করতে কারও মন চাইবে না। কিন্তু দুই এক ভাঁড় তাড়ি পেটে পড়া মাত্র এরাই হয়ে উঠে দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির ডাকাত—এই সময় তাদের স্বভাবগত শান্ত স্বভাব আর থাকে না।

অধিকাংশ ব্যক্তিকে ঐ স্থানে আটকে রাখে এবং এই অবসরে এদের অন্য দল গ্রামের অপর সীমানায় অবস্থিত একটি ধনী গৃহস্থের বাটীতে হানা দিয়ে কার্য্য সমাধা করে। কখনও এদের একজন গোয়েন্দা সেজে পুলিশকে খবর দেয় কোনও এক গ্রামে ডাকাতি হবে। পুলিশ এই খবর পেয়ে, তাদের সমুদয় দল বল সহ সেই গ্রামে এসে জমা হয়। ইত্যবসরে ঐ ডাকাতদল অপর আর এক গ্রামে হানা দিয়ে সারারাত লুঠতরাজ করতে থাকে। শহরের অপরাধীরা আজকাল এক অভিনব উপায়ে লুঠতরাজ বা রাহাজানি ক'রে থাকে। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। মাসাধিক বস্ত্রের অভাবে আমার ব্যবসা যাবার দাখিল হয়েছে। ইতিমধ্যে এক দালালের মারফৎ খবর পাই অমুক ব্যক্তি ব্ল্যাক মার্কেটে কিছু কাপড় বিক্রয় করবে। এর পর বন্দোবস্ত মত আমি পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হই। অকুস্থলে হাজির হওয়া মাত্র একদল লোক ছুরি হাতে আমার উপর লাফিয়ে প'ড়ে আমার টাকাগুলা সব কেড়ে নিয়ে প্রস্থান করে—আমি হাতে ও পিঠে ছুরির দ্বারা আহতও হই।"

এইভাবে কাহাকে বাড়ী ক্রয়ের কারণে, কাহাকে বা নিষিদ্ধ দ্রব্য দিবার অছিলায়, কোনও এক নিভৃত স্থানে ভুলিয়ে এনে এরা এদের অর্থাদি কেড়ে নিয়ে থাকে। এইরূপ অপকর্ম্মের কাহিনী বড় বড় শহরে প্রায়ই শুনা যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন বিড্ গ্যাম্বলার বা নওসেরা চিট্ রূপেই এদের দলে ভর্ত্তি হই। এদের আড্ডায় এসে, কিন্তু, দেখি তাস বা জুয়ার কোনও খবর নেই। সেরেফ ভুলিয়ে এনে টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়াই দেখি